স্বপ্ন ও সত্য

গোপাল হালদার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট, লিমিটেড্

প্রকাশক :

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য তিন টাকা আট আনা মাত্র

প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নিবেদন

গ্রন্থের পরিচয় গ্রন্থমধ্যেই থাকে। তবে ইতিহাসটুকু জানানো সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়। এ গ্রন্থের সে কাহিনী 'সূচীপত্র' নামক লেখাটির প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে। 'সূচীপত্র' লেখাটি সে হিসাবে সূচনাপত্র ; এবং এ বইএর এক হিসাবে মুখবন্ধ।

সাহিত্য ও রচনা-রহস্য নিয়ে আমার মনে গত পঁচিশ বৎসর ধরে নানা প্রশ্ন জেগেছিল ; পাঠক মাত্রই দেখবেন এখনো তা শেষ হয়নি ; এবং আরও পঁচিশ বৎসরেও তা শেষ হবে না। সে প্রশ্নগুলিরই পরীক্ষা এসব লেখা। প্রাসঙ্গিক বলেই বল্‌তে পারি আমার কাল, আমার পরিবেশ, আমার দৃষ্টি এ অবশ্য বিংশ শতকের মধ্যভাগের ; কিন্তু এ জাতীয় লেখারই বিদেশী নাম 'বেল লেত্‌র্‌স্‌' আর স্বদেশী ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'।

পাঠক হয়ত নানা সাময়িকপত্র থেকে এবং আমার পুরনো বই 'বাজে লেখা' থেকে এসব কিছু কিছু লেখা পড়ে থাক্‌বেন। কিন্তু চাহিদা থাক্‌লেও সে বইএর আমি আর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করি নি। অধিকাংশ পাঠকেরই নিকট তাই এসব লেখা এখন নতুন—অনেকের অজ্ঞাত, অনেকের বিস্মৃত, শুনেছি আরও অনেকের সমাদৃত। সকলেরই হাতে তা এখন সমর্পণ করলাম—ভাগ্যে যাই থাকুক। ইতি—

৭ই জুলাই, ১৯৫৬ লেখক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রশ্নটা পুরোনো—লেখা কি, আর কিইবা লেখা নয়। এত পুরোনো যে, মহর্ষি বাল্মীকি নাকি প্রথম ছন্দ আবৃত্তি করেই চমকে উঠেছিলেন,—তাই তো, এ আমি কি বললাম? বোধ হয় উত্তরাকাণ্ড শেষ করেও তিনি তার উত্তর পান নি—এ আমি কি করলাম? লেখকের দিক থেকে এই প্রশ্ন তাই বরাবর চলে এসেছে—স্বপ্নে না সত্যে, কিসে লেখা হয় সাহিত্য? কিই বা তার সোনার কাঠি, কিই বা রূপোর কাঠি? কিন্তু অলেখকের দিক থেকেও কি প্রশ্নটা সঙ্গে সঙ্গে ওঠেনি—কেন আমার লেখা বাজে লেখা হল? রাজকন্যার ঘুম ভাঙে না কেন? আর এই বাজে প্রশ্নটাও শুধু কি অলেখকেরই? হাজার হাজার শ্লোক লিখতে লিখতে মহর্ষি বাল্মীকিও কি এক একবার চম্‌কে ওঠেন নি—তাইতো, এ আমি কি বাজে কথা বলছি? লেখার এই প্রশ্ন তখন থেকেই উঠেছে—খুব পুরোনো প্রশ্ন। বোধ হয় তার মীমাংসা নেই;—শুধু সময়মতো এক একটা উত্তর মেলে। তাতে লেখক মন্ত্রসিদ্ধা হয় নি, বাজে লেখাও বহরে কমে নি। মানুষের পৃথিবীর রূপান্তর ঘটছে, নতুন ভাব মানুষের জুটেছে, নতুন কথা ফুটেছে, নতুন রূপ উঠেছে লেখায় ফুটে—এইতো মানুষের মনের একটা দিকের ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে মানুষও নতুন করে ভেবেছে—তাই তো, লেখা তা হলে কি? কেনই বা তা কখনো ফোটে, আবার কখনো না ফুটতেই ঝরে যায়? এক যুগ যা উত্তর দিয়েছে, তা সে যুগের মতো করেই সে দিয়েছে; তা মিথ্যা নয়। কিন্তু আর যুগের লেখা আসে নতুন স্বাক্ষর নিয়ে; পুরোনো উত্তরে তখন আর কুলোয় না। নতুন করে সে যুগ বসল তার উত্তর খুঁজতে। একটা উত্তর পেলও। পুরোনোর পুঁজি তাতে বেড়েই গেল—ফাঁকা হয়ে গেল না। কিন্তু তার পরে আবার আরো নতুন যুগ এল, নতুন কথা ফুটল; আবার

প্রশ্নটারও উত্তর তেমনি নতুন থেকে নতুনতর হয়ে চলল। পুরোনো বলে কোনো উত্তর মিথ্যা নয়, আর নতুন বলেও কোনো উত্তর শেষ কথা নয়। জীবন এগিয়ে চলছে, তার সাহচর্য রক্ষা করছে লেখা, তাই নাম তার সাহিত্য। এক এক নতুন কোঠায় জীবন পা দেয়, সাহিত্যেরও এক একটা নতুন রূপ দেখা দেয়। নতুন যুগের নতুন লেখা নিয়ে নতুন যুগের বিচারকরা পুরোনো যুগের মানদণ্ডের সঙ্গে নতুন যুগের মনোধর্ম মিলিয়ে বসে যান বিচার করতে—এ কি সার্থক লেখা না বাজে লেখা? কিন্তু সার্থক হলে জীবন তার সেই নতুন পরিচয়কে নিজেই তার আগে সহজে স্বীকার করে নেয়। জীবনের হাতেই লেখারও জীয়ন-কাঠি।

বিচারের পথে আলোকের অভাব নেই—পায়ে পায়ে নজির। হয়ত অত আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে—আলোচনা আলোক-ধাঁধা হয়ে ওঠে,—তবু বিচারের দাম আছে।

সূচীতেই বলা দরকার—ওরকম বিচারের ধার দিয়েও আমি এখানে যাইনি—পুরোনো নতুন কোনো আলোকের চিহ্ন এই বইতে নেই। তার জন্যে জানা দরকার এ বইয়ের সূচনা-কাল ও রচনা-কারণ।

আমরা তখন নিরালোক দেশের অধিবাসী। সেখানে সত্যই সূর্যও ওঠে কম, মেঘে থাকৃত আকাশ ঢাকা; আর বইয়ের আলো ঢুকৃত আরও সাবধানে। সেখানে লিখতে বসে আমি দেখলাম—স্বপ্ন ও সত্য আমার মন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। শুধু তাই নয়, যা লিখতে চাই তা লিখে উঠতে পারলাম না। সহজ কথা, খুব পরিষ্কার একটা কথা—কিন্তু লেখায় তা ফুটল না, হল 'বাজে কথা'। 'এ আমি কি বললাম?'—বাল্মীকির এ বিস্ময় আমার মনে এল না; এল এই জিজ্ঞাসা—কেন এ আমি বল্‌তে পারলাম না? প্রশ্ন আলোচনা রূপে দেখা দিল না—রইল আলাপ হয়ে। শুরু হয়েছিল তা ১৯৩৩-এ বক্‌সার পাহাড়ে, আর চলল তা ১৯৩৫-এ আলীপুরের প্রেসিডেন্সি জেলেও। কখনো সে নিজের সঙ্গে নিজে আলাপ জুড়ে দিয়েছে, প্রশ্ন

করছে, উত্তর শুনছে নিজেই নিজের। আর কখনো তার সেই আলাপের উপলক্ষ্য জুগিয়েছেন সেখানকার বন্ধু আর সতীর্থরা। কিন্তু মন ইচ্ছামত বয়ে চলেছে,—উপল কুড়োতে চায়নি। বইয়ের আলো না খুঁজে মন বয়ে চলেছে আপনার নিয়মে, আপনার রীতিতে, আপনার গতিতে। আমিও তাতে বাধা দিই নি। তাই এ কয় পাতায় তার আঁকা বাঁকা গতিই বরাবর রয়েছে—তার লক্ষ্য নেই, আছে উপলক্ষ্য। এই সূচনার কথা মনে রাখলে এ লেখার রূপরীতি বোঝা যায়। কারণ, আমার কলম অনুসরণ করেছে মনের ধারা, যুক্তির ধারায় তা চলে নি। আলাপ logical নয়, psychological. তা ছাড়া, আমি আপনার সঙ্গেই আলাপ করেছি, রসিকদের সঙ্গে আলোচনা করবার কথাও ভাবিনি। এ লেখা প্রায় সর্বত্রই স্বগতোক্তি। সে আলাপ যে তাই বলে একেবারেই একান্ত ছিল, তাও নয়। তখনো আমি তা ভাবি নি, আজও ভাবি না। আমার মনে কত জানা-অজানার ঢেউ লেগেছে তার ঠিকানা নেই। তার মধ্যে বিলিতি লেখক আছেন, দেশী লেখকও কি নেই? তবে এই কথাটা বোধহয় ঠিক, প্রভাব যতই যাঁর থাক্ এ লেখাগুলো চলেছিল আপনার স্বভাবে। অবশ্য স্বভাবের কতটা স্ব, কতটা পর, বলা শক্ত। তবে তা স্বভাব, আর তার রীতি স্বগতোক্তির। এর পদ্ধতি একান্ত আলাপের, সভায় আলোচনার পদ্ধতি এতে নেই। এই সূচনা-পত্রে তার কারণ নির্দেশের জন্য বলতে হল—এই লেখার সূচনা কিরূপে, আর এ লেখার রূপই বা কি।

কিন্তু কথা হল—যা স্বগতোক্তি তা পরিবেশের জন্য নয়, তাকে তবে প্রকাশ্যে পরিবেশন করা কেন? এই দ্বিধা আমারও মনে জেগেছিল। কাব্য-জিজ্ঞাসার পদ্ধতি এরূপ নয়, কাব্য-বিচার যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথেই করা প্রয়োজন, তার রীতি নৈর্ব্যক্তিক। সেখানে বিষয়টাই সব, আর তাই লেখককে দূরে রাখতে হয়। আমার মন কিন্তু লেখা থেকে লেখককে দূরে রেখে বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয় নি। তার ফলে সে অনেক পাক খেয়েছে। তারপর, সেদিন সে

ছিল ত্রিশোর্ধ্বে, আজ সে পঞ্চাশোর্ধ্বে চলেছে; আর ইতিমধ্যে আপনার গতিপথেই পুরোনো প্রশ্নের একটা উত্তর সে আবিষ্কার করেও ফেলেছে। এ জায়গায় আমি পৌঁছুচ্ছি যখন, তখন আমার কাছে মন ও বস্তুর সক্রিয় সম্বন্ধের কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখছি, বস্তুকে চিনেই মন আপনাকে চিন্‌ছে, আর আপনাকে যেমনি চিন্‌ছে অমনি আরও বেশি চিন্‌ছে বস্তুকে। এই ভাবেই মনের এলাকা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতির রাজ্যে মানব-প্রকৃতি করছে স্বরাজ-সাধনা। কিন্তু এ জায়গায় পৌঁছলাম যে পথে তা শুধু যুক্তির নয়, তা জীবনেরও পথ। সেই পথেরই একটা আধ-দেখা পুরোনো নিশানা রয়েছে এই সব লেখায়,—এ হিসাবেই তাদের যা কিছু দাম। নইলে এতে ধারাবাহিক আলোচনা নেই, একটা সুসম্বদ্ধ কাব্য-জিজ্ঞাসা নেই, এমন কি কোনো উত্তরই নেই সেই পুরোনো প্রশ্নের—লেখা কি, স্বপ্ন না সত্য, কি দিয়ে তার পরিচয়, কেন লেখা হয় বাজে লেখা। সেদিক থেকে আশ্চর্য দিগ্‌দর্শনী কড্‌ওয়েলের লেখা। বছর কয় পরে আমি তা পড়ি। তাতে আমি বুঝেছি—আমার ১৯৩৩-'৩৫এর ভাবনাকে ঢেলে সাজিয়ে আর লাভ নেই—এগুলো পথের পুঁজি হিসেবেই দেখবার। তাই, পুরোনো লেখার গায়ে আমি আর নতুন করে সে ভাবে কলম ছোঁয়াতেও চাই নি। মাত্র জুড়ে দিয়েছি দুটি নতুন লেখা, তার সুর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন তার তারিখ। এ সব লেখা হচ্ছে পথ-চলতি পায়ের রেখা, তেমনি রইল তার দাগ—যে পথের লক্ষ্য ছিল না, পরিকল্পনাও মনে ছিল না; মনে ছিল আবছা কল্পনা আর জল্পনা। ইতি—

লেখক

স্বপ্ন ও সত্য

সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

ভেবেছিলাম—আমার সারা দিনের নৈরাশ্য ও উত্তেজনা এবার আমাকে নিষ্কৃতি দেবে, রাত্রি আমাকে কবলিত করে নেবে তার গহ্বরে। মুছে যাবে মন থেকে নৈরাশ্য,—কেন আমার লেখায় প্রাণ নেই। শান্ত হবে উত্তেজনা—রূপের অন্বেষণে পুরূরবার এই পরাজয়, এই খেদ। আমি চাইলাম নিদ্রা—আরামের, বিশ্রামের, চাইলাম বিস্মৃতির গুহাতল। হাঁ, আমি চাইলাম বিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতি। নৈরাশ্যের থেকে, উত্তেজনার থেকে, আত্মপরীক্ষার থেকে আমি মুক্তি চাইলাম। তাই চাইলাম নিদ্রা—আমার মন পেতে চায় স্বস্তি, দেহ পেতে চায় বিশ্রাম।—এবার থেকে আমি আর মায়ামৃগের শিকারে পা বাড়াব না, আমি কাজের পৃথিবীতে বাঁচব। যে পৃথিবী আমার, আমার বড় চেনা, আজন্ম চেনা, সেখানে আমি বাঁচব,—মানুষের সমাজে, মানুষের মত—মানুষের সহযাত্রী, আর মানুষের সহকর্মী। আমি এই মায়ামৃগের পিছনে আর ছুটব না।—হে উর্বশী, আমি পৃথিবীর মানুষ, আমাকে ক্ষমা করো, বিদায় দাও—আমার গৃহ আছে, সংসার আছে, আছে রাজ্য-রাজপাট ; জীবন আর সসাগরা ধরণীর দাবি আমার উপর !

নিদ্রা এল না। বিস্মৃতি আমি পেলাম না। বরং স্মৃতি, সুদূর স্মৃতি, মুছে-যাওয়া স্মৃতি, আধ-মোছা স্মৃতি—রাত্রির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। আর হঠাৎ সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল—সম্পূর্ণা, পরিপূর্ণা মূর্তি।

উর্বশী না শ্রী ? লক্ষ্মী না মোহিনী ? অপ্সরা না আফ্রোদিতে ? ঘুম-ভাঙা রাজকন্যা না মায়াবিনী রাক্ষসী ? যে-ই হোক্, এ মানবী নয়। আমি তাকে আর বিশ্বাস করব না—আমার জীবনকে আর

আমি তার হাতে তুলে দেব না। আমি তাকে চাই না। চলে যাক্, চলে যাক্, চলে যাক্ সে।

—তুমি যাও, তুমি যাও।

—কেন ?—সে স্পষ্ট, স্থির স্বরে জিজ্ঞাসা করলে। বিদ্রূপ নেই, সঙ্কোচও নেই সেই কণ্ঠে।

—কেন তুমি এসেছ ?

—তুমি আমায় ডাকছ, তাই !

—না, না, আমি তোমায় ডাকি না। তোমায় চাই না, তোমায় চিনি না—কে তুমি ? কে তুমি ?

—জিজ্ঞাসা করো তোমার স্মৃতিকে, জিজ্ঞাসা করো বিস্মৃতিকে। জন্মক্ষণে তুমি আমার বাগ্‌দত্ত। সে ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার অধিকার কারো আর নেই—তোমার নেই, আমারও নেই ! তুমি আমার—জীবনের মত, মরণের মত ; প্রেমের জন্য, প্রতিহিংসার জন্য !

—না, না ; অসম্ভব। সে আমার পক্ষে প্রাণঘাতী। তুমি দেখেছ, সে আমার পক্ষে প্রাণঘাতী। আমার দেহ তোমার সে অরূপ-স্পর্শ সইতে পারে না, আমার মন সে মায়া-ভার বইতে পারে না। তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন—তুমি যাও। তুমি আমার দেহকে—আমার ভাঙা দুর্বল দেহকে—আর পীড়ন করো না ! আমার মনকে—পৃথিবীর পাণিপ্রার্থী আমার এই মনকে—তুমি আর দিও না শাস্তি। তাকে বিশ্রাম দাও, তাকে আরাম দাও, তাকে শান্তি দাও। তাকে কাজ করতে দাও, তাকে মানুষ হতে দাও, মানুষকে পেতে দাও। তুমি এসো না, এসো না, এসো না। আমার শরীর তোমার স্পর্শে মুস্‌ড়ে যায়। তার শুক্‌নো ডাল মড়মড় করে। তোমার শ্বাসে পুড়ে ঝল্‌সে যায় তার শেষ পাতা। আর আমার মন তোমার পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে যায়। তার হাসি মরে যায়, তার আরাম হয় অস্বস্তি। বারে বারে তোমাকে দেখি,—চিনি নি তবু, এখনো চিনি না। কে তুমি, বলো। কেন তুমি আমাকে শাস্তি দাও ? কেন তুমি আস ?

—তুমি ডাক বলে। তুমি লিখবে বলে। তুমি লিখবে, তাই তুমি আমায় ডাকছ, আমায় খুঁজছ। আর তুমি ভালোবাসো,—তাই তুমি লিখ্‌বে। তুমি মানুষকে ভালোবাসো, তাই তুমি লিখবে। আর পৃথিবী তোমার পাণিপ্রার্থী, তাই তুমি লিখে আর শেষ করতে পারবে না। পৃথিবী তা'ই চায় তোমার কাছে, মানুষ তা'ই চায়, তুমি নিজে তা'ই চাও নিজের কাছে। আর তাই আমি এসেছি—লেখো তুমি, তুমি লেখো।

—না, না, আমি লিখতে চাই না। আমি লিখতে পারি না, লিখতে পারব না! সে মায়া, সে মিথ্যায় আর তুমি আমায় ছলনা করো না, বিদ্রূপ করো না আমাকে। আমি জানি—আমি লিখতে পারি না; লিখতে আর চাই না। আমি ভালোবাসতে চাই—লিখতে চাই না; আমি মানুষ হতে চাই—লিখতে চাই না। আমি পৃথিবীকে চাই—লিখতে চাই না। আমি কাজ চাই, কাব্য চাই না। সত্য চাই, স্বপ্ন চাই না। বাঁচতে চাই, লিখতে চাই না! চাই না,—চাই না তোমার ছলনার শিকার হতে, আর চাই না তোমাকে—লেখার শত্রু তুমি, মায়াবিনি, কোনোদিন চাই না, চাই নি তোমাকে।

—তুমি চাও নি? চেতন-মনে তুমি আমাকে চাও না, সত্য। কিন্তু তুমি গহন মনে স্বীকার করবে, তুমি আমাকেই চেয়েছ। তুমি আমায় আজও ডেকেছ। ডাক্‌ছ, এখনো ডাক্‌ছ। আর, আমাকে গ্রহণ করছ না বলেই তোমার দেহ হয়ে উঠ্‌ছে নৈরাশ্যে বিক্ষুব্ধ। তুমি আমাকে চাও। জীবনে তুমি আর কাউকে নিতে পারবে না, নিজেকে আর কারো কাছে দিতে পারবে না—তুমি আমার বাগ্‌দত্ত। বৃথা তোমার প্রার্থনা, বৃথা তোমার ক্রন্দন, বৃথা তোমার আহ্বান। তাই, তোমার মনকে তুমি দগ্ধ করছ নিজের ক্ষোভ দিয়ে আর হতাশা দিয়ে। তুমি চিরছ নিজেকে। আর তোমার সে হতাশা ও ক্ষোভ তোমার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে রক্ত দিয়ে ভরে তুল্‌ছে, তোমার স্নায়ুগ্রন্থি তার তাপে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তোমার দেহ

এই বিরোধের বোঝায় ভারাক্রান্ত! তোমার আয়ু ক্ষয়ে যাচ্ছে। তুমি আমায় চাও—আর তুমি তা অস্বীকার করতে চাও ; অথচ তুমি আমায় নিচ্ছ না,—আর তাই তোমার এই আত্মপীড়ন।

—যদি আমি তোমার বাগ্‌দত্ত হই, মায়াবিনি, কেন তোমাকে পাই না ? কেন তুমি সাড়া দাও না আমার প্রার্থনায় ? কেন, বলো, কেন তোমার এই বিদ্রূপ ?

—তুমিই আমাকে নাও নি। অনেক দিন আমি এসেছি। অনেক বার আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। অনেক বার অনেক দিন। অনেক অনেক বার আর অনেক অনেক দিন। অস্বীকার কোরো না এ সত্য। অস্বীকার তুমি করতে পারবে না—চেয়ে দেখো পেছনে, চেয়ে দেখো তোমার ভেতরে—কত কত বার আমি এসেছিলাম! আহ্বানের অপেক্ষা করি নি, তোমার প্রার্থনার প্রতীক্ষায় থাকি নি—এসেছিলাম নিজে থেকে প্রথম। এসেছিলাম তোমার দুয়ারে। তুমি ডাক নি তখনো, ডাকার কথা বুঝতেও না হয়তো, আমিই তোমাকে ডেকেছি। তুমি চাও নি—চাইতে বুঝি তখনো জানতে না, সে প্রয়োজনও তোমার ছিল না,—আমিই তোমাকে চাইছিলাম! আমিই ছিলাম তোমার সম্মুখে উপযাচিকা। চাইছিলাম তোমাকে—চাইছিলাম তোমার মধ্য দিয়ে আমাকে আর আমার মধ্য দিয়ে তোমাকে। আমি চাইছিলাম আমার প্রকাশ—আর তোমারও তা'তে প্রকাশ। তোমার প্রকাশ, তোমার আত্মপ্রাপ্তি—দলের পর দল মেলে তোমার ফুটে ওঠা—এই, মাত্র এই আমার ছিল তোমার নিকট প্রার্থনা। আর, তা হয়ে উঠ্‌ত আমারও জীবন, আমারও প্রকাশ,- আমারও আবির্ভাব। তুমি আমাকে আবিষ্কার করতে, তুমি নিজেকে আবিষ্কার করতে—আমি তোমার জন্য নিয়ে এসেছিলাম সেই আশীর্বাদ। এই বর আমি দক্ষিণ হাতে নিয়ে তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আর সে কতবার, কতকাল ধরে সে অপেক্ষা!—উদয়াস্ত অতিক্রম করে আমি এসেছি—জ্যোৎস্না রাত্রিতে, তারা-ভরা আকাশের তলে, আর নারিকেলের

মর্মরায়মাণ ডালের ফাঁকে, ঝাউয়ের ব্যথিত গুঞ্জরণের অবকাশে। কত শান্ত সন্ধ্যায়, শান্ত প্রদীপের তলে, নির্জন তোমার নিভৃত নিমেষে। কত হাস্যমুখর দিনে, উৎসবের আলোতে। কত পথের বাঁকে আর পথের ছায়ায়। কত মানুষের মুখে আর মানুষের মায়ায়—মানুষ, যা তোমার বড় নেশা, যা তোমার বড় প্রেম, যা তোমার বড় ভ্রান্তি, বড় হতাশা,—কতবার তার মুখচ্ছায়ায় তুমি আমায় দেখেছ। কত বন্ধুর মুখে, কত বান্ধবীর বুকে। কত পরিচয়ের স্নিগ্ধ শিখায়, কত অকস্মাৎ চমকিত বিদ্যুল্লেখায়। কতবার আমি এসেছি, কত সহস্র-সহস্র বার। চোখে তোমার পরশ ছোঁয়াতে গিয়েছি, তুমি রয়েছ চোখ বুজে। তুমি আমায় নাও নি। তুমি চোখ ঢেকে রয়েছ, তুমি আমায় চাও নি। আর আমি গিয়েছি তখন ফিরে, আমি গিয়েছি মিলিয়ে, আমি গিয়েছি বাষ্প হয়ে। তবু আবার ফিরে এসেছি, আবার নির্লজ্জার মতো চেয়েছি তোমাকে; দাঁড়িয়েছি তোমাকে দেবার জন্য, তোমাকে পাবার জন্য। আর তুমি চোখ তুলে তাকালেও না। তুমি চোখ ঢেকে রইলে, তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। কত বার এমন হয়েছে—কত বার কত দিন, কত কত বার আর কত কত দিন। আমার হাতের সোনার কাঠি মাটিতে পড়ে রূপোর কাঠি হয়ে গেল।

—তখন যে আমার জীবনের প্রভাত—আমার জীবনের সূর্যালোকভরা সুন্দর প্রভাত। উজ্জ্বল সেই দিনগুলো। বিধাতার আশীর্বাদ সেই কৈশোর আর প্রথম যৌবন—বিধাতার আশীর্বাদ, যা বিধাতা সবাইকে দেন। অসীম সে দাক্ষিণ্য। অতুল সে আশীর্বাদ। একবারের বেশি বিধাতাও তা কাউকে দিতে পারেন না। বিধাতাও তা দিতে অক্ষম—একবারের বেশি। সেই একবার-পাওয়া একটি প্রভাত আমার জীবনে তখন সবে এসেছে। বিধাতার পরম আশীর্বাদ আমার সম্মুখে তখন—সূর্যালোকভরা আকাশ—নীল, ঘন নীল, স্নিগ্ধ আকাশ; আর মায়াঞ্জন-মাখা পৃথিবী, শ্যামল স্নিগ্ধ পৃথিবী। জীবনে অমন নীল আকাশ আর আসে না, আর অমন শ্যামল পৃথিবী।

মানুষের মুখ তার সঙ্গীদের চোখে আর অমন সুন্দর হয়ে ফোটে না, অমন রক্তাভ হয় না মানুষের বুক। নিজের অন্তরের ঘ্রাণ আর অমন করে কখনো করে না নিজেকে মাতাল—নিজেকে আর অপরকে। নিজের দেহের শিখা আর জ্বলে না অমন নির্মল আভায়,—নিজের চোখের সম্মুখে আর অপরের চোখের তারায়। সেই আমার প্রথম যৌবন,—বিধাতার আশীর্বাদ। তাকে আমি অস্বীকার করতে পারি নি; বিধাতার জন্যও আমি তা ছাড়তে স্বীকৃত হতাম না—সেই হাসি আর গান, সেই অকারণের হাসি আর অকারণের উচ্ছ্বসিত কোলাহল। তা আমি কি করে ছাড়ব? জীবনে তা একবার আসে, মাত্র একবার। একটি মুহূর্তমাত্র জাগে আমাদের সমস্ত অঙ্গ ছাপিয়ে সেই কল্লোল, আমাদের সমস্ত মনের তটে তটে সেই জোয়ারের জয়ধ্বনি, এই বিধাতার আশীর্বাদ, দুর্লভ আশীর্বাদ,—আমি কি করে তা ছাড়ি? কেন তুমি তখন এলে?—তুমি আমাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে এসেছিলে—সেই একটি মাত্র সুন্দর প্রভাতও তোমার সহ্য হল না। সহ্য হল না আমাকে ছেড়ে দিতে বিধাতার সেই সহজ আশীর্বাদ—যা সবাই পায়, যা সবাই ভোগ করে, যা থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। তাও তুমি আমায় ছেড়ে দিতে চাও নি। কেন তুমি তখন এলে? তুমি হলে তার বাধা। তুমি আমার জীবন থেকে সমস্ত আলো নিবিয়ে দিতে চাইলে—হাসির আলো, গানের আলো, বন্ধুত্বের আলো, আর প্রেমের আলো। তুমি আমার জীবন থেকে সব রঙ্ মুছে দিতে এসেছিলে—আমার উচ্ছ্বসিত হাসি, অকারণ কোলাহল, আমার বন্ধুত্ব-লোভী মন, আমার ভালোবাসার ভীরু শিহরণ, আমার উদ্দীপ্ত রাগের উজ্জ্বল আগুন। আমার চোখ আনন্দে নেচে উঠত, আমার বুকের তলে রক্ত দোলা দিত, আমার সারা দেহে জাগ্রত ছন্দ। আর তুমি আমার চোখের তারায় বসে, আমার হৃৎপিণ্ডের উপর বসে, আমার মস্তিষ্কের কোঠায় বসে আমাকে তোমার কবলিত করতে চাইতে। তুমি চাইতে আমি তোমায় গ্রহণ করি, তোমায়

গ্রহণ করি—আমি অস্বীকার করি আমার যৌবন, আমার বন্ধুত্ব, আমার প্রেম, আমার হাসি, আমার কোলাহল, আমার অকারণ উচ্ছ্বাস। তুমি তখন এসেছিলে বিধাতার আশীর্বাদকে পণ্ড করতে, তুমি জীবনের সেই একটিমাত্র ঐশ্বর্যকেও চেয়েছিলে কেড়ে নিতে। তুমি ভরে তুলতে চেয়েছিলে আমার সেই প্রভাত তোমার মিথ্যার পূজায়। তোমার মায়াজাল ঢেকে দিত আমার নির্মল আকাশ—সে আকাশ তোমার অসহ্য, আমার আনন্দ তোমার অসহ্য, আমি আমার থাকব, এ তোমার অসহ্য। তুমি আমার সব কেড়ে নিতে এসেছিলে, তুমি আমার আত্মাকে চেয়েছিলে কবলিত করতে, হত্যা করতে, তোমার জারক রসে নিঃশেষিত করতে! সব তুমি মুছে দিতে এসেছিলে। সব তুমি চেয়েছিলে মিথ্যা করে দিতে।

—আমি এসেছিলাম নিজেকে দিতে। আর আমি এসেছিলাম, তাই তোমার প্রভাতে অত রঙ্ ধরেছিল। এসেছিলাম, তাই রঙ্ ধরেছিল তোমার যৌবনে। রঙীন হয়েছিল তোমার মন, উজ্জ্বল হয়েছিল তোমার বন্ধুর মুখ, উদ্বেল হয়েছিল তোমার বান্ধবীর বুক। আমি এসেছিলাম, তাই—শুধু তাই, শুধু তাই—তুমি চিনেছিলে তোমার জীবনের প্রভাতকে, যৌবনের আবির্ভাবকে। আর আমাকে যদি গ্রহণ করতে, তোমার সে নতুন প্রভাত আর ফুরোত না, বিধাতাও কেড়ে নিতে পারত না তোমার সেই অক্ষয় যৌবন, তোমার অজেয় সাম্রাজ্য। তাঁর আশীর্বাদ শেষ হত না, আমার আশীর্বাদে মিশে তা অশেষ হত। কৃতার্থ হতেন বিধাতা। বিধাতা কৃতজ্ঞ হতেন তোমার কাছে। তোমার সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিকে দিত অসীমত্ব, তোমার আনন্দ তাঁর ললাটে পরাত ঔজ্জ্বল্যের টীকা। নিষ্প্রভ রইল তাঁর ললাট, ব্যর্থ হল তাঁর সৃষ্টি—তোমার অচেতনতায়, তোমার অবহেলায়, তোমার নিশ্চেতন ভোগে। তাঁর আশীর্বাদ ক্ষণস্থায়ী হয়েছে, অক্ষয় হতে পায় নি, ব্যর্থ হয়েছে; ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিকল্পনা। বিধাতা লজ্জিত, বিধাতা লাঞ্ছিত, ললাট তাঁর ম্লান—যে ললাটে তুমি ছোঁয়াতে

পারতে সোনার কাঠি, জাগাতে পারতে আনন্দের অনির্বাণ আভা। বিধাতার আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়েছে। তুমি নিজেকে হত্যা করেছ। তুমি ভাষা পেয়েছিলে, কথা বলো নি। তুমি কণ্ঠ পেয়েছিলে, গান গাও নি। তুমি আলো পেয়েছিলে, জ্বালো নি। বোবা পৃথিবী তোমার কাছে ব্যাকুল চোখ তুলে আবেদন করেছে, তুমি তার মর্মবাণী শুন্‌লে, কিন্তু বুঝলে না। মানুষের প্রাণ তোমার কণ্ঠে সুর খুঁজ্‌ছিল, তুমি রইলে নীরব। সৃষ্টির রহস্য চাইছিল তোমার প্রাণপ্রদীপের স্পর্শ, তুমি তা দিতে চাইলে না। তোমার হাতে মানুষের আশা-আনন্দ ফুল হয়ে ফুট্‌ত; আমার অধর-স্পর্শে তোমার প্রেম হত রক্ত-গোলাপ,—রক্তের মতো লাল, আর সুরার মতো মাদক; তোমার হাতে মানুষের অশ্রু হত অনির্বাণ আগুন, স্বচ্ছ স্ফটিক, তুষার-গলা স্রোত। তুমি পেতে বিধাতার মতো সৌভাগ্য—হাস্‌তে হাসাতে, কাঁদ্‌তে কাঁদাতে, মিলন বিরহ ঘটাতে, গড়তে ভাঙতে। তুমি পেতে সৃষ্টির শক্তি। আমি নিয়ে এসেছিলাম সে আশীর্বাদ—বিধাতার অধিকার।

—কে তুমি, মিথ্যাময়ি?—আমি আনন্দ চেয়েছিলাম, তুমি সে আনন্দের শত্রু। আমি সংগ্রাম চেয়েছিলাম, তুমি সেই সংগ্রামে বিমুখ। আমি সত্য চেয়েছিলাম, তুমি সত্যের বিরোধী। সেই প্রথম যৌবনেই তোমার আবির্ভাবে আমার আনন্দ ডানা মেলে শূন্যে মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর সবাই যা পায় তুমি আমাকে তা দিতে চাইলে না। সবাই হাসে আর গায়, প্রেম করে, ভালোবাসে, সবাই সুখী আবার অসুখীও। তুমি আমাকে এই মানুষের সাধারণ ভাগ্যটুকুও দিতে চাইলে না। শুধু সামান্য কয়েকটি দিনের জন্য, যৌবনের দিন ক'টির জন্য, আমি চেয়েছিলাম এই সুখ আর দুঃখ। মানুষের সুখ, মানুষের দুঃখ। সহজ মানবীয় এই সুখ-দুঃখ—কিন্তু তুমি তা রহস্যময় করে তুললে। কিছুই সহজ রূপে আমাকে পেতে দিলে না—জীবন নয়, যৌবন নয়, পৃথিবী নয়, মানুষ নয়, বন্ধুত্ব নয়, ভালোবাসা নয়—কিছুই

সহজ নয়। তুমি সব করে তুল্‌লে বিস্ময়কর, সব করে দিলে রহস্যময়, আমাকে করে তুল্‌লে অস্থির, অ-মানবীয়। আমি শুধু সেই কয়দিনের মত চেয়েছিলাম নিজের আনন্দে নিজেকে পেতে। শুধু যৌবনের ক'টি দিন! কত ছোট সেই দিন ক'টি, আর কত স্বল্প তা। পলক না ফেলতেই তা পালিয়ে যায়। তারপর আমি মেনে নিতাম সব, মেনে নিতাম না হয় তোমার দাবি। জীবনের ভাদ্র-রাতে তোমার জন্য—শুধু তোমার জন্যই—না হয় আমি বসে থাকতাম দুয়ার খুলে, প্রহর গুণে।—তখন আমার দিনগুলো, দেখো কত ভরাট, কত জমাট হবে। কৈশোরের চাঞ্চল্য আর যৌবনের বিক্ষোভ আমার প্রাণকে তখন আর মথিত করবে না। তখন আমি ভরা-নদীর মতো কানায়-কানায় ভরা। প্রশস্ত, গভীর, প্রশান্ত সেই যৌবনান্তের পরিণত বয়স। তার মর্যাদা আর মাধুর্য সবই আমি তোমার জন্য মনে মনে উৎসর্গ করে রেখে দিতে পারি—সেই পরিপূর্ণ দিনরাত আমি শান্ত আবেগে স্বপ্ন-স্মৃতিতে ভরে তুলব। আমার পরিণত বয়স তোমার নামে থাকবে সঙ্কল্পিত। কেন, কেন তবু তুমি এলে আমার সেই যৌবনের জোয়ারের মধ্যে তোমার স্বপ্ন নিয়ে? আমার নব-তারুণ্যের সহজ আনন্দের হাটে বারে বারে তুমি এলে বিস্ময় আর অস্বস্তি নিয়ে। তুমি আনন্দের শত্রু, তুমি বিধাতার শত্রু—যে বিধাতা বিপ্লবের দেবতা, আনন্দের দেবতা। তুমি মানুষের শত্রু—যে মানুষ সত্য, সত্য আর জীবন্ত।

—সেদিন আমি এসেছিলাম বলে তোমার জীবনে আনন্দ এসেছিল। আমাকে অস্বীকার কর্‌লে বলে তোমার যৌবন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল—তোমার মানুষী প্রেম হারাল তার ভবিষ্যৎ। আমি এসেছিলাম বলে তোমার জীবনে বিস্ময়ের বেদনা জেগেছিল, জেগেছিল বিরাটের ধ্যান, বিপ্লবের দুঃসাহস। ব্যর্থ হয়েছে যতবার আমার আগমন, ব্যর্থ হয়েছে তখন তোমারও যৌবন।

—ব্যর্থ হয়েছে আমার যৌবন?—যে যৌবনকে আমি রক্তশতদলের

মত ফুটিয়ে তুলেছি, যাকে আমার জীবনের হাতে তুলে দিয়েছি—রক্তময় অর্ঘ্য ? তুমি জানো না সে কত বড় সৌভাগ্য, কত বড় সার্থকতা! সেদিন যৌবন আমার; জানলাম আমি যৌবনের যুবরাজ—আর আমি ভালোবাসি। আমি কথা ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি কবিতা; ভালোবাসি হাসি, আনন্দ; ভালোবাসি রূপ আর রস; গন্ধ আর শব্দ, ভালোবাসি প্রেম আর প্রাণ। জান্‌লাম, আমি আরও কত কিছু ভালোবাসি। কত বেশি ভালোবাসি আরাম আর আলাপ, হাসি আর উৎসব, মান আর মর্যাদা, সুবিধা আর সুযোগ।—কোন কিছুই তবু আমার সেই ভালোবাসার সীমারেখা টেনে দিতে পারল না। আমি ভালোবাসি, দুঃসাহসী সে ভালোবাসা আমার। কত বড় সৌভাগ্য সে, কত বড় সার্থকতা। তাকে আমি ছোট করতে দেব কেন ? আমার ভালোবাসা দুই বাহু মেলে দিলে—আকাশকে আলিঙ্গনে টেনে নিলে। আমার ভালোবাসা দুই বাহু মেলে দিলে—পৃথিবীকে বুকে টেনে নিলে। দুই হাত পেতে দিলাম আমি—জীবনের ধারা ছাপিয়ে গেল আমার অঞ্জলি। আমি পেলাম—আমার আত্মার আত্মীয়কে, মানুষকে। সে কী দিন! কী আনন্দ আর উৎসবের দিন! কী স্পর্ধার আর সংগ্রামের দিন! বুঝলাম, আমি ভালোবাসি পৃথিবীকে, মানুষকে! বুঝলাম, আমি ভালোবাসি জীবনকে। তখন আমার যৌবনের মধ্যদিন; তুমি স্বপ্ন হয়ে এসে দাঁড়ালে আমার সাম্‌নে। বল্‌লে, 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।' তুমি কবিতা হয়ে আমার সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌লে—সমুদ্রশিয়রে উর্বশীর মতো, —বল্‌লে, 'আমি তোমাকে চাই।' আরাম এলো, আয়েস এলো, এলো হাসি আর পরিহাস, আমার জন্ম-সহচর; এলো মান আর মর্যাদা, আমার দুর্লভ অতিথি; এলো স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রশান্তি, মানুষের পরম কাম্য; এলো আমার প্রীতি আর স্নেহ, আমার প্রিয়া আর ভবিষ্যৎসন্ততিরা, এলো সেই অমৃতের পুত্ররা তাদের জন্মের দাবি নিয়ে—আর এলে তুমি!—তুমি—তুমি মিথ্যাময়ী! স্বপ্ন

নিয়ে, কবিতা নিয়ে, বল্‌লে, 'না, না, না ; তুমি আমার।'—বাইরে তখন পৃথিবীতে বেদনার বান ডেকেছে, মানুষের ইতিহাসে ঝড় উঠেছে, জীবনের জয়পথে নেমেছে আঁধি। আমি বুঝলাম—আমি ভালোবাসি, আর দুঃসাহসী আমার সেই ভালোবাসা। ভালোবাসি পৃথিবীকে, ভালোবাসি মানুষকে। আমি চাই তার নবজন্ম, চাই বিপ্লব, চাই সংগ্রাম। স্বপ্নের অরূপায়তনে আমি আবদ্ধ থাক্‌ব না, কবিতার কল্পলোকে আমি পথ হারাব না—আমি পৃথিবীকে অস্বীকার করব না, মানুষকে অস্বীকার করব না, অস্বীকার করব না আমার দেশকে, আমার কালকে ; অস্বীকার করব না এই পীড়ন আর এই বেদনা ; অস্বীকার করব না ইতিহাস, আর অস্বীকার করব না বিপ্লব আর তার বিজয়। আমি অস্বীকার করব না—অস্বীকার করব না। কে তুমি জানি না,—কে তুমি মায়াবিনী, জানি না আজও,—কিন্তু বিধাতাকে ধন্যবাদ, আমি বিপ্লবের আহ্বান শুনেছি। আমি মানুষকে অস্বীকার করি নি, পৃথিবীকে পেয়েছি, জীবন থেকে পালাই নি। বিধাতাকে ধন্যবাদ, আমি যৌবনের স্বপ্নরাজ্যে বন্দী হই নি, বন্দী হই নি তোমার স্বপ্ন আর কবিতার কারাগারে ; গেয়েছি জীবনের জয়গান ; দেখেছি মানুষের মহিমা !

—আর আমিই সেই মানুষের মহিমার আভাস, সেই জীবনের জয়গান ; আমিই সেই বিপ্লবের উৎসমুখ, অভিযানের অগ্রদূত।

—তুমি ? তুমি তো স্বপ্ন, মিথ্যা তুমি, শুধু্ পলায়ন ;—মিথ্যা স্বপ্নলোকের মায়া তুমি, আমি বিপ্লবের যাত্রী সত্যলোকের, যাত্রী বাস্তবের পথে।

—হ্যাঁ, আমি স্বপ্ন—যে স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে, যে স্বপ্ন সত্যের অগ্রদূত। আমি স্বপ্নদৃষ্টি, আর আমিই সত্যদৃষ্টি—দৃষ্টি অন্ধকারের পারে, সৃষ্টির অন্তঃপুরে। তুমি জীবনকে গ্রহণ করো, আমি সত্যদৃষ্টি হয়ে ফিরে বেড়াই। আমি রূপলাভ করি—সত্য জন্মলাভ করে। তুমি সত্যকে নিলে না, জীবনকে তুমি সত্য করে পেলে না। তুমি বস্তুকে

দেখেছ, কিন্তু দেখেছ শুধু তোমার আধ-খোলা চোখে, আধ-বন্ধ চোখে, দেখেছ রূপোর কাঠিতে তার প্রাণ কেড়ে নিয়ে। বস্তুকেও তাই তুমি দেখলে ভুল করে, ন্যুব্জ করে; জীবনকে দেখলে ভুল করে, কুব্জ করে। তুমি ভুল করলে। পৃথিবীর মাঝখানে তুমি অন্যায় দেখলে, অসামঞ্জস্য দেখলে, দেখলে মৃত্যুর পীড়া। সত্যই তুমি তা দেখেছ; আর যা তুমি দেখেছ, তাও সত্য। তুমি দেখেছ ইতিহাসের এই পাতাশেষের পাণ্ডুরতা, শুনেছ সভ্যতার আয়ুঃশেষের দীর্ঘ-শ্বাস, দেখেছ মানুষের ম্লান ললাট নীরক্ত প্রাণ। দেখেছ আর ব্যথা পেয়েছ। দেখেছ আর শুনেছ—ইতিহাসের নূতন পাতা খুল্‌ছে, সভ্যতা নূতন দেহ ধারণ করছে, মানুষের ললাটে নূতন সূর্যের চুম্বন আঁকা। দেখেছ সত্যই, দেখেছ সে সত্যকে। কিন্তু জান্‌লে না যা, তা আরও সত্য—যে নূতন সত্য জন্ম নিতে চায়। আর যেমনই আমাকে করলে অস্বীকার, অমনই অস্বীকার করলে সেই সৃষ্টিময় সত্যকেও।

—তুমি তো সত্য নও, স্বপ্নময়ি, সত্যের তুমি অস্বীকৃতি। তুমি বাস্তবকে সহ্য করতে পার না, তুমি স্বপ্ন,—স্বপ্নই গড়। তুমি তোমার সোনার কাঠি ছোঁয়াও আর আমার কাছে স্বপ্নের জগৎ খুলে দাও। সেখানেও মানুষ আসে, দুঃখ আসে, সুখ আসে, হাসি আসে; আসে কান্না, আসে বেদনা, পীড়ন ও গভীর গ্লানি, দুঃসহ মর্মপীড়া, বীভৎস বিকৃতি, ব্যভিচার। সবই আসে, জীবনে যা-যা আছে সবই আসে। কিন্তু আসে না সেই সকলের যাথার্থ্য, আসে না—এই বাস্তব, আর আসে না তাই জীবন। সেই মায়ালোকে আছে অফুরন্ত ছবি, আছে ছায়া। জীবনেরই ছায়া—তবু তা জীবন্ নয়। পৃথিবীরই প্রতিলিপি—তবু পৃথিবী নয়। দেখেছি, তুমি আমার সাম্‌নে ধরো জীবনের মুকুর—কিন্তু জীবন তখনো থাকে আমার পিছনে। যতই মুকুরের ছায়াকে দেখি ততই জীবনের দিকে পিছন ফিরে থাকি। এই তোমার মায়ালোক, তোমার সৃষ্টিলোক—ছলনা; এ তো স্বপ্নলোক, সত্যলোক নয়। যে-ই হও তুমি, তুমি সত্য নও। তোমার ছায়ালোকের পথ

গেছে আরও আরও দূরে, আকাশে, শূন্যে অবাস্তবে। সে এক স্ফটিকের স্বপ্ন—গজদন্ত-সৌধ-শিখর। তার প্রাচীরে প্রাচীরে জীবনের রূপ-কথা, তার প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে অপার্থিব রূপের হাট, তার ভিত্তিতে শিখরে মানুষের ছায়াদেহ, মোহ আর মায়া। কিন্তু সেখানে জীবন কই? সত্য কই? বাস্তব সেখানে ঢুকলে স্ফটিক-প্রাচীরে কপাল ঠুকে দুর্দশাগ্রস্ত হবে, আর তাতে সেই কল্পলোকের ঝরণায় ঝরণায় কাব্য-কাকলি বেজে উঠ্‌বে হাসিতে পরিহাসে। সে যে অবাস্তব লোক,—সে তো সত্য নয়। আমি সত্য চেয়েছি। প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে, কঠিন কর্মের মূল্য দিয়ে আমি সত্যকে সঞ্জীবিত করেছি। বিধাতাকে ধন্যবাদ,—আমি তাঁকেও অস্বীকার করেছি, তবু সত্যকে অস্বীকার করি নি; বিধাতাকে অস্বীকার করেছি, মানুষকে অস্বীকার করি নি।

—তুমি সৃষ্টিকে অস্বীকার করেছ, আর তাই অস্বীকার করেছ সত্যকে, জীবনকে, মানুষকে—আর তাই বিধাতাকেও। এই জীবনের যাত্রাপথে তুমি পা বাড়িয়েছ—কিন্তু পথ দেখে নয়, লক্ষ্য চিনে নয়, পাথেয় জেনেও নয়। পথ তার অভিযানের; তার প্রতি ধূলিকণায় সংগ্রাম আর সংগ্রাম।—বিধাতার হাত থেকে মানুষের রাজ্য জয় করে নেবে মানুষ, প্রকৃতির রাজ্যে সে প্রতিষ্ঠিত হবে। তার পাথেয়—সৃষ্টিশক্তি। সে শক্তি তার তীর হয়ে দেখা দিয়েছে,—পশুপতি হয়ে উঠেছে মানুষ। সে শক্তি তার হল-রূপ নিয়েছে,—বলদেব রূপে দেখা দিয়েছে মানুষ। সে শক্তি চক্ররূপে চল্‌ল, দেখা দিল চক্রেশ্বর মানুষ। সে শক্তি বিদ্যুৎশিখাকে করল বশ, দেখা দিল বজ্রধর মানুষ। সৃষ্টি এমনি করে গড়েছে সত্য, সৃষ্টির স্বপ্ন এমনি করে হয়েছে বাস্তবের সত্য। সৃষ্টি তাই সার্থক হয়েছে তীরে আর হলে, চক্রে আর বিদ্যুতে। তীরের স্বপ্ন মানুষ দেখেছে, তাই তীর দেখা দিল। শস্যের স্বপ্ন সে দেখল—দেখা দিল হল। স্বপ্ন সে দেখেছিল, তাই সত্য হল চক্র, সত্য হল বিদ্যুৎ। সৃষ্টির শক্তি ফুটল সৃষ্টির স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।—সেই সৃষ্টির শক্তি ছিল তোমারও বুকে, আর আমি এসেছিলাম সৃষ্টির এই

স্বপ্ন নিয়ে, বাস্তবের আগে আগে সত্যের আহ্বান নিয়ে—যেমন এসেছিল বাল্মীকির প্রাণে রাম জন্মাবার পূর্বে রামায়ণ-স্বপ্ন। আর তাই জন্মালেন রাম, দেখ্‌ল পৃথিবী রামরাজ্য। আমি স্বপ্ন রচনা করতাম, আমি সৃষ্টি বিকাশ করতাম—তাই হ'ত সত্য। আমি আভাস নিয়ে আসি, আর বাস্তব অমনি তার আদর্শ পায়। এই পাথেয় আমিই নিয়ে আসি, নিয়ে এসেছি বরাবর।—দেখ্‌ছ কত জটিল হয়েছে আজ সংসার—ছোট বড়, লোভী ধনী, ক্ষুধিতের হতাশের সংসার। কত বিচিত্র মানুষ, আর কত বিচূর্ণ মানুষ, আর কত তার বিচূর্ণ বৈচিত্র্য! সব চূর্ণ, সব শূন্য। সৃষ্টি চাই, তাই সত্য জন্ম নিচ্ছে; আলো চাই, সূর্য উঠ্‌ছে। আর আমি এলাম—সেই সূর্যের স্বপ্ন, আলোর আগমনী।

—কিন্তু আমি নিশীথের যাত্রী। আমি স্বীকার করেছি আলোর দাবী, কিন্তু জানি অন্ধকারের অস্তিত্ব। আর বিধাতাকে ধন্যবাদ—আমি আমার মনুষ্যত্বকে খণ্ডিত করি নি। সংগ্রামকে অস্বীকার করি নি, অন্ধকারকে চিনেছি, ভবিষ্যৎকে মেনেছি।

—তুমি আপন আত্মাকে খণ্ডিত করেছ। দেখো নি প্রভাতের দাবী, অন্ধকারের যা লক্ষ্য। সত্য, তোমার সাম্‌নে ছিল পৃথিবী—দশজনের পৃথিবী। এই ভাঙা-চোরা, ছেঁড়া-টুক্‌রো, অন্যায়-ভরা, অচল-পারা—এই তো সকলের পৃথিবী। সে পৃথিবীর মানুষ তুমিও, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ঘরেরই সন্তান—পড়েছ ইংরেজি, পড়েছ শেক্‌সপীয়র, মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ। জেনেছ পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরকে, দেখেছ ইউরোপের জয় আর বিজ্ঞানের বিস্ময়। এই দশজনের পৃথিবীর মানুষ তুমিও—যেমন মানুষ বাংলাদেশের আর সব ভদ্র সন্তান। কিন্তু তোমারও নিজের ছিল এক বিশিষ্ট সত্তা—জন্মসূত্রে পাওয়া সেই বিশিষ্টতা। সেখানে তুমি ছিলে আমার জন্য উৎসর্গ করা, বাগ্‌দত্ত। তোমার সে সত্তাও মুহূর্তে-মুহূর্তে দশজনের পৃথিবীর সঙ্গে নূতন নূতন পরিচয়ে আবার আপনার কত কত স্বরূপ

জানতে পেরেছে, দশজনের পৃথিবীর ঘাত-প্রতিঘাতেই সে সত্তাও হয়েছে সমৃদ্ধ। তাই দেখেছ—বিচিত্র বিস্ময় জীবনের। দেখেছ ছোট ছোট মানুষের জীবনের বড় মুহূর্ত—যখন সে নিজেকে দেয় নিঃশেষে। দেখেছ বড় বড় মানুষের জীবনের ছোট মুহূর্ত—যখন সে নীচ হয় নিঃসঙ্কোচে। দেখেছ—তোমার আদর্শবাদিতা আর তেমনি ভীরুতা। দেখেছ এই দেয়াল-ঘেরা সমাজের মধ্যে তোমার পঙ্গুতা, সকলের পঙ্গুতা, সকলের ব্যর্থতা। আর দেখেছ—সুমহৎ সম্ভাবনা। শুনেছ রুশদেশের কথা, জেনেছ মানুষের নবজন্মের বার্তা। আর তাতেও সমৃদ্ধ হয়েছে আবার তোমার সত্তা, আর গড়ে উঠেছে তোমার ব্যক্তিস্বরূপ। তারই সমৃদ্ধিতে আবার দশজনের জগৎকে তুমি দেখেছ নূতন আর এক আয়তনে, নূতন রহস্যে। দেখেছ পৃথিবীর কেমন দেহান্তর ঘটছে। এ দেখাও বাস্তব, কিন্তু—তা আবার স্বপ্ন দেখাও। পৃথিবী দশজনেরই জগৎ এখনও, কিন্তু তোমার উপলব্ধিতে তা আবার নূতনও। সে দশজনেরই জগৎ এখনও, কিন্তু তোমার সত্তার মধ্য দিয়ে সে আবার রূপান্তরিত হয়েও চলেছে। তুমি তোমার এই সমৃদ্ধ সত্তাকে ভাষা দাও—যে তুমি শেক্‌সপীয়র পড়েছ, রবীন্দ্রনাথ পড়েছ, জেনেছ রুশদেশের কথা,—তুমি আত্মপ্রকাশ করো! দশজনের পৃথিবী অমনি তোমার সেই সৃষ্টিকে করে নেবে অঙ্গীকার, করে নেবে অঙ্গীভূত—আর পৃথিবী রূপান্তরিত হবে। তুমি আত্মপ্রকাশ করতে থাকো, আর অমনি তুমি করবে আমার কাছেও আত্মদান; তুমি দশজনের পৃথিবীকে আত্মসাৎ করবে, আর করবে অমনি পৃথিবীকেও আবার আত্মদান। আমার দু'হাত ভরা দান আর পৃথিবীর অবদান, স্বপ্নের স্বাক্ষর আর পৃথিবীর প্রমাণের পুঁজি—জীবনের সোনার কাঠি ও জগতের রূপোর কাঠি—সব মিলে জন্ম নেবে তোমার সৃষ্টি! আর, তার ফলে জীবনের অমরালোকে তুমি জোগাবে এক মুঠো সোনা, জগতের কর্মশালায় তুমি জোগাবে এক মুঠো আশা। কারণ সে সোনা সত্য, মানুষের চোখেও সেই সোনার স্বপ্ন জাগবে, তার অন্তর-

লোক তাতে মথিত হয়ে উঠবে—তাতে নতুন আশা জন্মাবে, নতুন স্বপ্ন রূপ নেবে। তোমার সৃষ্টি তার ঘুমন্ত প্রাণাবেগকে করবে সৃষ্টিমুখী—করবে আনন্দে দুঃসাহসী, সংগ্রামে উন্মুখ, আর সৃষ্টিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তুমি সৃষ্টি করবে—আর ইতিহাস আরও সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠবে। সৃষ্টি এমনি বিপ্লবী শক্তি, এমনি বিপ্লবী সম্পদ সত্য—মানব-মহাকাব্যের সেই বাল্মীকি-স্বপ্ন।

—কোথায় আমার সেই শক্তি ? কোথায় সেই ঐশ্বর্য ? আমার কথা প্রাণ পায় কই ? আমার লেখা ফোটে কই ? না, না, মিথ্যা তোমার মন্ত্রণা। কে-ই বা নেবে 'আমার কথা ? কতখানিই বা নেবে তারা ? সবাই কি সব নিতে পারে ? পারে না। আমার যে জন্মবন্ধু মানব-সমাজের জন্মতত্ত্ব দেখে নি—সে তোমার সেই দান নেবে কি করে ? যে মানব-সন্তান বিজ্ঞানের বিজয়যাত্রা বোঝে নি, সে বুঝবে কি করে মানবমহিমার কথা ? যে শিল্পী মানুষের শিকল ছিঁড়ে পড়তে দেখে নি, সে মহামানবের মুক্তির আশ্বাস মানবে কি করে ? যে কবি পদে পদে ভয়চকিত, ফিরে যেতে চায় অতীতে—মনগড়া অতীতে,—আচারে, সংস্কারে, জাতীয় 'রক্তের গর্ব' ও মোহেতে,—সেই বা মহামানবের মিলনগাথায় কান দেবে কেন ? আর যে হতভাগ্য চেনে পয়ার আর পাঁচালি, কি বড় জোর পুরাণের গল্প, সে-ই বা আমার কথা আর সঙ্গীতের ভঙ্গিতে ও আঙ্গিকে স্বস্তি পাবে কি করে !

—সবাই নেবে না। সবাই তো তারা মুক্তি-পথিক নয়। আর সর্বাংশে তুমিও মুক্তিযাত্রী নও ! তুমি যে পরিমাণে মুক্তিপন্থী হবে সে পরিমাণে মুক্তির পথিক তোমাকে বুঝবে। তবু তোমার ভাষা ভাবভঙ্গি যতটা সৃষ্টিধর্মী হবে ততটাই তা একেবারে গিয়ে নাড়া দেবে তাদের অন্তরাবেগে—নাড়া দেবে জীবনমূলে। আর যত গভীর হবে তোমার সেই সৃষ্টিবেদনা, তত তা ছাড়িয়ে যাবে তোমার চারিদিক্‌কার পরিধি, তত স্পর্শ করবে প্রাণবান মানুষকে, সৃষ্টিধর্মী মানুষকে, এ জগতের কারুবিদ্‌কে, কারিগরকে।—গণ্ডির বালাই তত যাবে চুকে।

তুমি যতটুকু চোখে দেখো, ততটুকুই শুধু দেখে তোমার গণ্ডির বন্ধুরা। যতটুকু দেখো, ততটুকুই যদি তোমার উপলব্ধি হয়, তা হলে গণ্ডির বাইরে তোমার স্থান নেই—তোমার সে সৃষ্টিও সকলকার নয়। সকলকার হয় তা, যাতে থাকে সর্বমানুষের সহজ প্রেরণার কথা—মৃত্যুর কথা, জন্মের কথা, প্রেমের কথা; আর কথা জীবনের অভিযানের আর মানুষের মুক্তির। যেখানে তুমি জেনেছ জীবনকে, চেয়েছ মানুষকে, দেখেছ বাস্তবের ইঙ্গিত—সেখানেই দেখেছ স্বপ্ন, বুঝেছ সত্য। যেখানে আমি এসেছি, সেখানে তুমি মানুষকে পাও। আর তাই সে স্বপ্ন হয় বিপ্লবী—সৃষ্টিমুখী। আর কথা ও লেখাও হয় বিজয়ী।—তুমি লেখো—সেই লেখা লেখো। আমাকে নাও, নিজেকে দাও। আমাকে নিলে, একদিন তোমার যৌবনের উদ্বেল সত্তার সাক্ষী হতাম আমি। তারপর তোমার জীবনের উদ্বুদ্ধ চেতনার ভাষা হতাম আমি। আর শেষে, তোমার আত্মদানের সংশুদ্ধ আনন্দের বাণী হতাম আমি। আর আমাকে নিলে না,—মানুষকে নিলে না, সৃষ্টিকে নিলে না, নিলে না সত্যকে বারবার।

—না, না। তখনো আমি ত্রিশের নিচে, তখনো আমার মন অস্থির, আবেগে আত্মহারা। তখনো তো লেখার স্বপ্ন দেখেছি, লেখাকে রূপ দিতে পারি নি। সে কথায় বাণী ছিল কি? সে স্বপ্নের মানে ছিল কই?—সে শুধু অকারণে ফুটে ওঠা ফুল। শুধু রঙ, শুধু রঙ!—মিথ্যাময়ি, সে তোমার ছলনা।—আমি তখনো ত্রিশের নিচে, আজ আমি ত্রিশের এপারে। আর আমি প্রতারিত হব না,—আমি কাজ চাই! আজ আমি পঁয়ত্রিশের সীমায় দাঁড়িয়ে, আজ আমি চল্লিশের চূড়াও দেখতে পাচ্ছি। তা অধিরোহণ করতে পারব কিনা জানি না। আমার পা ভেঙে পড়ছে, দেহ অবসন্ন। কিন্তু শ্রান্ত আমার মন শুধু দেহভারে। নইলে তার তীক্ষ্ণতা সে হারায় নি। তার প্রার্থিত গভীরতা সে লাভ করেছে। তার ধ্যান-নেত্রে সে দেখেছে মানুষের বিশ্বরূপ। আমার এই পরিণতির জন্যই আমি

অপেক্ষা করেছি, তা তুমি জানো। ছয় বৎসর পূর্বে জানো—ষোল বৎসর পূর্বেও জানো—জীবনরহস্য আজ আমার অনুভূতিতে উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠছে। অস্থির আবেশে তা পাক খাচ্ছে না, যৌবন-মত্ততায় তা ফেনিয়ে যাচ্ছে না, আমার প্রেমে আর কামনায় তা বিক্ষুব্ধ নয়। আমার চিত্ত আজ সচেতন। আমার প্রেম আর কামনা আজ আপন সীমানায় আপনি সম্পূর্ণ। ইতিহাসের ইঙ্গিত আজ আমি স্পষ্টতর পড়তে পারছি। আমার হাসি তাই আজ করুণায় উজ্জ্বল, অভিজ্ঞতায় শান্ত, সংকল্পে শুভ্র। মানুষের আলিঙ্গন আজ আমার বুকে—আজ আমি মহান্, মহতোমহীয়ান্। কিন্তু মায়াবিনি, ভাষা কই? কথা কই? তুমি স্বপ্ন হয়ে আস, সোনার হরিণ হয়ে আস, ঘুমন্ত রাজকন্যা হয়ে থাক—মানুষ হয়ে তো আস না, ফুটে ওঠ না আমার মনে, রূপ গ্রহণ করো না আমার চেতনায়। আমি শুধু খুঁজি আর খুঁজি—তুমি মায়াই থাক, সত্য হও না। এসো, মায়াময়ি, তুমি রূপময়ী হও। আমাকে স্বপ্নে ভাসিয়ে দিও না, ভাষায় রূপ দিতে দাও। আনন্দময়, সংগ্রামময়, সকরুণ গরিমায় আমার জীবনকে এবার করি প্রকাশ—প্রকাশের প্রেরণায় সমুচ্ছ্রিত পতাকার মত হোক আমার জীবন।

—আমি এ কামনা নিয়ে অনেকবার এসেছি,—অনেকবার, অনেকবার। অস্বীকার করো না, অস্বীকার করতে পারবে না। মনে করো ছ'বছর আগেকার কথা। মনে করো সেই সমুদ্রতীরের দিন, 'পহ্লব'-পাষাণের পদচ্ছায়ায় মুগ্ধ সন্ধ্যা! মনে করো কন্যাকুমারী, মনে করো নীলগিরি—তুমি তার স্মরণে আজও শিহরিত-দেহ। আর মনে করো সেই শীত-বসন্তের প্রভাত-সন্ধ্যা—যখন শিমুলের ডালে লাল হয়ে উঠেছিল দূরের সোনামুড়া পাহাড়ের দেহ। লাল হয়েছিল তোমার মন ছন্দের ফুলে, গীতে, গানে, গন্ধে—আজও তুমি তার নামে চঞ্চল। সেদিন প্রতি পদক্ষেপে তোমার কবিতার লাইন মনে আসছিল। সেদিন শব্দের সঙ্গে শব্দ উঠ্‌ছিল তোমার মনে ছন্দে

ভরে। সেদিন তুমি ভাবতে পার নি, কথা বলতে পার নি, ক্লাশের পড়া পড়াতে পার নি—তোমার মনে ছন্দের কাকলি, তোমার আত্মায় আনন্দ-শিহরণ, ছাপার অক্ষরে স্বপ্নমায়া। কিন্তু সেদিনও তুমি আমাকে নিলে না হাতে হাত ধরে। মাত্র ছ'বৎসর পূর্বে। তখনও তোমার হাত রাখলে ঢেকে। তোমার হাতে সেদিন আমি ফুল হয়ে উঠতে পারতাম, আমি প্রদীপ হয়ে উঠতে পারতাম, আমি মশাল হয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু তুমি আমাকে অস্বীকার করলে, তুমি আমাকে অস্বীকার করলে। আবার আমি এলাম তোমার দুয়ারে আগুনের আহ্বান হয়ে—তোমার শিরায় শিরায় বিপ্লবের আগুনের ধারা আমি ঢেলে দিলাম। তোমার চোখে ছোঁয়ালাম আমার অয়স্কান্ত কাঠি—বিপ্লবী স্বপ্ন। তুমি মেতে উঠলে, পৃথিবীকে দেখলে, মানুষকে চাইলে, চিনলে ইতিহাসকে। চিনলে না তখনো আমাকে, চিনলে তোমার নিজ পরিচয়, চিনলে না জীবন।

—কে তুমি? সে তো স্বপ্ন ছিল, ছিল অসম্ভব আশা! কন্যাকুমারীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি হিমাদ্রি-দুহিতাকে,—কুমারী ভারতবর্ষ সে, সে সাত সমুদ্রের তীরে শিব মহেশ্বরের জন্য অপেক্ষমাণা। সে স্বপ্নের মূল্য আমি দিয়েছি—দেব। কিন্তু স্বপ্নকে রূপ দান করি কি করে?—অপরূপা, কোথায় রূপ? তুমি কি তার রহস্য জানো? তবে রূপ দাও, এসো আজ। এসো আজ। আমার দেহ, স্নায়ু, শিরা-উপশিরা ছেয়ে বোধ হয় তোমার স্পর্শ তীব্র উত্তেজনা তুলবে। আমার শ্রান্ত হৃৎপিণ্ড তোমার মুঠোর মধ্যে হয়তো সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তবু তুমি এসো—মায়া হয়ে থেকো না। দেহের বিদ্রূপে আর বিরোধে ক্লান্ত আমার মন; তবু আমার মন চায় রূপ। তার সঞ্চয় তুমি গ্রহণ করো, তার আহরণ আর তার ঐশ্বর্য নাও। তুমি বাণী হও, তুমি বাণী হও। তুমি রূপ গ্রহণ কর। আমার ভাষা যেন স্বচ্ছ হয়, স্থির হয়, দীপ্ত হয়। আমার ভাষা যেন ক্লিষ্ট না হয়, বেঁকে না যায়, ঝুলে না পড়ে। মন যেন পরাজিত না হয় দেহের কাছে;

ভাঙা দেহ যেন ভেঙে চুরে না দেয় তার কথা। স্নায়ু যেন কবলিত না করে সত্তাকে।—কে তুমি? পার তো তুমি স্পষ্ট হও, স্বচ্ছ হও, স্থির হও! আলো হয়ে জ্বলে ওঠ, ফুল হয়ে ফুটে ওঠ, ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়।—বলো, দেবে তুমি আমাকে এই রূপদৃষ্টি? দেবে আমাকে এ বিধাতার বর? আমাকে বিধাতা করবে, স্রষ্টা করবে—সৃষ্টির দেবতা, কে তুমি?—আমার দৃষ্টিকে বারবার করেছ স্বপ্নময়,—সে স্বপ্ন হবে সত্য? বলো, কে তুমি চিরদিনকার মায়াময়ী? উর্বশী না শ্রী? কে তুমি? রাজকন্যা না মায়াবিনী? স্বপ্ন না সত্য? কে তুমি?

—স্বপ্ন আর সত্য। আমাকে না চিনলে আমি স্বপ্ন হয়ে থাকি, আমাকে চিনলে আমি সত্য হয়ে উঠি। তুমি জীবনকে গ্রহণ না করলে আমি স্বপ্ন হয়ে আকাশে উড়ে যাব, তুমি জীবনকে গ্রহণ করলে আমি সত্য হয়ে রূপলাভ করব।

—কে তুমি, রহস্যময়ি?

—আমি কল্পনা।

বক্সা, ১৯৩৫।

কয়েদির আকাশ

আমাদের ছোট আঙিনার দুয়ার বিকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খোলা থাকে। আমরা সাম্‌নেকার বড় আঙিনায় একটু হাওয়া খেতে বেরোই—যে হাওয়া আসে গোটা তিন-চার পাঁচিল টপ্‌কে, একটা দোতলা হাসপাতালের রোগীদের শ্বাস দান ক'রে ও নিঃশ্বাস বহন ক'রে ; আর একটা লম্বা দোতলা মহলের কয়েদখানার ফাঁকে গলে, পাশ কাটিয়ে, গরাদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু হাওয়া তবুও আসে। আর আমাদের বড় আঙিনাটা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। ওর মধ্যস্থলে আছে একটি পুকুর। তার জল ময়লা, কিন্তু পুকুরটি খুব ছোট নয়, মাঝারি গোছের। তার চারপাশে পথ, খানিকটা করে বসবার ও বেড়াবার জায়গা, আর একটু দূরে চার কোণে আছে চারটি অশ্বত্থ গাছ। আগে গাছের গোড়াগুলো বাঁধান ছিল, বসা চলত, কিন্তু এখন তার বাঁধান তলা স্তূপে পরিণত হয়েছে। আগে 'স্তূপমূলে' বসতাম, এখন আমরা 'স্তূপ' প্রদক্ষিণ করি, কিন্তু এখন আর গাছতলায় বসতে পারি না। দু'ঘণ্টার মতো এই আঙিনার তিন পার আমাদের অধিকারে আসে—ইচ্ছা হয় আমরা বেড়াই, ইচ্ছা হয় খেলি, ইচ্ছা হয় আঙিনার কোথাও বসি। শেষের ইচ্ছাটাই আমার বেশি হয়—সুস্থ দেহকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন আমি দেখি না, আর দেহ অসুস্থ হলে তাকে ব্যস্ত করাই তো নিষিদ্ধ। অবশ্য কেউ কেউ উল্টো মত পোষণ করেন। তিন পারের সরু পথে পরস্পরে ঠোকাঠুকি না খাবার কসরৎ করতে করতে তাঁরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন—সুস্থ দেহকে তাঁরা রাখ্‌তে চান সচল, অসুস্থ দেহকে তাঁরা করতে চান সবল। আবার কেউ কমাতে চান চর্বি, কেউ কমাতে চান অম্বল। আমারও অবশ্য সঙ্গী জুটে যায় ; আর না জুটলেও বাইরে সময়টা ভালোই কাটে। উপরের আকাশের অনেকটা দেখা যায় ওখান থেকে। অনুমান করা যায়

কোনখানটায় গঙ্গার ওপারে মিল্‌-এর পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পেছনকার পূব আকাশ থেকে একটু একটু করে যখন সূর্যের অস্ত-আভা সরে-সরে মাথার ওপরে আসে, সামনে এগিয়ে যায়, একে-একে নানা রঙ্‌ দেখা দেয়, একটু একটু করে রঙ্‌ হয়ে আসে ম্লান—তখন হঠাৎ শুনি "টাইম্‌'স্‌ আপ্‌"। হয়ে গেল ; এবার আমাদের ব্যারাকে বন্ধ হওয়ার সময়। কেউ খেলা ছেড়ে, কেউ ধূলা ঝেড়ে, কেউ ভ্রমণ শেষ করে 'ঘরে' ফেরেন।

এই দু'ঘণ্টার জন্য সারাদিন আমরা বন্ধ দুয়ারটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। এ সময়টা যেন চব্বিশ-ঘণ্টার মতো ধরাবাঁধা নয়। মান্‌তে হবে, আমার চোখেও এ সময়টা একটু স্বতন্ত্র। পুকুরের জল, পাড়ের ঘাস, ওপরকার খানিকটা খোলা আকাশ, আর সর্বোপরি চারিদিকে একটু ফাঁকা—দেয়াল অবশ্য আছে, আর তা-ও এক-আধটা নয়। তা ছাড়া চারিদিকেই উঁচু বাড়ি-ঘরও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবু এই প্রাঙ্গণের হাত কয়েক দূরে তো সে-সব। খানিকটা ফাঁকা তাই এরই মধ্যে,—দেয়াল ও বাড়ি-ঘরের মধ্যেই—ঘেঁষাঘেঁষি করে একটু স্থান করে নিয়েছে। এই ফাঁকা আঙিনাটুকু বড় কিছু নয়, কিন্তু অনেকখানে অনেকদিন তাও মিলবে না। মেলে না, সত্যই মেলে না। অবশ্য তার জন্য আমাদের কেঁদে ভাসাতে হয় না, কেউ দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না। কিন্তু হঠাৎ যখন ঘরের বাইরে পা ফেলেছি—যেমন ভবানীপুর থানায় যখন কলে জলপান করবার জন্য আমি যেতাম বাইরে—তখন মন চমকে উঠত। হঠাৎ থানার উপরের সেই একফালি আকাশকে মনে হত পরম আত্মীয়। আর সামনেকার হাত কয়েক খোলা জায়গা—সেপাইরা যেখানে বসে চারপাইতে আড্ডা জমাচ্ছে, কিম্বা ধূলোর উপরে যেখানে করছে কুস্তি, অথবা সকাল বেলা যেখানে তারা বসে দাঁতন করছে, সাম্‌নে রয়েছে সুমার্জিত লোটা, কানে রয়েছে তৈলমলিন পবিত্র যজ্ঞসূত্র ;—নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত তারা, পৃথিবীতে কোনো তাদের তাড়া নেই, কোনো তাদের অস্বস্তি

নেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি বসে একমাত্র দাঁতন কাঠিটাকে ঘষে নিঃশেষ করাই তাদের দায়িত্ব—যখন সেই আঙিনাটুকুর মধ্যে আমি এসে দাঁড়াতাম কল থেকে আঁজলা করে জল পান করবার জন্য, দেখতাম ওপরের আকাশ আর কয়েক হাত ফাঁকা সেই জায়গাটুকু, তখন আমার বুক থেকে বেরোত এক অপূর্ব প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—ওই আকাশে আর আঙিনায়! সেই ফাঁকা জায়গাটা আছে তা আমি জানি; আকাশ ওপরে রয়েছে তা-ও আমি জানি; আর তার জন্য এমন নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করবারই বা কি আছে? পৃথিবীর সমস্তটাই দেয়াল, সব হাজতখানা—'সেলে'র ভিতরে বসেও এমন ভুল আমার হত না। আর আকাশও জানি কেউ কেটে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে নিতে পারবে না। পৃথিবী নিক্, সমুদ্র নিক্, কিন্তু আকাশকে পারবে না কেউ দেয়াল তুলে নিজের বলে ঘিরে নিতে,—এও আমি জানি। তবু আমি ওই থানার ফাঁকে দেখা ছোট্ট আকাশ চোখ ভরে পান করতাম, ওখানকার ছোট্ট ফাঁকা আঙিনাটুকু বুক ভরে গ্রহণ করতাম। আর আমার মনে একটা নতুন হাওয়া লাগত। তাতে এই কথাই যেন জেগে উঠত—কোন চেতনাপারের সুপ্ত স্মৃতির মতো—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—এই আকাশে আর আঙিনায়!

কলের জল পান করবার অজুহাতে আমি দিনে দু-তিনবার করে মিছিমিছি বেরিয়ে আসতাম। সব সময় দাবিটা তখন-তখন পূরণ হ'ত না। দেরী করতে হ'ত—কখনো সেপাইয়ের মর্জি হ'ত না; কখনো বা আমার সঙ্গে যে 'পাহারা' থাক্‌বে, সে উঠি-উঠি করেও দোস্তদের গল্পটা শেষ পর্যন্ত না শুনে উঠে আসতে পারত না। তবু বারবার আমি জলপান করতাম। তখন বৈশাখের দিন, বন্ধ ঘরে আমি দমে সেদ্ধ হতাম—সত্য; তবু অত বার জল না খেলেও চলত,—ওই আকাশ আর ফাঁকা আঙিনাটুকু না হলেও যেমন দিন

কাটত,—আসলে ওই আকাশ আর আঙিনাতেই ছিল আমার সব লোভ। একটুখানি আকাশ আর খানিকটা ফাঁকা আঙিনা, আর তারই মাঝখানে এক-একবার দাঁড়াতে পেয়ে আমার প্রাণ ভরে উঠ্‌ত, মনে হত—এই তো আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম!

ভবানীপুর থানা কিন্তু তেমন ভয়ানক জায়গা নয়। বরং থানা-জগতে তা শুনেছি কুলীন। তাকে নগণ্য বলা ঠিক হবে না। চমৎকার সুন্দর ইমারত। তার ভেতরে ছিল সেপাই ও দারোগা আর প্রচুর মশা ও ছারপোকা। তারা কেউ আমাকে পেয়ে খুশি হয় নি। তাতেই বোধ হয় আমার ওপর কীটজগতের ও কোতোয়ালজগতের অশ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। আমাকে তারা দেখলে নীরস। ওর দারোগা-সেপাই আমাকে জানলে আমি তাদের দায় মাত্র,—'এস্, বি'র আসামী। ছারপোকারা বুঝলে—আমি তাদের ঠকিয়েছি, আমার 'রুধির' সামান্য; তবু আমাকে নিয়ে তাদের বাঁচতে হবে। পাহারাদারেরা হুঁসিয়ার হল—আমাকে আগলে তাদের রাখতেই হবে, দিনে 'এস্, বি'র জন্য আর রাতে ছারপোকার জন্য। আমি ছিলাম ঐ দুই দলের উপজীব্য। আর তখন বৈশাখ মাস। বন্ধ হাজতের দেয়াল উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌ছে। বদ্ধ ঘর হয়ে উঠ্‌ছে উনুনের মত। গরমে আর মশায়-ছারপোকায় রাত কাট্‌ত। বাইরেও বাসের ডাক শুন্‌তে পেতাম ভোর চারটে থেকে। শুন্‌তে শুন্‌তে মন পাল্লা দিত 'শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া'। ট্রামের ঘর্ঘর শোনা যেত। তারপর বেলা বাড়ত। গ্রীষ্মের সকাল বেলার রোদ বাড়তে থাক্‌ত, রসা রোডের ট্রাফিকের যৌবন উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ত। আফিস-মুখো ট্রাফিক গর্জে উঠ্‌ছে, ফুলে উঠ্‌ছে, লাফিয়ে উঠ্‌ছে—আপনার উচ্ছ্বাসে আপনি যেন ফেটে পড়্‌ছে,—হাজতের ছোট্ট ঘর থেকে আমি তা বুঝতে পারতাম। শুনতে পেতাম জীবনের স্রোতধ্বনি। সেই স্রোত থেকে আমি অবশ্য তখন একটু দূরে এসে ঠেকেছি; তাই যেন বুঝছি কত প্রচণ্ড সেই স্রোত। কত প্রচণ্ড আর কত খরধার। দূরে না

হলে এই স্রোতে রোজকার মত আমিও আজ ভেসে যেতাম, একে এমন করে বুঝতে পারতাম না। আবার, শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়তো আমি ঐ স্রোতের ঠিক রূপ অনুভব করতে পারতাম না। তার জন্য ট্রাফিকের কলরোলও শুনতে পাওয়া দরকার। সেখানে আমি তা পেতাম—এইটাই ভবানীপুর থানার ছিল সব চেয়ে বড় দান।

সে দান যে কত মূল্যবান তা বোঝানো সহজ নয়। বাস হাঁক্‌ছে—'শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া, ডালহৌসি-ডালহৌসি'—সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা দৃশ্য যেন চোখের সাম্‌নে খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কলকাতার গাইড্‌-বুক নিয়ে বসেছি—যা কলকাতার থেকে কম সুন্দর নয়। কারণ কলকাতায় আমি ডুবে থাকি রাতদিন। আমার চেতনার উপরে সে ভেঙে পড়ছে। আমার চেতনা তারই প্রায় একটা খণ্ড। 'প্রায়'—সম্পূর্ণরূপে যে নয়, তাও সত্য। কিন্তু অদূরে হাঁক শুন্‌ছি যখন 'শ্যামবাজার, বাগবাজার' আর 'ডালহৌসি, ডালহৌসি' তখন আমার চেতনা কলকাতাকে তৈরী করবার অবসর পেয়ে গেল। কলকাতা তখন তাকে গড়ে তুল্‌ল না, আমার মনই কলকাতাকে গড়ে তুলতে লাগল। গড়তে থাক্‌ল নতুন করে নিজের খুশি-মতো, মনের মতো করে। যে মন অনেকাংশে কলকাতারই গড়া, তা'ই আবার গড়ে চল্‌ল অনেকাংশে কলকাতাকে। থানায় ছাড়া এ সম্ভব হত না—আর ভবানীপুর থানায় ছাড়া এ কাজের উপাদান সর্বত্র মিল্‌ত না। হাজত-বাস না হলে এমন সুযোগ পাওয়া যেত না। অমন ভবানীপুর থানার সেই ছোট্ট আঙিনায় বেরোতে পারলেও তবু মনে হ'ত—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আত্মীয়ের মুখ দেখলাম!

একটুখানি আঙিনা আর একটুখানি আকাশ, দিনে ওইটুকু দেখ্‌তে পারলেই মনে হ'ত—আমি আছি, পৃথিবী এখনো রয়েছে। অথচ এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ:—আমার মনের সাম্‌নে তো ছিল সমস্ত কলকাতা আর সমস্ত পৃথিবী, অতীত ও ভবিষ্যৎও।

এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ—তাও আবার থানার আবহাওয়া-ঘেরা আঙিনা আর আকাশ,—তার দিকে আমিই কি ফিরে তাকাতাম বাইরে কোনোদিন? সত্যিকারের আকাশ এই থানার আবহাওয়ায় নেই—তা কে না জানে? এখানে আকাশ আর আঙিনা দুইই কেউ প্রত্যাশা করে না, কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। এখানে প্রাচীর ও অন্ধকারই জয়ী, আমিও তা জানি। আর তা মেনে নিতেও আমার বিশেষ প্রয়াস পেতে হয় নি। আমার মনের সাম্‌নে ছিল কলকাতা, পৃথিবী আর নিখিল বিশ্বের পারাবার। তবু হঠাৎ যখন কলের জল পানের জন্য বাইরে এসে দাঁড়াতাম মনে হ'ত—এ কি বিস্ময়! সেখানটায় দেয়াল গায়ের উপরে এসে হুড়মুড় করে পড়ে নি—একটুমাত্র সরে দাঁড়িয়েছে হাত কয় দূরে; আর মাথার উপরে দেখা দিয়েছে খানিকটা আকাশ—চারদিককার বাড়িঘরের শাসন এড়িয়ে যতটুকু দেখা যাওয়া সম্ভব ততটুকু আকাশ;—আর অমনি মনে হয়েছে—আশ্চর্য, আশ্চর্য এই পৃথিবী!

শুধু 'মনে হয়েছে' বললে কিন্তু সবটুকু বলা হয় না। ও জিনিসটা মন দিয়ে বোঝবার দরকার হয় না। ও দেহ দিয়ে, সর্ব অঙ্গ দিয়ে অনুভব করা যায়। প্রত্যেক রোমকূপের মধ্য দিয়ে যেন ওর অস্তিত্ব দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। এ দেখা—চোখ দিয়ে দেখতে হয় না; এ বাতাস বুকে নেবার জন্য নাকে নিঃশ্বাস টানবার দরকার নেই। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ আপনা থেকেই বিস্ফারিত হয়ে পড়ে, আর নাক বাতাসের খোঁজ্ পেয়ে আপনা থেকে নিঃশ্বাস নেয়,—শ্বাসযন্ত্রকে একেবারে বায়ুস্রোতে ভরে নিতে চায়, কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড ছেড়ে সঞ্চয় করে নেয় অক্সিজেন। চোখ ও নাক এ সব স্বতঃপ্রণোদিত কাজ না করলেও দেহ তার আবেষ্টন সম্বন্ধে এক মুহূর্তেই সচেতন হয়। প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে আমরা অনুভব করি বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত

আঙিনা ও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আকাশ। বহু-বহু জন্ম পূর্বে আমার যে বেদনা-বোধ ছিল এখনো আমি একেবারে তা হারাই নি। তখন আমার চক্ষুর কোষগুলি এতটা নিপুণ, এতটা বিশিষ্ট, specialised হয়ে ওঠে নি। তখন সমস্ত দেহকোষের মধ্য দিয়ে আমি গ্রহণ করতাম আলো আর উত্তাপ। বল্‌তে গেলে, সেদিন সূর্য দেখতাম আমি সারা অঙ্গ দিয়ে। সেদিনকার দেখা এমন তীব্র নয়, এক কেন্দ্রে সংহত এই বেদনা নয়। তা একটা-মাত্র ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ারূপে স্বতন্ত্র, differentiated, হয়ে ওঠে নি। তা ছিল undifferentiated—সারা দেহে পরিব্যাপ্ত একটি অনুভূতি। আজও পৃথিবীতে তেমন প্রাণী বেঁচে আছে, কিন্তু আমি আর সমস্ত দেহ দিয়ে দেখতে পাই না, আমার সে শক্তি এক কোষ-কেন্দ্রে একত্র হয়েছে। আশ্চর্য সে ব্যাপার, এই একটু-একটু করে আমাকে আমার এই চক্ষুদান, miracle of miracles! কিন্তু তবু দেখ্‌ছি আমার দেহ এখনো হঠাৎ ফিরে পেতে পারে সেই স্মরণাতীত কালের শক্তি। হঠাৎ যখন আমি একবার একটু মুক্ত আঙিনা ও আকাশ পেয়েছি—খানিকক্ষণ দেয়ালের আর আঁধারের কবলে জীর্ণ হওয়ার পর যেই আমি পেলাম একটু মুক্ত বাতাস ও মুক্ত আকাশ—অমনি আমার সমস্ত দেহে যেন সেই অতি-আদিম অতি-পুরাতন বেদনা-বোধ ফিরে এল—আমার সারা শরীর বেয়ে এই আঙিনা ও আকাশ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল,—স্নায়ুতে স্নায়ুতে, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসার-সঙ্কোচে জাগতে লাগল তাদের অস্তিত্ব-বোধ। আর এই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক জটিল প্রক্রিয়ার যদি কোনো নাম দিই,—যে একটিমাত্র সহজ কথায় তা প্রকাশ সম্ভব—সে বাণী উচ্চারিত না হতে পারে, হয়তো মনও তা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে না; কিন্তু এই দেহগত অনুভূতির সঙ্গে জাগে তেমনি অতি প্রাচীন, অতি আদিম একটি বোধ—ভাষায় যার নিকটতম প্রতিধ্বনি বহন করে এই অনুচ্চারিত প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি কতদিনকার আত্মীয়ের দেখা পেলাম!

আকাশ আর প্রশস্ততাতে আমরা মুক্তির স্বাদ পাই—যে মুক্তি মানুষের অনাদিকালের কামনা। কেন সে মুক্তি মানুষের মনে কোন্ আত্মীয়ের কথা জাগিয়ে তোলে? ফ্রয়েড্ বলবেন, জীবন মানেই বন্ধন—Life is hard to endure! প্রকৃতির বন্ধন আর মানুষের গড়া বন্ধন। এই সব বন্ধন দিবানিশি কেটে কেটে আমাদের অস্থিমজ্জায় বস্‌ছে। আমাদের অস্থি-মজ্জা তাই চায় মুক্তি, চায় সহজ আনন্দ,—যার সামাজিক রূপ ও নাম হবে 'বীভৎস ভোগ'। কিন্তু মানুষ সামাজিক মানুষ, সেই বীভৎসতা থেকেও সে নিজেকে বাঁচাতে চায়। তাই সেজন্য তার আশ্রয়—কল্পনা, illusion; এই কঠোর বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সে সৃষ্টি করেছে কাব্য, সৃষ্টি করেছে স্বপ্ন, সৃষ্টি করেছে এক কালের সব চেয়ে বড় সৃষ্টি—পরমাত্মা। তাতে তার মুক্তির স্বপ্নও খোরাক পেয়েছে। অথচ জীবনের আধিভৌতিক-আধিদৈবিক নির্যাতন তার কাছে আর নির্যাতন হয়ে থাকে নি; হয়েছে পরীক্ষা, হয়েছে লীলা, হয়েছে রহস্য। জীবনের বন্ধন বড় কঠিন, তাই যেখানেই আমরা ব্যাপ্তি পাই, অবকাশ পাই, সেখানেই আমাদের মনে জাগে বিস্ময় ও বিশালতা—awe and adoration! মোতি মস্‌জিদ দেখে চোখ মুগ্ধ হয়, মনেও একটা রসানুভূতি জাগে, স্নায়ুতে জাগে স্নিগ্ধতা। কিন্তু শাজাহানের জামা মস্‌জিদে দাঁড়িয়ে চোখ আর দিশা পায় না। হঠাৎ জীবনের প্রাচীরগুলির ভিৎ ধ্বসে যায়, একেবারে দিগ্‌দিগন্তের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এত ব্যাপ্তি, অবাধ আকাশ,—কোথায় বন্ধন, কোথায় সঙ্কোচ, কোথায় আবেষ্টন? আমি না বিশ্বাস করি মস্‌জিদে, না রাখি তার মালিকের খোঁজ। এক নিমেষে তবু আমারও মনে হয়েছিল,—তুনিয়ার মালিক হমে নস্ত্, হমে নস্ত্, হমে নস্ত্। তুমি এখানে, এখানে, এখানে—দেওয়ানী খাসে নেই, দেওয়ানী আমে নেই—আছ মুক্ত আকাশে আর মুক্ত আঙিনায়। আর দিন কয় অন্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকলে অত দূর যেতে হয় না,—দিল্লী

দূরম্‌অশ্‌ত্‌—দিল্লী দূরের পথ,—ভবানীপুর থানার ছোট্ট আঙিনায় ও ছোট্ট আকাশের তলে বেরুতে পারলেও তখন দেহ-মন সাড়া দেয়, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরতে যে রেখাপাত হয় তাকে বলি,—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে ; আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম !

মোটের উপর, আকাশ এবং ব্যাপ্তি—এসবের সঙ্গে আমাদের মনের একটা আত্মীয়তা থেকে গেছে। সে আত্মীয়তা খুব সহজ, নাড়ীর টান। তাই যতক্ষণ তা অটুট থাকে ততক্ষণ তা আছে বলেই মনে হয় না। তাতে বাধা পড়লেই তখন সমস্ত চৈতন্য টন্‌ টন্‌ করে ওঠে। সুস্থতার লক্ষণ এই যে, তা স্বচ্ছন্দ—অচেতন। আমার হৃদ্‌পিণ্ড যত দিন স্বচ্ছন্দ ছিল ততদিন তার খোঁজই পেতাম না, জানতাম না যে ও-বালাই আছে। হঠাৎ যখন সে মুস্‌ড়ে গেল, উত্যক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল, তখন সমস্ত দেহমন তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পথ পায় না, নাস্তিত্বের বিভীষিকায় কাতর হল, তার সঙ্কোচ-প্রসার আমার সমস্ত চেতনার উপর তখন দাগ রেখে যেতে লাগল। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেকটির যোগ নিবিড় অথচ অচেতন ; সে যোগে বাধা পড়লেই আমরা তার দাম বুঝি। যতক্ষণ আকাশ আমার কাছে সুলভ ছিল ততক্ষণ তার দিকে চোখ তুলে দেখবারও আমার ফুরসুৎ ছিল না। অবশ্য, ব্যক্তিগত ভাবে আমার সম্পর্কে এই কথাটা খাটে না—আকাশ না দেখতে পেলে আমার মনের আকাশও আচ্ছন্ন হয়ে যেত। তবু, যতক্ষণ ইচ্ছা করলেই লাভ করা যেত একটু ফাঁকা, একটু ব্যাপ্তি,—সে গড়ের মাঠেই হোক্‌ আর হেষ্টিংসের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরেই হোক্‌,—ততক্ষণ আমার কাছে তার দাম তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে পায় নি। তারপর তিন দিন যেই আমি হারালাম সেই স্বাস্থ্য—মানে স্বাধীনতা (স্বাধীনতা আর স্বাস্থ্য একই কথা ; যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার দিকে নজরই পড়ে না। কিন্তু একবার যে-ই তা খোয়া যায় তখন সাধ্য কি মানুষ আর অন্যদিকে দেখে, অন্য কথা ভাবে ? পরম অস্বস্তিকর সে অবস্থা। তখনকার

সমস্ত কাজকর্ম হয় অত্যন্ত বেতালা, অস্থির ও অসুস্থ,—আয়র্লণ্ডের যেমন হয়েছিল, আমাদের যেমন হয়েছে),—আমি যেই হারালাম স্বাস্থ্য, আমার জীবন-গতির স্বচ্ছন্দতা, অমনি ভবানীপুর থানার সেই সিপাহি-রক্ষিত বদ্ধ আঙিনা আর বাড়ির-বেড়ায় ধরা বদ্ধ আকাশ, তাও আমার কাছে মনে হল বিধাতার আশীর্বাদ, স্বাস্থ্যের মতো স্বাধীনতার মতো তাঁর অকুণ্ঠ দান। একাদিক্রমে 'প্রবাসী' আপিসে দেড় বছর কাজ না করলে সেবার আমাকে পেয়ে বস্‌ত না নোয়াখালির জন্য সেই nostalgia—সেই নদীর জন্য, ঝাউসারের জন্য, নারিকেল বাগানের জন্য আকুলতা। ভবানীপুর থানায় সে কটা দিন আবদ্ধ হয়ে না কাটালে আমার কাছেও হয়তো অমন পরিষ্কার হত না এই আত্মীয়তা—আকাশের সঙ্গে, আলোর সঙ্গে, সেই নদীর সঙ্গে, মাঠের সঙ্গে, ঝাউসারের সঙ্গে আর নারিকেলের বনের সঙ্গে। ভাবতাম —ওটা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত' 'নিশ্চিন্দিপুরী'য় একটা স্মৃতি —যা তাঁর পক্ষেও আট-আনা খাঁটি, আট-আনা মেকি—আট-আনা অভিজ্ঞতা থেকে উজ্জীবিত, আর আট-আনা নোট্‌-বই থেকে উদ্ধৃত; —আর আমার পক্ষে ষোল আনাই নকল। কিন্তু ক'দিন দেখলাম না নদী আর মাঠ, তারা আর জলধারা, আর রেলওয়ের কামরায় বসেও আমার মনে হল আমি যেন নতুন করে ডব্লু. এচ্‌. হাড্‌সনকে পাচ্ছি, তাঁর ভাষাতেই আমার মন কথা কইতে পারে—

The blue sky, the brown soil beneath, the grass, the trees, the animals, the wind, the rain, and stars are never strange to me; for I am in, and of, and am one, with them; and my flesh and soul are one, and the heat in my blood and in the sunshine are one, and the winds and the tempests and my passions are one.

'The winds and the tempests and my passions

are one.' কত সত্য তা। আর কত সত্য আরও সেই গম্ভীর প্রশান্ত আকাশের নির্বাক ঔদাসীন্য, কঠিন গাম্ভীর্য—এই আত্মীয় আকাশের ক্রুর রহস্য,—হিমালয়ের গাম্ভীর্য আর অটল স্থৈর্য! কত সত্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, জানতাম কি তা—যদি বক্‌সায় কাঁটাতারের ঘরে বন্ধ না থাকতে হত—ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের চোখের তলে কোন বন্দী শিকারের মতো? যদি পাহাড়ে ঝর্ণার গর্জন না পৌঁছত কানে? আর মৃত্যু আর নিস্পন্দ পর্বত আর মৌন অন্ধকারের সঙ্গে সেই পাহাড়ের কোলে আমায় মুখোমুখি করতে না হ'ত রাতের পর রাত? বুঝতাম আমি কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে—যাঁর মধ্যে ছিল অত সত্য—আর অত মিথ্যাও?

Low breathings coming after me,
Of undistinguishable motion……

আর—

The sounding cataract
Haunted me like a passion : the tall rock,
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite ;……

প্রকৃতির এত নিকটে আমি পৌঁছুতে পারতাম না,—দেখতাম শুধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বলা প্রকৃতির নীতিবাগীশতা কবির কত মন-গড়া কথা, বুঝতাম না প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই নিগূঢ় আত্মীয়তাও কত সত্য; আমারও এই আত্মীয়তা কত বাস্তব—যদি অনেক-অনেক দিন আমাকে কয়েদখানার আড়ালে আবদ্ধ না থাকতে হত—প্রকৃতির সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক আমার বন্ধ হয়ে না যেত। বোঝে না তা মানুষ—যতক্ষণ এই সম্পর্ক থাকে একান্ত। একান্ত সে, তাই সে তখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মও। তা বদ্ধ হলে অস্বচ্ছন্দ সে নিজের সম্পর্কে, প্রকৃতির সম্পর্কেও। অপ্রাকৃতিক তার কাছে তখন প্রকৃতিও।

অথচ আকাশ ও ব্যাপ্তি আমরা পাই না, এই বিশালতা থেকে আত্মবঞ্চনা করার চেষ্টাও আমাদের জীবনে অভ্যাসগত হয়ে উঠেছে। অনেকাংশে প্রাণগতও। অনাবৃত আকাশ আর প্রসারিত দিগঙ্গন—এর বিপুলতা থেকে নিজেকে আমাদের বাঁচাতে হয় বাঁচার দায়ে। আমরা বাধ্য হয়ে বন্ধন সৃষ্টি করি ; আড়াল আমাদের মেনে নিতে হয় প্রকৃতিরই আদেশে। আকাশকে আমাদের মাথার ওপর থেকে বাদ দিয়ে নিজেকে আমরা নিই ঘিরে। আমরা ঘর বাঁধি, তার ওপরে আচ্ছাদন চাই-ই, আর তার চারদিকে আবেষ্টন না হলেও চলে না। আমাদের দেশের মতো দেশে যেখানে প্রকৃতি মোটেই করালী কালী নন, সেখানেও ঘর চাই-ই, নইলে প্রাণধারণ অসম্ভব। আমাদের দেশের আকাশের মতো আকাশ আর এদেশের শ্যামল প্রশস্ততা, তাও অস্বীকার করতে হয়। আর যেখানে প্রকৃতি সন্ন্যাসিনী কিম্বা ভীমা রুদ্রশক্তি—সেখানে তো প্রকৃতির পরাক্রম থেকে প্রাণ আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমনই হোক, আশ্রয় আমাদের চাই—পাতার, খড়ের, কাঠের, ইটের, পাথরের, টিনের, কংক্রিটের, ইস্পাতের, কাচের—যা কিছুর হোক। একটা আবরণ মাথার ওপর না পেলে, একটা বেড়া নিজের চারদিকে না সৃষ্টি করতে পারলে, প্রাণ বাঁচে না। মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই চাই। একদিন পর্বতের গহ্বরে আমরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছি, আকাশের তলায় বাঁচতে পারি নি বলে। শেষে যাযাবরের তাঁবু ছেড়ে আমরা হয়েছি গৃহস্থ। আমাদের সমস্ত সভ্যতা এই আশ্রয়-রচনার ইতিহাস—আকাশকে আড়াল করার ও দিগন্তকে আবৃত করার চেষ্টা! নইলে আমরা বাঁচতে পারতাম না। এই আমাদের ঘরের ভিত্তি যেদিন গাড়লাম সেদিন থেকেই আমরা পেলাম প্রকৃতির দাক্ষিণ্য—অর্থাৎ সেদিন থেকে প্রকৃতিকে আর একটু হার মানতে হল। আর সেদিন থেকে হারাতে লাগলাম আকাশের ঔদার্য আর ভূমার প্রসার। হারালাম মাথার ওপর থেকে, চোখের সুমুখ

থেকে, আর ঠিক তাই আমাদের মনের তলায় সেই বিরহ সেদিন থেকে একটু একটু করে জমে উঠতে লাগল। আমরা যতই গৃহ বাঁধছি ততই মুক্তির বেদনা জমে উঠছে। যতই আমাদের আকাশ মুছে ফেলছি কলের ধোঁয়ায় আর পৃথিবীর ধূলোতে, ততই আমরা দেখতে চাই আকাশের মুখ। পৃথিবীর বুক যতই আমরা খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি বাড়ি তুলে, প্রাচীর তুলে, ইমারতের আশ্চর্য বোলতার চাক রচনা করে, ততই আমরা খুঁজছি পৃথিবীর নিরাবরণ উদাস-করা ব্যাপ্তি। তাই, উঠছে আমাদের স্কাই-স্ক্রেপার—আমাদের আকাশ-চাওয়া গোপন-কামনার সাক্ষী। উড়ছে আমাদের উড়োকল—আমাদের ব্যাপ্তিকামী উদার স্বপ্নের প্রতিমূর্তি। তাই, আমরা পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরোই, গ্লোব-ট্রটার হই, আউটিং ও হাইকিং আমাদের নেশা হয়ে ওঠে। অনেক আড়াল সৃষ্টি করেছি, আপনাকে অনেক বঞ্চিত করেছি, তবে আমাদের জীবনযাত্রায় ফুটেছে এই অপেক্ষাকৃত নির্ভাবনা। অথবা অপেক্ষাকৃত কম দুর্ভাবনা। কারণ সত্যই কতটুকু আমরা পেয়েছি? পৃথিবী পায়ের তলায় দু' ইঞ্চি ধ্বসে গেলে আমরা বুঝি কত অসহায় আমরা—দু'সেকেণ্ডে আমাদের সমস্ত ধর্ম ও সভ্যতা হয়ে যায় ভূমিসাৎ। তবু আমরা খানিকটা অধিকার পেয়েছি। খানিকটা সহনীয় হয়েছে আমাদের ভাগ্য। কিন্তু অনেক হারিয়ে, অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে। অথচ ভিতরে-ভিতরে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি। তাই ওপরে চাপাচ্ছি আরো বাড়ি, আরো ইমারৎ, যেন কোথাও আর ফাঁক না থাকে। ঘরের আড়ালে, দেয়ালের আড়ালে আমরা নিজেদের সুরক্ষিত করে নিচ্ছি।

অবশ্য আকাশ ও ব্যাপ্তি কোনটাই আমরা এখনো অতটা হারাই নি—আমরা, মানে আমাদের দেশে 'আমরা'। এখনো আমরা প্রকৃতিকে অতটা দূরে সরিয়ে দিতে পারি নি—এখনো আমরা প্রকৃতির থেকে অত দূরে সরে যাই নি। এখনো আমাদের কাছে আকাশ নিকটের—অচেনা নয়, ধোঁয়াটে তামাটে আচ্ছাদন নয়, আমরা

ইমারতের আড়ালে তাকে আড়াল করে ফেলি নি। আমাদের শহর মাত্র দু'চারটি, গ্রাম অসংখ্য। আমাদের মাঠ অবারিত; দেশ গাছ লতা পাতায় শ্যামল, আকাশে গিয়ে ঠেকে তার সীমানা। এখনো আমাদের কাছে গঙ্গা-যমুনা প্রাণময়ী, হিমালয় যেন ভারতবর্ষের শিয়রে জাগ্রত কোন অতন্দ্র গৃহকর্তা, সমুদ্র যেন আমাদের কাছে এক আশ্বাস ও এক আড়াল।

না, আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাই নি। আর তার মানে আবার আমরা প্রকৃতিকেই পাই নি। এখনো আমরা প্রকৃতিকে আয়ত্ত করি নি—আর তাই জানিও না প্রকৃতিকে। প্রকৃতিকে আমরা যতই আয়ত্ত করি, ততই আমরা জানি প্রকৃতির মূল্য, আর জানি নিজেদেরও প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির যত কাছে, প্রকৃতির সম্বন্ধে আবার ততই আমরা অচেতন; কারণ, তখন আমরা আর প্রকৃতি একাত্ম। আমরা আজ প্রকৃতির তত কাছে তো আর নেই —একেবারে অসহায় ভয়ে-বিস্ময়েও আর তাকে দেখি না। সে যুগ পার হয়ে এসেছি আমরাও। সে ছিল মানুষের আদিম একটা যুগ। তখন nature mythই ছিল মানুষের সহজ কল্পনা, হয়ত বেদে পুরাণে তার চিহ্ন রয়েছে। সাঁচির তোরণে জীবচিত্রের সহজ স্ফুরণে রেণে গ্রসে তারই সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের কাছে পশুপাখী বরাবর কথা কয়—মানুষের মতো, মানুষের ভাষায়, মানুষের ছাঁচে তারা ঢালা। ইউরোপ 'হিতোপদেশে'র এই বিস্ময়কর কাণ্ড ভুলতে পারে না; Jungle Book কিন্তু আমাদের কাছে একেবারে সহজ গল্প। তার কারণ আমরা প্রকৃতির থেকে বেশি দূরে সরে যাই নি। অবশ্য জীবনে আমরা বনানীর ছায়াও কাটিয়ে উঠেছি। গুহা-গহ্বরের যুগও পার হয়ে এসেছি—প্রকৃতির সেই প্রথম পরিচয় আমাদের কাছে আজ বিস্মৃত না হলেও জীবন্ত নয়। আমরাও প্রকৃতিকে খানিকটা আয়ত্ত করেছি—এসে গেছি কৃষির যুগে। তাই গঙ্গা-যমুনা হয়েছে আমাদের কাছে দেবী; তাদের নিয়ে আর আমরা

নতুন গাথা রচনা করি না। মেঘ আর 'ইন্দ্র' বা 'বৃত্র' হয়ে ওঠে না; —দেবতার দান অবশ্য তা থেকেই। আমরাও অনেকটা প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র হতে পেরেছি—প্রকৃতির রূপ আমাদের চোখে তাই রূপক হয়ে উঠেছে। নেই সেই শিশুমনের ভয় আর বিস্ময়—awe and adoration—আর ভাবি না সে দেবী, ভাবি না সে দানবী; দেখি না 'সাবিত্রী'কে, দেখি না 'সোম'কে। কোথায় সে প্রচণ্ড রুদ্র, কোথায় সে প্রবল মরুৎগণ? কোথায় বা সে কালী করালী, কোথায় বা সে দয়াময়ী জননী? না, আমাদের ইতিহাসের সে যুগও চলে গেছে—গঙ্গা-যমুনাও আর আমাদের শুধু দেবতা হয়েই নেই। আমরা তার পরেও আরও এগিয়ে গেছি—তাই প্রকৃতি আমাদের আর ততটা কাছে নেই। সেই আদিম প্রকৃতি-কাহিনী রচনার যুগ শেষ হলে আর তো মানুষ প্রকৃতিকে তেমন প্রাণময়ী রূপে কল্পনা করে না। Lilies of the field দেখে তখনো হয়তো সে মুগ্ধ হতে পারে; কারণ, বিধাতার রূপ-সৃষ্টির আশ্চর্য শক্তি তাতে সে দেখে,—তা প্রকৃতি-প্রেম নয়। মেঘকে দূত করে, সখা করে; কিন্তু জানে সে ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের সমন্বয়, তার প্রাণ নেই। তাই রূপ হয়—রূপক। আজও আমরা প্রকৃতির কতকটা কাছে আছি—নন্দলাল হিমালয়ের রূপে দেখেন শিবশম্ভুরূপ; আমরাও তা মেনে নিই। হিমালয় নিজরূপে আর দেবতাত্মা নেই, আজ সে পরমাত্মার এক রূপক। আধ্যাত্মিক যুগ এলে প্রকৃতির নিজ যুগ ফুরোয়—তখনকার গাছলতাপাতা শুধু পরমাত্মার advertisement:

> Character of the great Apocalypse
> The types and symbols of eternity,
> Of first and last, and midst and without end.

অবশ্য তা থেকেই আবার তার একটা মর্যাদাও আসে। কারণ বিশ্বাত্মা অনলে অনিলে সর্বত্র ঠাঁই নেন; আর তাই অনল অনিলেরও আবার একটা মর্যাদা লাভ ঘটে। কিন্তু সে নিতান্ত সেই বিশ্বাত্মার

ছায়া বলে, রূপক বলে—নিজের গৌরবে নয়, তাঁর বিজ্ঞাপন হিসেবে। হিমালয় হিমালয় হিসেবে আমাদের কাছে আসে নি—এসেছে দেবাদিদেবের এক প্রতীক হিসেবে।

আসলে, সভ্যতা আরও না এগোলে প্রকৃতির আসল রূপও আমরা আবিষ্কার করতে পারব না। যতই প্রকৃতিকে আমরা আয়ত্ত করব, ততই আমরা দেখতে পাব তার প্রকৃত রূপকে। Man was born in chains: he is trying to be free. মানুষ জন্মেছিল শিকলে-বাঁধা, এই হল সত্য, রুশো যা'ই বলুন। তাই সমাজের দীর্ঘদিনের কবিতায় চিত্রে সেই প্রকৃতি-প্রেমের সামঞ্জস্য ছিল না। আমরা 'মেঘদূত' লিখেছি—কিন্তু সহজ 'প্রকৃতি-দৃশ্য', 'ল্যাণ্ডস্কেপ্' এঁকেছি কোথায়? প্রাচীন ইউরোপেই বা তা কোথায় বেশি? চীনা চিত্রে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তা কই? রাজপুত চিত্রকলায় এসে দেখলাম সে দৃশ্য। সঙ্গীতেও দেখলাম তখন প্রকৃতির ধ্যানরূপ,—মল্লার কি দীপক, ভৈরবী কি পূরবী। তাও যেন রূপক। 'রাগমালা'র চিত্রে প্রকৃতির থেকে বড় প্রতিকৃতি। আর কাব্যে গানে সবখানেই সেই 'শাঙন ঘন গহন মোহ' আমাদের মানুষের জীবনের শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট। খুব সহজ আর স্বাভাবিক তা, আমরাও প্রকৃতিকে তাই এভাবেই দেখছি—হয় প্রতীক, নয় প্রেক্ষাপট। এমনিই তো চলেছিল যতদিন আমরা আবার ইংরাজি কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির নতুন সত্তার সংবাদ না পেলাম। কিন্তু ইংরাজি কবিতাই বা সেই সত্তার সংবাদ পেল কবে? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে—অর্থাৎ বিলাতের শিল্পবিপ্লবের দিনে, যন্ত্রশক্তির সহায়তায় যখন থেকে মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে শুরু করেছে—সত্যই দূরে যেতে শুরু করেছে তখন থেকে অমন এলিজাবেথীয় কবিতায় কোথায় সেই প্রকৃতি-প্রেম? মামুলি জিনিস সেখানে প্রকৃতি—কাব্যের একটা মামুলি উপকরণ। অষ্টাদশ শতাব্দী এল, ওদের শহুরে সভ্যতা বেড়ে উঠল—একটু একটু করে প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতনতাও দেখা দিল।

এল সেদিনের সমাজ-বাঁধনে বদ্ধ রুশো আর তাঁর দল। সমাজ তখন বেচাল; তাঁরা ঠাওরালেন—প্রকৃতিতেই বুঝি ছিল মুক্তি, আছে পরিত্রাণ। অতএব, 'ফিরে চলো বনে'—'Back to Nature'। প্রকৃতি আর মন-গড়া প্রাকৃতজনের স্বপ্ন হল তাঁদের সম্বল। রুশোর পর থেকে শুরু এই অপ্রাকৃতিক স্বপ্ন—সবাই ভাবলে সভ্যতাই বুঝি ব্যাধি। কে জানে ফরাসী বিপ্লবের মর্মকথা বুঝলে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আর অমন 'প্রকৃতি-প্রেমিক' থাকতেন কিনা? না, শিল্প-বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হতেন? বিপ্লবের স্রোত থেকে যত ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ দূরে সরলেন ততই প্রকৃতির কোলে আশ্রয় খুঁজলেন; জীবন থেকে যতই বিদায় নিলেন ততই প্রকৃতির ঘরে প্রতিষ্ঠা করলেন এক মন-গড়া জীবন। সে প্রকৃতি অতিপ্রাকৃতিক, তিনি আরাধ্যা হলেন, হলেন নিশ্চলা নীতি। ততক্ষণ শিল্প-বিপ্লবে ব্রিটেনের সৌভাগ্য রচিত হচ্ছে—হয়তো সেই গ্রামের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রক্তময় কল-কারখানা দেখেই কবিরা আরও প্রকৃতিমুখী হয়ে উঠলেন। আর ততক্ষণে রুশো-গড্উইনের আকাশচারী ছাত্র শেলি বিপ্লবের ব্যর্থতায় শূন্যে পাখা ঝাপ্টাতে লাগলেন। তাঁর চোখে প্রকৃতি হলেন মুক্তা, স্বাধীনা—প্রোমিথিউসের প্রেমিকা। জীবনে তাল রেখে এগুতে না পেরে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতিকে দেখলেন অবিচলা নীতি হিসেবে। জীবনের তাল আর কল্পনার তালে খাপ খেল না বলে শেলি প্রকৃতিকে দেখলেন প্রগতি হিসেবে। আর এই দুই দেখা শেষ হতে না হতেই ডারুইনের দিন এল—প্রকৃতির রক্ত-নখর-দন্ত-নয়নও আর কারো চোখ এড়িয়ে গেল না।

না, প্রকৃতিকে তেমন প্রথম যুগের মতো আর আমাদের আপনার করে নেওয়া চলে না। চলে না বলেই আমরা এদিনের নাগাল পেয়েছি—আমরা মানুষ হয়েছি, মানুষ হতে চলেছি। শুধু 'প্রকৃতির সন্তান' আমরা নই, সেই natural piety আমাদের নেই। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ যা'ই বলুন, প্রকৃতির ও মানুষের মধ্যে সেই মমতা নেই—তিনি

আমাদের মাতৃরূপা, হয়তো বা ধাত্রীস্বরূপা। কারণ, আমাদের মানব-প্রকৃতিও আসলে বিশ্বপ্রকৃতিরই তো একটা প্রকাশ আর পরিণতি। কিন্তু আমরা প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এসেছি—আমাদেরও একটা স্বতন্ত্র সত্তা আমরা আবিষ্কার করেছি। ওখানেই আমাদের আসলে নিজস্বতা—মানব-প্রকৃতি হিসেবেও বটে, জীব হিসেবেও বটে। প্রকৃতির কোলে শিশু কে? তারই দেহে দেহ মিশিয়ে আছে—জন্মে নি, বাড়ে নি, দেখে নি, আপনাকে, দেখে নি প্রকৃতিকেও। প্রকৃতির কোলে শিশু থেকে যায় গাছ আর লতা পাতা—অচেতন প্রাণী। তারা তো জীবনের প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র—কয়েকটা পরীক্ষা। জীবন তাদের মধ্যে ফুটে উঠতে পায় নি—শুধু পথ খুঁজেছে; ভ্রূণের মধ্যে মানুষ যতটা আছে ওদের মধ্যে ততটাও নেই জীবনের প্রকাশ। শুধু শিশুতে কি মানুষের কোন পরিচয় আছে? কিছু নেই। শিশু আর শিশু থাকে না বলেই তো তার মূল্য। সে মায়ের কোল ছেড়ে একটা নতুন মানুষ হয়ে উঠবে বলেই তো মায়েরও তাতে মর্যাদা। তা হলে "প্রকৃতির পুত্র" আমরা থাকি না বলে দুঃখই বা কি? আমরা বড় হই, বড় হচ্ছি—প্রকৃতিকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছি। শিশু তো এখনো আছে অসংখ্য জীব আর অগণিত প্রাণী। তারা এখনো প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি—সামান্য পরিবেষ্টনীর একটু অদল বদল হয়েছে কি তারা জাতকে জাত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিরও কোনো মায়া নেই তাদের জন্য, কোনো মমতা নেই সেই জীবপ্রকৃতির জন্য। আকাশ উদাস চোখে তাদের জন্ম-মৃত্যু দেখে, একটি নিঃশ্বাস ফেলে না তাদের জন্য বাতাস। আমাদের জন্যই কি ফেলে চোখের জল? কতবার আমাদের জীবন তার ছাড়া-পাওয়া ফুৎকারে উড়ে যায়—একবার সে মাথা নাড়লে আমাদের হাজার প্রাণ ধূলোয় লুটোয়। বিহার ধ্বসে গেল একটি সামান্য কাঁপুনিতে, এক সামান্য ফুঁতে প্রশান্ত মহাসাগরের দু' তীরে শহর গ্রাম উড়ে গেল, তার অগ্নিশ্বাসে ছাই-চাপা পড়ে গেল পম্পেই; তার মরু-গ্রাসে তলিয়ে গেল খোটান

আর মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ-জগৎ। হয়তো আমরাও আবার তলিয়ে যাব কোন দিন—যুগ যুগ পরে কোন বরফ-স্রোতে, কিংবা যাব পুড়ে শুকিয়ে কোন উষ্ণযুগের তরল অগ্নিধারায়! কোন্ নিয়তি আমাদের জন্য রচনা করছে প্রকৃতি, কে জানে—কে বলবে?

হয়তো আমরা প্রকৃতিকে জয় করছি শেষ পর্যন্ত এমনি পরাজিত হব বলেই। তবু প্রকৃতিকে আমরা জয় করছি বলেই আমরা প্রকৃতিকে পাচ্ছি—তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। আবার, প্রকৃতিকে জয় করেও আমরা সে জয়ের ফল ঠিকমত ভোগ করতে পারছি না। আজ তাই সেই 'প্রকৃতি-প্রেম', সেই 'প্রকৃতি-বোধ' আমাদের নতুনভাবে আলোড়িত করছে। জীবনকে ঠিকমত সাজিয়ে নিতে পারছি না, সংহত করে নিতে পারছি না, তাতে বিকৃতি থেকে যাচ্ছে। আর তাই রুশোর ধারাতেই ভাবি ফ্রয়েডীয় ভাষায়। ভাবি, আমাদের এই প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ বুঝি একটা অভিশাপ। ভাবি, সেদিন যদি ফিরে পেতাম যেদিন আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ ছিল নিবিড় এবং সহজ! আসলে, সে "সহজ যুগ" শেষ হয়েছে যেদিন থেকে আমরা প্রকৃতির বন্ধন কাটিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি,—গুহা ছেড়েছি, গহ্বর ছেড়েছি, হয়তো যেদিন থেকে মানুষ হতে আরম্ভ করেছি—সেদিন থেকেই। মানে, সহজ আমরা আর নেই যেদিন থেকে প্রকৃতিকে চিনতে আরম্ভ করেছি সেদিন থেকেই। কিন্তু সহজ আমরা হচ্ছিও আবার—বাধা কাটিয়ে;—যতই চিনছি নিজেদের, ততই চিনছি প্রকৃতিকে বেশি করে; সহজে ততই প্রকৃতিকে আপনার করে নিচ্ছি। এই সত্যটাই সভ্যতার এই বিকৃতির মধ্যে আমরা ভুলে যাই—প্রকৃতির মধ্যে আর আমরা মিলিয়ে যেতে পারব না, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। ডি. এচ্. লরেন্স যত চেষ্টা করুন—তেমনি life of nature বা life of instinct-এ আর ফেরা স্বাভাবিক নয়। আসলে, তাঁদেরও এটা প্রকৃতি-প্রেম নয়, যুগের বিকৃতির প্রতিক্রিয়া—জীবনের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সত্য তা'তে

আছে ঃ জীবনে প্রাণ-বেগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ চাই,—যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আছে জীব-জগতের। কিন্তু মিথ্যাও তার তাই এত মারাত্মক। মানুষ আর জীব সম্পূর্ণ এক নয়—আমার মধ্যে প্রাণবেগ ব্যাপকতর প্রকাশের পথ চায়—মানব-প্রকৃতি শুধু সেই মূল প্রকৃতিরই প্রতিধ্বনি নয়, পুনরুক্তি নয়;—একটা নতুন প্রকাশ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার সহকারী, একটা আবির্ভাব।

সহজ আমরা হব যখন আমাদের আর প্রকৃতিকে সহজ করে নিতে পারব, বুঝব এই কথাটা—আমি প্রকৃতিকে জয় করেই তাকে চিনছি, আর প্রকৃতিও সেই জয়-পরাজয়ের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মানবপ্রকৃতিকে চেনবার পথে আমাকে এগিয়ে দিচ্ছে। যত আমরা প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত হব, তত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মিলনের পথ নিকট হবে, সহজ হবে; অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মোহ থেকে তত মুক্ত হব—আর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবে তত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। যত আমরা বন্ধনমুক্ত হব, জানব,—এই আকাশ কত অসীম, এই ব্যাপ্তি কত দিগ্‌দিগন্তব্যাপী; জানব, সূর্য আর দেবতা নয়, চন্দ্র শুধু মড়া পৃথিবী;—জানব গাছ-লতা-পাতার নিয়ম,—চিনব প্রকৃতির গতি। আর ততই বুঝব—এই সূর্য আমার প্রাণকে জীইয়ে তুলছে, এই পৃথিবীর সামান্যতম পরিবর্তনে আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায়; বুঝব প্রকৃতি আমার জীবনের কত বড় পরিবেশ, কত সক্রিয় তার দান আমার মনের ওপর। আর কত সত্য নারিকেলের ছায়াবোনা সেই ছোট শহরের দান, নদী-ধোয়া মাঠ-ঘাটের রূপ, শিশির-ভেজা ঘাসের ফুলের চাহনি, ঝাউ-এ ছাওয়া লাল সড়কের ডাক, বাদামতলার ঘনছায়ার স্মৃতি, বান-ডাকা নদীর বিপুল উচ্ছ্বাস,—বুঝব হাড্‌সনের Far Away And Long Agoর চেয়ে কম নয় সেই ছোট্ট নোয়াখালির স্মৃতি আমার মনে—sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart—আর বুঝব সে বিমূঢ় বিস্ময় কত সত্য বক্‌সার নিদ্রাহীন রাত্রে যখন মনে হত হিমালয় আমার মুখের উপর ঝুঁকে

পড়ে আছে, বর্ষণস্নাত অপর্যাপ্ত বনানীর জলধারা ঝরছে, আর দু'দিকে ঝর্ণার জলের প্রচণ্ড কলরোলে আমার চেতনা মথিত হচ্ছে। বুঝব সেদিন প্রকৃতি কত সক্রিয় আমারই জীবনের পক্ষে, কত তার দান; বুঝব সেদিন—আকাশ আমাদের কত আত্মীয়।

আমরা প্রকৃতির থেকে দূরে গেছি বলেই প্রকৃতিকে চিনছি। সমুদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছি বলেই বুঝি—সমুদ্র আমাদের কত বড় সান্ত্বনা। সেক্‌স্‌পীয়রকে পেয়েছি বলেই আবার জানি—সমুদ্র আর সেক্‌স্‌পীয়র জোগায় কত বড় মুক্তির প্রেরণা। Magnitogorsk গড়তে পেরেছি বলেই আবার নতুন করে গড়ছি garden city. বুঝছি, কত স্বাস্থ্যকর অরণ্যের রূপ। ছুটি তাই সমুদ্রোপকূলে, ছুটি পর্বত-শৃঙ্গে, ছুটি যেখানে মাঠ অবারিত, আর আকাশ অখণ্ডিত। প্রকৃতিকে আর প্রতীক করে তুলছি না—তুলছি আমার সক্রিয় সঙ্গী করে। যেই বাঁধা পড়ি কয়েদখানার ছোট ঘরে অমনি বুঝি আঙিনাও কত সত্য আমার কাছে, আকাশ আমার কত আত্মীয়।

আকাশ আর আঙিনা, এ দু'য়ের মর্যাদা তাই আমরা এখানেই ঠিক বুঝতে পারি। দিনে মাত্র দু'ঘণ্টা তো। কাল আবার একটু গোলমাল বাধে। ফলে আমরা ওই দু'ঘণ্টার এই বেড়ানোর স্বাধীনতা হারিয়েছি —অন্তত কিছুদিনের মতো। এতটা আকাশ, এতটা আঙিনা, সবখানে মেলে না; তাই ও নিয়ে আমাদের দুঃখ নেই। আর কিইবা এই আকাশ আর আঙিনা? দেয়ালের আড়ালের সামান্য কয়েক হাত জমি আর তার ওপরকার কতকটা আকাশ,—দিনশেষে দু'ঘণ্টার জন্য— এই তো। ভিতরের সঙ্কীর্ণ আঙিনায় ও ঘরে অতএব দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের খেলা জমেছিল, গল্প জমেছিল, আর চলেছিল দ্বিগুণ তেজে ঘরের ভিতরেই ভ্রমণ। সন্ধ্যাটা বেশ কেটে গেল।

যখন অনেক রাতে শুয়েছি, মনে হল—কাকে যেন আজ দেখি নি।

প্রেসিডেন্সি জেল,

১৯৩৪।

কবিতার রাত

কথা বলতে বলতে মাঝখানে আমি থেমে পড়লাম।—চাঁদ! লাল থালার মত চাঁদ! জানালার দিকে চোখ গিয়েছিল। গরাদ-বসানো যে জানালা ভাগ্যক্রমে ছিল আমার সামনে। তার মধ্য দিয়ে চোখ সহজভাবে গিয়েছিল,—কথাটা আর শেষ হল না।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—কি ?

—চাঁদ।

এগিয়ে এসে বন্ধু পাশে বসলেন, বললেন—

—পূর্ণিমা বুঝি, অগ্রাণের পূর্ণিমা।

চাঁদ। থালার মতো চাঁদ পূর্ণিমার, গোল আর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ। ঠিক আমার চোখের সামনে, একেবারে চোখের বরাবর—সামনেকার ঘাসে ছাওয়া আঙিনাটুকু পেরিয়ে, পুকুরের ওপারে, অশ্বত্থগাছটি যেখানে তার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছে সেখানে,—আমার চোখের বরাবর। উঁচুতে নয়, অশ্বত্থের গোড়াটা যেখান থেকে ত্রিধা হয়েছে—সেখানটায়; দুটো প্রকাণ্ড ডাল মাঝখানে রচনা করছে একটি ফাঁক। সুন্দর এই অবকাশটুকু, দুই শাখার মাঝখানে নিভৃতে একখণ্ড নীল আকাশ, গাছের ডাল যেন তাকে ঘিরে আপনার করে নিয়েছে। আর ঠিক তারই মধ্যখানে কখন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো তার রঙ লাল, আকার বিস্তৃত, সোনার থালার মত।

বেশিক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকা চলবে না। বেশিক্ষণ পাওয়াও যাবে না চাঁদকে দেখতে। প্রকাণ্ড আমার জানালা। আসলে এককালে তা দরোয়াজাই ছিল, যদিও গারদ-বসানো। কিন্তু একটু পরেই অশ্বত্থশাখার বাহু-বন্ধন-মুক্ত হয়ে চাঁদ ওপরে উঠে পড়বে; আর একটু ওপরে উঠতেই তাকে তখন ঢেকে দেবে অশ্বত্থের ঘনপাতা। সে পাতার ফাঁক দিয়ে অবশ্য অজস্রধারে জ্যোৎস্না ঝরে পড়বে গাছের

তলায়। ওখানকার সেই লাল সুরকির ওপর আলো-ছায়ার বিচিত্র মোজেইক্ কাটা হবে। কিন্তু আমার এখান থেকে তা বড় দূর। মাঝে এই ঘাসে ভরা আঙিনা, তারপর ওই পুকুর, তারও ওপারে সেই অশ্বত্থগাছ। আমি অশ্বত্থতলার কিছুই দেখতে পাব না। দেখব ঝাপ্‌সা কালির পোঁচের মতো তার তলাকার ছায়া, আর আকাশের পটে আঁকা তার সিল্যুএট্-করা পত্ররাজি। আমি কিছুই দেখতে পাব না। তখন চাঁদও আমার সামনে থেকে সারা রাতের মত হবে পত্রান্তরালে আচ্ছাদিত। বেশিক্ষণ এই সোনার থালার মতো গোল চাঁদ দেখা যাবে না। বেশিক্ষণ আমারও এই পঁচিশজনের সরকারী ঘরে এভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকা চলবে না।

তবু উঠতে ইচ্ছা করে না। একটু পরেই তো চাঁদ আড়ালে পড়ে যাবে। তবে ঘণ্টা দেড় বাদে আবার আমার চোখের সামনে চাঁদ আর একবার এসে দাঁড়াবে। এই জানালার সামনে আবার তার প্রকাশ হবে—অশ্বত্থ-শীর্ষের উপর দিয়ে দক্ষিণের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে। তখন অনেকক্ষণের মতো তার তেরছা আলো এসে পড়বে আমার শয্যাপার্শ্বে, আমার আসনের ওপর। ক্রমে তা সরল-রেখায় সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তারপর তা আমার শিয়র থেকে নেমে জানালার তলায় আসবে। সেখান থেকেও পিছিয়ে দাঁড়াবে, একেবারে ঘর ছেড়ে যাবে। বাইরে তাকিয়ে দেখব তখনো অজস্র জ্যোৎস্না, কিন্তু ব্যারাকের কোণের দোতলার কার্ণিসের চূড়ায়ও আর চাঁদের চিহ্ন নেই। আকাশভরা জ্যোৎস্না—তা বুঝতে পারব, আঙিনাভরা তার উছল জোয়ার দেখতে পাব, কিন্তু চাঁদ আর চোখে পড়বে না। আমার জানালার কাছ থেকে তখন সে বিদায় নিয়ে গেছে—এ রাত্রির মতো। এই পূর্ণিমার রাত্রির মতো সে বিদায় চূড়ান্ত।

লাল আর গোল, সোনার থালার মতো এখনো এই পূর্ণিমার চাঁদ। সবে সূর্যাস্তের সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। তাকে এমনিভাবে বেশিক্ষণ আর পাব না; কিন্তু তবু তার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার সাহস

হচ্ছে না। সরকারী ঘর, পঁচিশজনের মাঝে আমি একজন। আমি ধরা পড়ে যাব, আমার দিকেই সবাই তখন তাকিয়ে থাকবে। আমার নিজেরও মনে হবে, আমি যেন অপরাধী, অশোভন ভাবে কি একটা জিনিস ভোগ করছিলাম। অশোভন ভাবে—দশের মধ্যে থেকে কোনো একটি রমণীর মুখপানে তাকিয়ে থাকা যেমন অশোভন, তেমনি এই জিনিস। অথচ তেমনি দুরন্ত ওর আকর্ষণ। আমি এদিকে-ওদিকে দেখছি—চোখে আমার সশঙ্ক দৃষ্টি, বুঝি কেউ ধরে ফেললে। আর তারই ফাঁকে এক একবার তাকাই ওই চাঁদের দিকে। বহু প্রতিবেশীকে ফাঁকি দিয়ে আর বহু প্রতিবেশিনীর তীব্র দৃষ্টি সহ্য করে যেমন দেখতে হয় কোনো সুন্দর মুখ, তেমনি, তেমনি ভাবে আমি এক এক ঝলক দেখে নিচ্ছি এই পূর্ণিমার সদ্য-উদিত চাঁদকে। জানি একটু পরেই এ আড়ালে চলে যাবে—এখনইতো কতকটা উঠেছে ওপরে, পাণ্ডুর হয়েছে তার রঙ্; সংকুচিত হয়েছে আকার। তবু, অকুণ্ঠিতভাবে তা আমি দেখতে সাহস করছি না।

এ মোহ বড় রূপজ ; খুব বেশি ইন্দ্রিয়গত। এই জ্যোৎস্না রাত্রির চারিদিকেই একটা লীলা আর লাস্যের আভাস ; কেমন একটা কোমল ইঙ্গিত। ভালো সিল্কের কাপড়ের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে হাতের আঙুলের ডগায় ডগায় যেমন একটি ইন্দ্রিয়গত বোধ জাগে, এও তেমনি। সারা দেহ শিউরে ওঠে। নরম স্পর্শ—ভালো সিল্কের মত নরম, তরুণীর চুলের মত নরম। তেমনি এই জ্যোৎস্নার আভাও,—নবীন যৌবনরাগের মতো, নতুন পাতার মতো, ফুলের পাপড়ির মতো। অনেক রহস্য তার পেছনে, অনেক অনাবিষ্কৃত অনুভূতি, অনেক উদ্বেল আনন্দ।

ধন্যবাদ এই জেলের জানালাকে—এমন রাতেও যখন জেলে থাকতেই হবে, থাকতে হবে এই ব্যারাকের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। তবুও শুনতে পাচ্ছি জ্যোৎস্নার গান! মানুষের চক্রান্ত মিথ্যা করে

শুনতে পাই দেবতার ডাক। যেন কোন্ দূর-দূরান্তরের এক পৃথিবী-ছাড়া আকাশ-ঝরা ডাক আজ শোনা যাচ্ছে—

Come away, O human child !
To the waters and the wild,
With a faery hand in hand.
For the world's more full of weeping than you can understand···

'To the waters and the wild', 'To the waters and the wild'—

কোন্ সমুদ্র-সৈকতে, কোন্ অরণ্যের সভাতলে এই ডাক? কোন্ আকাশে, কোন্ দিগন্তে? আমি খুঁজ্‌ছি কোন্ মোহিনীকে, La Belle Dame Sans Merci? আমি উন্মাদ নাইট্-এরাণ্ট্ নই, আমি পাগ্‌লা মেহের আলী নই—এ যুগের নির্বিকার পাষাণের বন্দী, জেলখানার জীব—এমন ডাক আমার কানে পৌঁছুলে চলবে কেন?

আজকের রাতে আমার যে হঠাৎ কবিতা পড়তে সাধ হচ্ছে! মনে পড়ছে গান আর কবিতা। আজকের মতো রাতে আমার তাই মনে পড়ছে কীট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথ। গুঞ্জন করতে ইচ্ছে করছে ইয়েটস্ বা শেলি। আজ কবিতার রাত। দেখছি আর মনে হচ্ছে—আমারও যেন কবিতার দিন যায় নি। কবিতার দিন—কার মনে হবে আজ রাতে যে তা শেষ হয়েছে তার জীবনে? মনে হয়—আমারও তা যায় নি। যায় নি? ক্লাসে আমায় কবিতা ব্যাখ্যা করতে হয়,—শব্দের অর্থ বলে বোঝাতে হয় নাইটিঙ্গেল, আর ইণ্ডিয়ান্ সিরিনেড্। তার পরে আর আজ মনে করতে পারি কি—In such a night···? মনে করতে পারি কি—One word is too often profaned? তাই আর আজ কীট্‌স্—পঁচিশের পাঁচিল পেরোতে যে পারে নি

জীবনে, আর পঁচিশের এ পারের কোনো ছেলে যাকে চেনে না—সে কীট্‌স্ আমার হাতে মানাবে না। এমন রাতে কার হাতে না মানায় কীট্‌স্? এ রাতের রূপ চোখে দেখ্‌লে কে বলবে—না, 'কবিতার রাত' শেষ হয়েছে, রোমান্টিসিজমের যুগ আর নেই।

সত্যি, আজ কবিতার রাত। এমন রাতে কবিতা আর গানই ভালো মানায়। এমন রাতে কেউ গল্প লেখে না। গদ্য পড়েও না। পড়তে পারে গদ্য—সে কবিতার মত গদ্য; হয়তো তা 'ক্ষুধিত পাষাণ', হয়তো তেমনি আর কোনো গল্প, 'ডাক্তার' বা Green Mansions, অমনি কিছু উপন্যাস—'কপালকুণ্ডলা'র মতো যার প্রাণ মূলত কাব্য। মোট কথা—এ রাত কাব্যের রাত, গদ্যের নয়। উপন্যাস দিয়েও আজকের রাতকে বোঝা যায় না। এ রাতে ঘটনা নেই। আমরা জটিল চরিত্রের প্রকাশ আর বিকাশ দেখতে চাই না—পেতে চাই একটি বিশেষ নিগূঢ় অনুভূতিকে। সে অনুভূতি দিতে পারে কবিতা, দিতে পারে সঙ্গীত, দিতে পারে চিত্রও। এ সবেই আমাদের মন আজ কথা ক'য়ে উঠ্‌তে পারে—কবিতায় বা কাব্যধর্মী কোনো প্রকাশে, যাতে অন্তরাবেগ ভাষা পায়, ভাষা পায় অতি নিগূঢ় এই অনুভূতি—যার সঙ্গে চাঁদের পরিচয় কত অরণ্যে আর কত সমুদ্রে, কত গুহায় আর কত বনান্তে, কত আসঙ্গ-উৎসবের উদ্বেল আনন্দে আর কত মিলন-বাসনার বিস্মৃত উল্লাসে, কত নিয়মহীন উদ্দামতায় আর কত নিয়মবাঁধা উৎসবে, কত পূর্ণিমা রাতের রাত-জাগায়, আর কত জ্যোৎস্না-ভরা পান-সভায়,—কত বার এমন চাঁদের স্পর্শে স্পর্শে সেই আমাদের আদিম অনুভূতি বারে বারে জেগেছে, বারে বারে ছাড়া পেয়েছে, বারে বারে হয়েছে নবীনতর, বারে বারে হয়েছে বিচিত্রতর। এই জেলখানার জানালার মধ্য দিয়ে চাঁদ তাকে যখন আবার ছুঁয়ে জাগিয়ে তুলল, সে আবার কথা খুঁজছে—সেই আদিম অনুভূতি—জৈবী প্রেরণাই—এ রাতেও আবার কথা খুঁজছে। কিন্তু কথা খুঁজছে সে ১৯৩৫এর ভাষায়—নতুনতম, বিচিত্রতম তার দাবি। ফুরোবে কি

করে তবে কবিতার দিন, রোমান্টিসিজমের যুগ? তা ফুরোয় নি। চিরন্তন সেই প্রাণাবেগ, সেই আদিম অনুভূতি—সেই রূপের মোহ, সেই ভালোবাসা, সেই রহস্য-বিবশতা।

আজও মানুষ ভালোবাসছে। আর ভালোবাসলে সে চায়—তার গহন অনুভূতিকে বাণীরূপ দিতে। সত্য বটে, জানি আমরা সে ভালোবাসারও গোড়ার কথা। তা একটা জৈবী সংস্কার—একটা প্রাণপিপাসা। এ কথা আরও বেশি করে জানত আদিম মানুষ। আমার মধ্যে যে আরও বিচিত্র সেই জৈবী সংস্কারই যা হয়েছে আবার মানবসংস্কার; আমার যৌনবাসনা,—সেও যে আজ একই কালে জীববৃত্তি আর সংস্কৃতির যোগফল: 'sex relations = biology plus culture.' সে প্রাণবৃত্তিই আজ তাই বলে দেয়—"আজ তোমার ফুল চাই, গান চাই, চাই রূপ রস গন্ধ শব্দের আয়োজন।" 'Without Cherry Blossoms' এ দিনের বাণী ফুটবে না—বৃথা হবে এমন রাত। মিলনের রাতে মস্কৌতেও চেরি ফুল চাই—জ্যোৎস্না রাতে জেলেও চাই কবিতা। কবিতা ছাড়া বৃথা হবে জেলের এ রাতও।

রোমান্টিসিজমের দিন যায় নি—কবিতার রাত শেষ হয় নি। জীবনটা রোমান্টিক কিছু নয়—কিন্তু জীবনে রোমান্টিক রাত আছে। তা'ই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। বিষয়বস্তু দিয়েই তো কাব্য শেষ হয় না—পরী আর চাঁদ, ফুল আর সূর্যাস্ত—এসবই কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। কবিতার বিষয়বস্তু এসবও হয়, চেস্টারটনের হাতে হয় গাধা, রস-এর সাম্‌নে হয় ম্যালেরিয়ার বীজাণু। কিন্তু আসল হল ওর ভাববস্তু আর কল্পনা; তা অভিজ্ঞতা-মাখা, অনুভূতি-রাঙা। বস্তুর থেকে বড় এ বাস্তব—অর্থাৎ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে বাস্তবের যেখানে সম্বন্ধ সক্রিয়—বস্তুকে আমি নতুন করে তুলছি, বস্তুও আমাকে নতুন করে তুলছে—একটা সক্রিয় সম্বন্ধ চলেছে। তাতে আদিম প্রেরণা নতুন প্যাটার্নে ফুটছে। জ্যোৎস্নাকে জেলের জানালায় বসে

১৯৩৫এ আমি গ্রহণ করছি, জ্যোৎস্নাও ১৯৩৫এর আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলের জানালার পথে নতুন করে তৈরি করছে। তার ভাষা চাই— কিন্তু সেই ভাষা আবার ১৯৩৫এর মতো হওয়া চাই—১৯৩৫এর এমনি রাতের মতো। তাই কবিতা পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, মনে পড়ে কীট্‌স্‌ আর কোল্‌রীজ, ব্লেক্‌ আর ইয়েট্‌স্‌।

একেই আমরা বলি রোমান্টিক ভাব, এই কাব্যধর্মী মনোভাব। এ জন্যই খাঁটি রোমান্টিক রচনা গদ্যে সম্ভব নয়। এমন রাতে গদ্য পড়ার কথা আমারও মনে হয় নি যে আমি গদ্য-পড়া-মানুষ। হয়তো পড়তে পারি, কিন্তু আসলে তাও কাব্যধর্মী গদ্য—অর্থাৎ ছন্দে লেখা না হলেও কবিতাই। সব 'গদ্য' গদ্য নয়—সব কবিতাও তো কাব্যধর্মী নয়। কবিকঙ্কণের পদ্যে আছে উপন্যাসের উপযুক্ত চরিত্র-চিত্র,— বাংলায় লেখা প্রথম উপন্যাস বোধ হয় তা। পোপ্‌-ডারুইন্‌-হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-কবিতায় আছে ছন্দে-ধরা বিদ্রূপ। কাব্য তাদের ধর্ম নয়। হোগার্থের ছবির মতো, চরিত্র ;—অনুভূতির ব্যঞ্জনা নয়,—চরিত্রের চিত্রালয়। অবশ্য হয়তো কাব্যরূপ থেকেও রসের চিত্ররূপ বেশি স্থায়ী হবে—সেক্‌স্‌পীয়র যেমন স্পেন্‌সার কীট্‌সের ওপরে থাকবেনই। এজন্যই বঙ্কিমের উপন্যাসও থাকবে, টিকবে। তাতে তাঁর দরকার ছিল একটা পরিবেষ্টনীর, অতীতের অস্পষ্ট কাল তা'ই জুগিয়েছে মাত্র। আসলে আছে তাতে চরিত্র, আছে তাতে চিত্র, আছে মানুষ ; সেই বিস্ময়, আর কল্পনাতীত সত্য—মানুষ, মানুষ, মানুষ !

এ রাত্রে কিন্তু আমরা সেই মানুষকেও চাই না। চাই আমাদের গহন অতলের মানুষকে—দেখতে, বুঝতে। সে তো 'বিচিত্র' মানুষ নয়, সে হল 'মূল' মানুষ—সামাজিক মানুষ নয়, সহজ মানুষ—যে মানুষ সবার উপরে সত্য, আর যার উপরে নাই। এ রাতে সে মানুষের অস্পষ্ট আভাস পাই নিজেদের মধ্যে, আর সে মানুষের পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থিত করে কবিতা। তাই এ রাত কবিতার রাত।

আর তাই এমনি রাত আমাদের পালানোরও রাত, ছলনারও রাত। জেলখানার ফাঁকে আমি চাঁদ দেখছি—আর জানছি জেলখানা কত মিথ্যা। এ জানার মধ্যে সত্য আছে; কিন্তু আছে তেমনি একটা বড় মিথ্যা। জেলেও চাঁদ দেখছি আর ভাবছি জেল নেই—আছে চাঁদ, আছে জ্যোৎস্না—আছে কবিতার রাত। সত্যই আছে চাঁদ, আছে জ্যোৎস্না, আছে কবিতা,—কিন্তু আছে জেলখানাও। ব্যারাকে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিকের আলো। তাতে আলো যেমনি কম, রূঢ়তা তেমনি প্রচুর। কয়েদখানার ব্যারাকে ব্যারাকে জ্বলছে সারা রাত অমনি আলোহীন ইলেক্‌ট্রিকের আলো। বাইরে টহল দিয়ে ফিরছে ভারী বুট-পরা সান্ত্রী সিপাই। প্রহর হাঁকছে ক্ষণে ক্ষণে—জেলখানা ঠিক আছে। আর আঙিনায় জ্যোৎস্নাকে তাড়িয়ে দিয়ে জাগছে উঁচু প্রাচীর। জ্বলছে প্রাচীরে-প্রাঙ্গণে বিজলীর কড়া মশাল। কী রূঢ় এই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার, কী প্রতিশোধ পৃথিবীর ওপর! —সত্য এও, সত্য এই জেলখানা সমাজের চক্ষে, সত্য আমার জীবনে। আর তা থেকে আমি পালাতে চাই—আমি মুক্তি পেতে চাই। তাই আমি নিজেকে জানালার ফাঁকে ছড়িয়ে দিই আকাশে-আকাশে—যে আকাশও আমার কাছে টুকরো-করা; ছড়িয়ে দিই প্রান্তরে দিগ্‌দিগন্তে, ছড়িয়ে দিই নাম-জানা আর নাম-না-জানা সমুদ্রের তীরে, পাহাড়ের গায়ে, নদীর বাঁকে—যা কিছু থেকে জেল আমাকে বঞ্চিত করছে তাই আমি চুরি করে এ ভাবে ভোগ করি। আমি জেলকে ফাঁকি দিই। পাহারা-সান্ত্রীকে ফাঁকি দিই, ফাঁকি দিই মানুষের শক্তিকে। আমি পড়ি কবিতা, আমি ফিরে যাই রোমান্সের 'সব পেয়েছির দেশে'—যাই 'Far Away and Long Ago'-র মহলে। সে দেশ আসলে আমারই মন-গড়া। স্থাপন করি তাকে কখনো আমারই মন-গড়া ইতিহাসের কোনো এক স্তরে, স্থাপন করি তাকে আবার কোন্ দূর-দূরান্তরের হেব্রাইডিজের তীরে, কোন্ সমুদ্রের ফেনার পারে নির্জন দ্বীপের বেলায়, তুষার-পারে হিমালয়ের বুকে, তিব্বতের

মঠে, মরুর অভ্যন্তরের খেজুর-ছায়ায়, বেদুইনের তাঁবুতে ; দেখি গ্রীক দেবদেবীদের, হিন্দু অপ্সরা আর দেবকন্যাদের ; দেখি পরী আর দেবদূতদের, দেখি আরব্য উপন্যাসের অসম্ভবের রাজ্য কিংবা কালিদাসের কাল। অসম্ভবের রাজ্যে আমি পালাই—এই অসহ্য বাস্তবের কয়েদখানা থেকে। অসম্ভবের রাজ্যই রোমান্স। সেটা 'সব পেয়েছির দেশ' ; কিন্তু তাই 'সব না পাওয়ার দেশ'ও। শুধুই বঞ্চনা, শুধুই ছলনা,—শুধুই আমার বৃথা পালানো। জেলখানা আমাকে বঞ্চিত করছে—সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন থেকে। আর তার শোধ তুলি আমি, জেলকে ভুলি স্বপ্নলোকে ডুবে গিয়ে, বঞ্চনা করে। অর্থাৎ জেলেরই বঞ্চনা মেনে নিই, মেনে নিই তার অস্বাভাবিকতা। জেল আমি সহ্য করে নিতে চাই ভুলে থেকে—আপনাকে ভুলিয়ে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায় বারে বারে এই ইলেক্‌ট্রিকের আঘাতে, সান্ত্রীর পদপীড়নে, সিপাইয়ের প্রহর-ঘোষণায়। এ রাতেও ভেঙে যায় ভুল, ভুলে থাকবার উপায় নেই। আর দিনের উদয় হতেই বেজে উঠবে জেলের রূঢ়তা, তার হৃদয়হীনতা, তার মহলে মহলে রুটিনের রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতা। আমার পালাবার পথ নেই।

না, রোমান্সের এই ছলনার পথে আমার মুক্তি নেই—কারও মুক্তি নেই। আমিও পালিয়ে কোথাও যেতে পারি না—এই কঠিন শাসন-ব্যবস্থা আমায় তাড়া করবে, ধরে আনবে, কয়েদখানায় পুরবে। নইলেও আমি ঘুরব গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, শিকারের পশুর মতো—লাঞ্ছিত, ত্রস্ত, তাড়িত,—চোখে জাগবে ভয় আর অবিশ্বাস, প্রাণে ক্ষোভ আর ক্ষুধা, আর দিন ও রাত হবে আমার পক্ষে এক অসম্ভব পিঞ্জর। পালানো সম্ভব নয়—বাস্তব থেকে পালানো সম্ভব নয়। রোমান্সের সাধ্য নেই সে রক্ষা করতে পারে—সে শুধু ছলনা, শুধু প্রবঞ্চনা,—অর্থাৎ শুধুই মানুষের প্রবঞ্চনাকে মেনে নেওয়া।

জেল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ—জেলকে ভুলে থাকা নয়—জেলকে ভাঙা—বাস্তিল চূর্ণ করা। ওই একমাত্র পথ। তা অসম্ভব

সাহসের পথ, অসম্ভব উদ্যোগের পথ। সেও একটা অসম্ভবের সাধনা বটে—সেও একটা রোমান্সের স্বপ্ন বটে—কিন্তু সে বাঁচবার পথ, শুধু সে স্বপ্ন নয়;—শুধু স্বপ্ন হলে সেও হবে মিথ্যার মোহ। এ স্বপ্ন পৃথিবীর সত্যকে সত করবার স্বপ্ন। এ স্বপ্নে আমরা জীবনকেই গ্রহণ করি, জীবনকে নতুন করবার জন্যই গ্রহণ করি। ঘাত-প্রতিঘাতকে এড়িয়ে যেতে চাই না—তাকে জয় করবার শক্তি সঞ্চয় করি। জেলখানাকে ভুলে থাকতে চাই না—জেলখানাকে চূর্ণ করি। তাও অসম্ভবের স্বপ্ন—শেলির স্বপ্নের মতো, প্রোমিথিয়ুসের মুক্তি-স্বপ্নের মতো, ওয়েস্ট্ উইণ্ডের স্তবের মতো। এমনি রোমান্স পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর তাই বার বার মানুষের সৃষ্ট রোমান্টিক সাহিত্যে এমন সার্থক হয়েছে—সে এলিজাবেথের যুগেই হোক্, কি ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগেই হোক্। এ রোমান্সও সত্য;—জীবনবিমুখী তা নয়। জীবনাগ্রহী, সত্যাগ্রহী এরূপ রোমান্স—যাতে পৃথিবী নতুন হয়—যা সৃষ্টির স্বপ্ন, আর তাই সৃষ্টির বাস্তব প্রেরণাও আবার।

কিন্তু তবু মিথ্যা নয় কবিতার রাতও—তাও সত্য। শুধু ফাঁকি নয় এই জেলের ফাঁক। এই সংকীর্ণ জেলখানার জীবন আমাদের সংকীর্ণ করছে, আমরা সংকীর্ণ হয়েই আছি। তবু তারও ফাঁকে ফাঁকে পাই আভাস—জীবনের মুক্ত আনন্দ-রূপের; জেলের জানালার ফাঁকেও দেখি চাঁদ আর আকাশ। এ যুগের মানুষ হয়েও খুশি হই—অ্যালিসের সঙ্গে আশ্চর্যের দেশে ঘুরে, খুশি হই এখনো ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের ছেলে-ভুলোনো কবিতায়। ভালোবাসি—আর সেদিন চাই চেরি ফুল। চাঁদ ওঠে,—আর সেদিন চাই কবিতা। বিজ্ঞান চোখ খুলে দেয় বাস্তবের অন্তঃপুরে, আর দেখি কি পরমাশ্চর্য জগৎ! অব্যবস্থায় মানুষকে করছে পীড়ন,—তবু সেই বিস্ময়-বোধ আমরা একেবারে খোয়াই নি। মানুষের ব্যবস্থা পারে না মানুষের প্রাণকে পরাস্ত করতে। আমরা স্বপ্ন দেখি—সে স্বপ্ন সত্যও হয়। আবার রোমান্স নিয়ে ভুলতে চাই জীবন, আমরা নিজেদের ভুলিয়ে

রাখি—সে ভুল ভেঙেও যায়, সে রোমান্সের মোহ যায় খসে। আমরা সহজ আবেগে এক এক নিমেষে অভিভূত হই—পড়ি কবিতা, কিংবা গাই গান। কবিতার রাত আজও তাই আসে আমাদের এই জীবনে।

কবিতার রাত আজও আসে। শেষ হয় নি কবিতার রাত, শেষ হতে পারে না—যতদিন আকাশে এমন চাঁদ উঠবে, পৃথিবীতে এমন জ্যোৎস্নার ঢল নামবে। খন মনে পড়বে পরীদের কথা, মনে পড়বে গ্রীক মিথ্। তখন চেতনার সমুদ্রে মথিত হয়ে উঠবে কত কত চাঁদনি রাতের অমৃত, যা আমাদের স্মৃতির মধ্যে জমে আছে, যা আমাদের বিস্মৃতির কালো জলে মিলিয়ে আছে। মথিত হয়ে উঠবে সেই সব। উজ্জীবিত হয়ে উঠবে অবচেতন থেকে কবিতার পিপাসা। তাকে স্বীকার করতে ভয় কি? এ যুগের নাগরিকরা অবশ্য হাসবে। তার থেকে বেশি হাস্তে পারত বৈজ্ঞানিকরা—যারা জানে, চাঁদ শুধু পৃথিবী থেকে খসে-পড়া একটা ছাই-এর কণা, একটা হিম-পিণ্ড, তার আলো প্রতিফলিত সূর্যালোক। তারা হাসতে পারত বেশি—যারা এসব জানে। কিন্তু তবু তারা মানে, এমন রাতে আকাশের তলায় দাঁড়ালেই মানে,—চাঁদ চাঁদ। কাজেই তো এমন রাত্রির মর্মবাণী —এ রাত্রির রূপ—অনুভব করতে হয় চোখ দিয়ে, দেহ দিয়ে, প্রতি রোমকূপ দিয়ে। আর এ রাত্রির রূপ ধরা পড়েছে কবিতার মধ্যে। আকাশ থেকে মনের ওপর যে জোছনা উজল ধারায় পড়ে, পিছলিয়ে পিছলিয়ে যায় সেখানে, তা নিজের বাঁধনে বাঁধা চিরদিনের মতো। এমন রাতের রূপ মিলিয়ে দেখতে হয় স্পেন্সারের পাতা থেকে আর সেক্স্পীয়ারের থেকে, এলিজাবেথের যুগের গায়কদের থেকে আর রোমান্টিক অভ্যুত্থানের কবিদের থেকে,—আর,—আর হাইব্রাউ-দের ভ্রূকুটি অমান্য করে আজকের মতো রাতে চাই ইয়েট্স্ আর রবীন্দ্রনাথ।

তবু এমন কত রাতে আমি মনের নেশাকে ডুবিয়ে দিয়েছি কেজো কথায় ও অকেজো তর্কে। এমন উন্মেষিত বিস্ময়-বোধকে চাপা দিয়েছি সংবাদপত্রের পলিটিকাল ককটেল দিয়ে। এমন কত রাত্রে যখন মনে

পড়েছে কীট্‌স্, মনে পড়েছে 'মানসী' আর 'মহুয়া', মনে পড়েছে 'প্রোমিথিয়ুস আনবাউণ্ড', আমি নিজেকে ঠকিয়েছি! কেন? পাছে আমি কলেজে-পড়া ছেলের মতো হয়ে যাই! পাছে আমি হই প্রেমপত্র-লিখিয়ে মেয়ের সমতুল্য! পাছে হাইব্রাউ-রা হাসে—দিনের আলোতে যেমন আমিই কাল হাসব। পাছে অতি-অভিজ্ঞের দল হাসে—যেমন আমিও হাসব এই রাতের শেষে—পাছে কেউ বলে আমি রোমান্টিক, বলে আমাকে—যে আমি কলেজে ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে রোমান্টিক কবিতার হাড়মাস আলাদা করে ফেলেছি; আর যে আমি হাসিতে আর তর্কে, কৌতুকে আর পরিহাসে পৃথিবীকে একটা তামাসা বলে গণ্য করি; আর যে আমি দিনের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে চিরে চিরে দেখি জীবনের মানে শুধু জীবিকা আর আসঙ্গ—পাছে কেউ বলে আমি কবিতা পড়ি—কারণ, আমি শব্দতাত্ত্বিক। তাই এমন কত রাত্রে চাঁদ বৃথা উঠেছে। এমন কত রাত্রে আমি কাটিয়েছি আমার কাজের আর নেশার জেলখানায়—বৃথা গেছে কবিতার রাত।

বৃথা যাবে আজও। চাঁদ আমার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। না থাক জেলখানায় আমার এ রাতে কোন কাজ, এ রাতে আছে অঘ্রাণের হিম। খোলা জানালায় অঘ্রাণের হিম লাগছে আমার গায়ে। কেমন শীত-শীত করছে, মাথা ভার হয়ে আসছে। সর্দি ধরল বলে, এখনি আমি হাঁচতে শুরু করব। হাঁচির পরে হাঁচি—সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে হাঁচি;—ব্যারাকের পঁচিশ জনের ঘুম তাতে ছুটে পালাবে। আর নয়, আর নয়—বন্ধ করো এই খোলা জানালা—ফেলে দাও চটের পর্দা। তারপর চটের পর্দার সামনে বসে পড়া কীট্‌স্ কি রবীন্দ্রনাথ? আর, হাঁচা আর পড়া কবিতা? এখনি কবিতার রাত হয়ে উঠবে হাঁচির রাত!

কাজ নেই কবিতায় এ রাতে।

প্রেসিডেন্সি জেল,

১৯৩৪।

সাহিত্যের স্বরাজ

ছিলাম ভালো। কিন্তু মানুষ ভালো থাকতে পারে না। কারণ কিছু তাকে করতেই হয়! আর এমন জিনিস পৃথিবীতে কি হতে পারে যা শুধ্ ভালো? নিছক ভালো, নির্জলা ভালো, pure good? জীবনে কিছুই তেমন pure নেই, আছে কি? সৃষ্টি কি পারে এই purism বা puritanism বরদাস্ত করতে? জীবন ভালোও নয়, মন্দও নয়, তা দুইই। আর এ দু'এর থেকেও বেশি, অনেক বেশি, একেবারে দোস্‌রা ব্যাপার—মানে, তা জীবন, তা সৃষ্টি করতে পারে। তা 'আছে' আর 'নেই' একই কালে। কারণ, তা কেবলি 'হচ্ছে', হচ্ছে আর হচ্ছে। যা ছিল তা আর নেই, যা ছিল তা থাকে না। আমিও যা ছিলাম, তা থাকতে পারলাম কোথায়? ছিলাম ভালো, কিন্তু ভালো থাকতে পারলাম কই? কিছু করতে গেলাম, আড্ডা আর গল্প, তর্ক ও তাকিয়া ছাড়াও কিছু করতে গেলাম। বল্‌তে গেলাম—pure বলে কিছু নেই, pure poetry-ও কিছু নেই। তাতেই আর ভালো থাকতে পারলাম না—সাহিত্যিক বন্ধুরা খাড়া হয়ে উঠলেন। আমি ছিলাম ভালো, কিন্তু বন্ধুরা আমাকে ভালো থাকতে দিলেন না। বলেছিলাম—জীবনে pure কিছু নেই, কি কবিতা কি সাহিত্য। তাতেই বিপদ ডেকে আনলাম। বলতে গেলাম—কলম আর কোদালিতে একই কাজ চলে; জীবনের ক্ষেত নিড়ানো আর ফসল ফলানো,—দুকাজ হলেও আবার একই কাজ। আর তা বলতেই বিপদ বেড়ে গেল। ছিলাম ভালো; কিন্তু বিপদ ডেকে আনলাম, বিপদ বাড়িয়ে তুললাম—এমনি জীবনের নিয়ম। সে বাড়ে, তাই বিপদও বাড়ায়। আবার বিপদ থেকে নিজেকে ছাড়ায়ও,—তাতেই সে বাড়ে। সে বাড়ে। নইলে সে তো থাকত নিশ্চল, তা'ই status quo; কিন্তু জীবনের নিয়মই তা নয়

—সে বিপদে ঠেলে দেয়, বিপথে নিয়ে চলে। আমারও তাই বিপদে পা বাড়াতে হল। এত অনুশাসন সত্ত্বেও পা বাড়াতে হল বিপথে, —সাহিত্যের এলাকায়,—যেখানে দেবদূতরাও যান না ভয়ে, মূর্খরা সদর্পে প্রবেশ করে। আমিও প্রবেশ করলাম কিছু না ভেবে।

'আমরা সাহিত্যিক',—আমার এখানকার লেখক বন্ধু জানালেন, জানালেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করে, অথবা সে কথাকে তাঁর নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করে,—"আমাদের উপর দাবি একমাত্র সৃষ্টির—কোদালিরও নয়, হাতুড়িরও নয়, এমন কি স্বরাজেরও নয়, স্বাধীনতারও নয়। কারণ, আমাদের নিয়মে স্বাধীনতা হচ্ছে সৃষ্টির স্বাধীনতা, আর স্বরাজ হচ্ছে সাহিত্যের স্বরাজ। অন্য স্বরাজ আমরা মানি না। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ চাই, তা প্রয়োজন বলে। যেমন কালিদাসও নিশ্চয় চাইতেন উজ্জয়িনীর কৃষকদের ক্ষেতে পরিমিত বর্ষণ হোক্; কিন্তু সত্য বলে মানতেন শিপ্রাতীরে নির্বাসিত যক্ষের বিরহকে। চাইতেন ক্ষেতে কোদালি চলুক, ফসল ফলুক; কিন্তু জানতেন সৃষ্টির দাবি এই যে—চলুক তাঁর কলম, আর রচিত হোক্ মন্দাক্রান্তায় শ্লোক।"

আমি সাহিত্যিক নই—লিখি, তবু লেখক নই। লিখি নিতান্তই জীবিকার দায়ে, আর তাই লিখি জীবনের সেই তাগিদে। আমি সাহিত্যিক নই, কিন্তু চিনি জীবনযাত্রার রূপ; তাই পড়ি—জীবনের বড় সাক্ষ্য। আর গর্ব করেই বলি—এ যখন চিনি, এ যখন পড়তে পারি, তখন সাহিত্যও বুঝতে পারি, বুঝতে পারি সাহিত্যের সত্য। ধরে নিয়েছি—জীবনের সহায় বলে—তার সহগামী বলেই—সাহিত্য হয় সাহিত্য। ওই সহার্থক শব্দটা তার জন্ম-গোত্রের সাক্ষী। তার সকল রূপের খোঁজ—আর সকল রূপহীনতারও নির্দেশ—ওই কথাটিতেই রয়েছে। যত বলি 'বিশুদ্ধ কবিতা' জানি তা জীবনেরই একটা রূপ আর বাণী; যত বলি 'সাহিত্যের স্বরাজ' জানব তা জীবনেরই একটা দাবি—নইলে তার মানে নেই, তাতে সত্য নেই।

কিন্তু শুন্‌বেন কেন তাঁরা, সাহিত্য যাঁদের ধর্ম, যাঁরা জাত-সাহিত্যিক? তাঁরা সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য জানালেন আর ঘোষণা করলেন তার স্বাধীনতা। ভেবে পাই না, কি সত্য আছে ওই সাহিত্যিক Declaration of Independenceএ? ততটুকু আছে কি যতটুকু আছে মার্কিনি গণতান্ত্রিকদের সেই স্বাধীনতা ঘোষণায়? ততটুকুও নেই, তার সিকি সত্যও নেই। সে মন্ত্র ঘোষণার কথা তো জানি। সে মার্কিনি মন্ত্রের পিছনে একদিন এক বড় সত্য ছিল—গভীর সত্য ছিল, উদার সত্য ছিল। মানুষের মহিমার সেদিন নতুন খোঁজ মিলেছে। সেদিনকার সমাজ তারই আবেগে আনন্দে কাঁপছে; তা আর পুরনো কাঠামোতে আঁটা থাকতে পারছে না। তাই মাতৃভূমির ধনিকের আর ব্যবসায়ীর আঁচল-বাঁধা থাকল না উপনিবেশের সাবালক সন্তানেরা। তারা নতুন সত্য ঘোষণা করলে। তা'ই আবার ১৭৮৯-এর রক্ত-স্নানে 'মানুষের অধিকার' বলে রূপ গ্রহণ করলে। সে কী আশ্চর্য সত্য! কী তার ইতিহাস! আরও পঞ্চাশ বছরে ইউরোপে তার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হল। সাহিত্যেও সে স্বাধীনতার হাওয়া লাগল। পৃথিবীতে 'মানুষের অধিকার' জয়ী হল,—আর সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী হতে চাইল তা মানুষের বৈষম্য রূপে। 'অধিকার-ভেদ' এমনি ভাবেই সব দেশে সব কালে শেষ হয় এসে জাতিভেদে, শ্রেণীভেদে। মার্কিনি সত্যও এমনি করেই আজ অ-সত্য হয়ে পড়েছে। সেদিনকার Declaration of Independence শুধু জন কয়েকের স্বাধীনতা দিয়েছে, আর নব্বুই জনের অধীনতাই কায়েম করেছে। শতকরা দশজনের এই স্বাধীনতা-ঘোষণা হয়ে উঠেছে নব্বুই জনের অধীনতা-ঘোষণা। আমরা তো আমেরিকাতেই তার প্রমাণ দেখছি। তাই ওই ঘোষণায় মাত্র দশ ভাগ আছে সত্য—আর নব্বুই ভাগ অ-সত্য। 'স্বাধীন দেশে' দশজন আছে মানুষ—যাদের মনুষ্যত্বের অধিকার আছে, আর নব্বুই জন তো মানুষ নয়—যন্ত্র,—'হাতুড়ি আর কাস্তে'। 'মানুষের অধিকার' কতটুকু আছে সাধারণ

মানুষের—নব্বুই জনের? যতটুকু ওই দশজন স্বাধীন শাসক দেন, ওই দশজন গণ্যমান্যরা দিতে চান,—মানে, যতখানি ওই নব্বুই জন গণ-মানবদের না দেওয়া যায়, ওই নব্বুই জনকে যতটা রাখা যায় মানুষের অধিকার থেকে ঠেকিয়ে। কলমের স্বাধীনতাই বা তা হলে কতটুকু? উপরতলার এই দশজনের হাতেই তা শোভা পাবে। বাদবাকীর হাতে কলম থাকবে না, থাকবে কাস্তে আর হাতুড়ি। উপরওয়ালার 'কলমচি' আমরা—মশালচি আর বাবুর্চি নই; বলি, "আমরা মেঘদূত লিখি, যক্ষের বেদনা বুঝি,—উজ্জয়িনীর ক্ষেতের চাষী আর কামারশালার কারিগরের জন্য লেখা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমরা কলমচি, কলম বড় লোকের হাতে শোভা পায়; তাই আমাদের আদর—আমরা বাবুর্চি নই, মশালচি নই—মশালচি হল সাংবাদিকরা।"

কথাটা বুঝি ঠিক হল না। সত্যই তো মাত্র দশজনের জন্য সাহিত্যিকরা লেখেন না। তাঁরা লেখেন সকলেরই জন্য—একশো জনের জন্যই। এমন কি আরও বেশি, সকল যুগের সকল মানুষের জন্য। এ তো মিথ্যা নয়। নব্বুই জনকেও যে তাঁরা চান ওই দশজনের সমান করে নিতে, সমানাধিকার দিতে, এখানে তো তাঁরা শ্রেণীভেদ চান না, মানেনও না। তাঁরা 'Republic of Letters' মানেন; মানেন The Classless Republic of Letters; মানেন না বরং Dictatorship of the Proletariat বা নব্বুই জনের দৌরাত্ম্য, কিংবা Dictatorship of Capital বা দশজনের কর্তৃত্ব।

ঠিক কথা। সাহিত্যিকরা সকলের জন্যই লেখেন; তাঁরা জাতিভেদ মানেন না—শূদ্ররাজও না, বৈশ্যরাজও না। খুব সত্য এই কথা। তাঁরা বরং চান সাহিত্যের স্বরাজ, মানে Republic of Letters. কিন্তু তা বলে সে রাজ্যের অধিকারী কি সবাই? রামা-শ্যামা যোদো-মোধো সবাই? রায়বাহাদুর আর রাজাবাহাদুর, গেণ্ডারীরাম আর ঝুনঝুনওয়ালা? মোটেই তা নয়। সেখানে একমাত্র

অধিকারী রসিক। রসজ্ঞান যাঁর আছে তিনিই একমাত্র সেই স্বরাজ্যের citizen. এ রিপাব্লিক আসলে এক Oligarchy of Letters, শুধু রসিকের স্বরাজ্য। সে রসিক শতকরা দশজনের শ্রেণী থেকেও আসতে পারেন কিংবা ওই নব্বুইজনের শ্রেণী থেকেও উঠতে পারেন। বঙ্কিমের উপন্যাস আমরাও পড়ি, বাংলাদেশে যাঁরা পড়তে জানেন তাঁরা সবাই পড়েন। আমিও পড়ি আর আমার চাকর রজনীও পড়ে। আমার থেকে বেশিই পড়ে, হয়ত আমার থেকে কম আনন্দও সে পায় না। পাঠকের প্রাণে তাই রস থাকলেই হল। কি যায় আসে তিনি যদি হন পাটের দালাল? কি যায় আসে সে যদি হয় পাটের চাষী?

যায় আসে না কি? আমি তো দেখছি—যায় আসে। এই তো একক্ষেত্রে পাঠক 'তিনি', আর একক্ষেত্রে পাঠক 'সে'; আর ওকথা দু'টোর মানে পরিষ্কার, তাদের ইঙ্গিত ভুল করবার নয়। না, সে ইঙ্গিত ভুলবারও নয়। লেখকও ভুল করবেন না। ওকথা দু'টোর মানে হচ্ছে এই, এই সমাজে পাটের দালাল ও পাটের চাষী এক সমান নয়; আর তার ইঙ্গিত এই—রসের জগতেও তারা সমান হতে পারে না। তাদের রসবোধ যদিই বা সমান হয়, তবু তাদের রসগ্রহণের শক্তি সমান থাকবে না। রসের অনুভূতির ক্ষমতা হয়ত সমান ছিল। কিন্তু সব ক্ষমতারই তো অনুশীলন দরকার। সেই অনুশীলনেই শক্তি বিকাশ লাভ করে; নইলে তা বেঁকেচুরে হয়ত নানা পথে তৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু ঠিক বিকাশ লাভ করতে পারে না। পারে না, তাই চাষারা পাঁচালী শুনবে, আমরা পড়ব রবীন্দ্রনাথ। উজ্জয়িনীর সব চাষাই অনুভূতিহীন ছিল না; আর নবরত্নের সব রত্নই যে রসজ্ঞানে জন্ম-রসিক ছিলেন তাও নয়। তাঁদের অনুশীলনের সুযোগ ছিল—আর ওদের পক্ষে তা ছিল না। তাঁরা জন্মেছিলেন ভাগ্যবানদের ঘরে, আর পেয়েছিলেন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ; আর ওরা জন্মেছিল কৃষকের ঘরে, পেয়েছিল কৃষিকাজের দরকারী পরিবেশ। ওদের রুচি

গঠিত হল না। তাই ওরা বড় জোর সে যুগের কাজরী গান শুনেছে, নেচেছে, গেয়েছে, আনন্দ পেয়েছে ; তাতেই ওদের রসবোধ তৃপ্ত হয়েছে, সার্থক হয়েছে। আর রাজসভায় বিদগ্ধজন শুনেছেন 'মেঘদূত', তর্ক করেছেন কেউ মন্দাক্রান্তা নিয়ে, কেউ শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দ নিয়ে ; বিচার করেছেন কেউ অলঙ্কারের গৌরব নিয়ে, কেউ কাব্যের স্বভাব নিয়ে। তাঁদের রুচিজ্ঞানে পুলকিত হয়ে কখনো হয়ত মহাকবি ঘরে ফিরেছেন জয়মাল্য মাথায় ; আর কখনো তাঁদের রসবোধে হতাশ হয়ে বররুচির মতো বলেছেন, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।" কারণ, রাজসভায় সবাইকার রুচি হয়ত মার্জিত ছিল খুব, কিন্তু সবাইকার তা বলে রসবোধ তো সমান গভীর ছিল না। বরাহ হয়ত ভেবেছেন, 'মেঘদূতে' জ্যোতিষের কিছু প্রমাণ হয় না—যদিও বরাহও প্রকাণ্ড প্রতিভা, রুচিও তাঁর হয়ত ছিল। এরূপ অনুমান একেবারে অসম্ভব নয়। শুনেছি, নিউটনও নাকি মিলটনের মহাকাব্য পড়ে বলেছেন—'এতে কি প্রমাণ হল ?' প্রমাণ যা হল তা এই—রসবোধ আর জ্ঞান এক জিনিস নয় এবং রসবোধও সকলের সমান থাকে না। আরও প্রমাণ যা হয় তা এই—রুচি আর রসবোধ এক জিনিস নয়। তবে রুচি স্বচ্ছ হলে রসবোধ স্বচ্ছ হয়, নইলে রসবোধও নানা বাজে জিনিস নিয়ে ভুলে থাকতে পারে। আবার এটাও ঠিক, রুচিও সকলকার গঠিত হয় না, তা জন্মসূত্রে মানুষ পায় না। রসবোধ হয়ত অনেকটা পায় জন্মসূত্রে। তবু তাও রুচি দিয়ে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করে তুলতে হয়। আর রুচি পায় পরিবেশ-সূত্রে—মানে, পরিবার-সূত্রে আর শ্রেণী-সূত্রে। তাই পাটের দালাল যে সুযোগ পান, পাটের চাষী সে সুযোগ পায় না। রসের জগতেও তাই একজন হবেন 'তিনি', আর জন হয় 'সে'। তাই রসের বাজারে আমাদের রজনী আর আমিও সমান অংশীদার নই। অনেক দিনে বঙ্কিমের জগৎ আমাদের এতটা পরিচিত হয়ে উঠেছে যে, তাতে প্রবেশের পথে অনেক বাধা কমে গেছে। তার জন্য যতটুকু রুচি

পরিবর্তন দরকার তা এদেশের বাঙালীর মোটামুটি হয়েছে। তাই রজনীও তাতে প্রবেশ করে, আর এসে বসে যায়। কিন্তু তার গ্রহণশক্তি আর আমার গ্রহণশক্তি এখনো তবু স্বতন্ত্র। তবু একই ট্রেনে আমরা যাচ্ছি, আমি অন্ততঃ ইণ্টার আর রজনী থার্ড ক্লাশে। শ্রেণীভেদে আমি রুচির মালিক, আর রজনীর রুচির পালিশ নেই। আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, কিন্তু রজনীর কাছে সেখানকার চাবি এখনো নেই। আমি ভদ্রলোক, রুচিও আমার সহজে এযুগের ভদ্রলোকের মতো হয়েছে ; রজনী রয়েছে শতকরা নব্বুইজনের মতো, রুচি তার নেই। সাহিত্যরাজ্যেও তাই ঢুক্‌তে পান শতকরা দশজনের যে কেউ রুচির অধিকারী। আর তাঁরাও, যাঁরা সেই দশজনের শ্রেণীর। থাক্ বা না থাক্ তাঁদের রসবোধ, আছে তাঁদের মোটামুটি রুচি ; মানে, নিজ শ্রেণীর সাধারণ পালিশ। আর আছে তা ছাড়াও শ্রেণীগত শক্তি, টাকা-কড়ি, বন্ধু-বান্ধব। রসের রাজ্যও তাই শুধু রসিকেরই রাজ্য নয়। না, Republic of Lettersও সাহিত্যের একান্ত আসর নয়।

রসের রিপাব্লিকই আসলে ভূয়ো। তবে আছে oligarchy of the ruling class. সাহিত্যিক তারই সঙ্গে চলেছে—রাজসভার রাজকবি। আসলে বরাবরই সাহিত্যিককে ruling classএর গান গাইতে হয়েছে—অবশ্য যেদিন থেকে ruling class জন্মেছে। কারণ এক সময় তারা ছিল না। গোড়ায় অবশ্য শিল্প সাহিত্য নৃত্য গীত সবই ছিল এক সঙ্গে সংযুক্ত। তখনো মানুষের কাজ ভাগ হয় নি, অনুভূতিও সূক্ষ্ম হয় নি, ভিন্ন ভিন্ন ধারায় তার প্রকাশের পথও তাই দরকার হয় নি। হয়ত সেদিনকার সমাজে সবাই নাচত, গাইত, ছবি আঁকত। আর সেই নাচ-গানও ছিল আবার তাদের শিকারের উৎসব। তা'ই হল নবান্নের উৎসব, হল শেষে 'বর্ষা-মঙ্গল'—শস্যস্বপ্ন। আর হল তা আবার একই কালে প্রার্থনা আর কবিতা, শিল্প আর ধর্ম। মানুষের সৃষ্টির পৃথক্ পৃথক্ এলাকা তখনো চিহ্নিত হয়ে ওঠে নি, সবই

একাকার। কারণ সেদিনকার সমাজই যে ছিল একাকার—সবাই শিকারে যায়, এক সঙ্গে মারে, ভাগ করে খায়, একত্র হয়ে নাচে-গায়, আর বলি দিয়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানায়। এই ছিল এক আদিম যুগ। তখনকার নাচ-গান, মন্ত্রতন্ত্র, পূজা-পার্বণ,—সব প্রায় 'ধর্ম', সব প্রায় প্রাণধারণের চেষ্টা, সব জীবিকার প্রয়াস। তার থেকে ক্রমশ এলাকা ভাগ হল, সাহিত্যও একটা নতুন দেশ হয়ে উঠ্‌ল, হল স্বতন্ত্র এলাকা। আর তারও আবার হল ক্রমে ক্রমে কত প্রদেশ, কত জনপদ, কত গ্রাম নগর। কারণ, একাকার সমাজও যে ক্রমে ভাগ হয়েছে; গড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার নিয়ে বিশেষ বিশেষ স্তর,—কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্র। অর্থাৎ হয়েছে কেউ শাসক আর কেউ শাসিত। কখনো তারপর কেউ হয় রাজা, কেউ প্রজা। তাদেরও কেউ হয় সম্রাট বিক্রমাদিত্য, আর কেউ তার করদ রাজা, অসংখ্য প্রজা; আবার কেউ লিচ্ছবী বা এথেন্সের পৌরজন আর কেউ তার দাস; কেউ সামন্ত ও জায়গীরদার ভূঞা, কেউ তার গোলাম; কেউ জমিদার কেউ রায়ত; কেউ বৈশ্য বণিক, অনাথ-পিণ্ডদ কি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, কেউ শুধু তার পণ্য-উৎপাদক; কেউ ধনিক, ফোর্ড কি টাটা, কেউ শ্রমিক; কেউ ব্যাংক আর ট্রাস্টের মালিক, মর্গ্যান কিংবা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস্, কেউ শুধু নিজের গতরের মালিক, বিত্তহীন আর প্রায়ই বৃত্তিহীন। এমনি করে গড়ে উঠেছে ইতিহাস—শাসক আর শাসিত, দুটো শ্রেণী অনেককাল ধরে রয়েছে। নিচেকার মানুষ এক এক দলে উপরে উঠে এসেছে,—উপরে এসেছে সামন্তরা, তারপর বণিকেরা, তারও পরে ধনিকেরা। কিন্তু একেবারে তলাকার মানুষ তবু তলেই রয়েছে, কৃষকেরা শুধু চাষই করেছে, শ্রমিকেরা শুধু শ্রমই জুগিয়েছে। যে যখন উপরে উঠেছে সে শাসকের আসনে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু শাসিত শ্রেণীর দিন কেটেছে যে তিমিরে সে তিমিরে। শাসন আর শোষণ চলেছে এক সঙ্গে,—লর্ড কার্জন তা বল্‌বার আগেও—বহু শতাব্দী থেকে

প্রায় সকল সমাজে। শাসক বরাবরই শোষক, আর শাসিত বরাবরই শোষিত। তবে শোষিতের দল থেকেও এক-এক পর্যায় উপরে উঠে এসেছে, শাসন কেড়ে নিয়েছে।

যে দল যখন শাসন কেড়ে নিয়েছে, নিয়েছে তার যোগ্যতা ছিল বলে—সমাজের দেহে তার শক্তি নতুন শক্তিসঞ্চার করতে পারছিল বলে। তাই সামন্তরা রাজার হাত থেকে রাজশক্তি কেড়ে নেয়; জায়গীরদারের গড়খাই-ঘেরা কেল্লা ওঠে, তার চারিদিকে চাষী ছুতোর মিস্ত্রী কারিগর নতুন নতুন শহর পত্তন করে। শহরে আবার বেড়ে উঠল সওদাগরেরা, তারা বাণিজ্য চালায় শহরে-শহরে, সামন্তরা দেয় বাধা। সামন্তদের হাত থেকে বণিকেরাও ক্ষমতা একদিন তাই কেড়ে নিল—মুক্তি পেল সামন্তদের গোলামেরা। বণিকেরা শাসন হাতে পেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁপে উঠল। তারা খুঁজল আরও উৎপন্ন জিনিস, আরও পণ্য; এল তার দায়ে যন্ত্র। বসল কল-কারখানা, বণিক হল ধনিক। সভ্যতা সাত-সাগর পাড়ি দিল, সাম্রাজ্য বিস্তার করল। এল সাম্রাজ্যবাদের যুগ—এশিয়া জুড়ে তার 'বাজার', আফ্রিকা জুড়ে তার কাঁচা মালের আড়ৎ, পৃথিবী জুড়ে তার মাকড়সার জাল। ছুনিয়ার হাটে হাটে তার মাল, পাড়ায় পাড়ায় তার ফেরিওয়ালা, গাঁয়ে গাঁয়ে তার রেলপথ আর মালগাড়ী। ছুনিয়ার ভাগাভাগি নিয়ে ধনিকদের মধ্যে তখন পড়ল কাড়াকাড়ি, বাধল সাম্রাজ্য-বাদীদের পরস্পরের লড়াই, আর এল তারপরে—

কিন্তু থাক্ তা। কথা হল—দেখছি যখন সমাজে যে শক্তি-সঞ্চার করেছে তখনি সে শাসন আয়ত্ত করেছে। আর যখন যে শাসন আয়ত্ত করেছে তখনি সাহিত্য গেয়েছে তার গান—তার জয়গান, তার আশার গান, আর তার স্তবগানও। মোটের উপর সাহিত্য অন্যায় কাজও করে নি। কারণ, সে গেয়েছে বিজয়ীর গান, আর তা বিজয়ের গানও। আর বিজয় তো শুধু শ্রেণী-বিশেষেরও হয় নি, সে বিজয় যে মানুষেরই ক্রম-বিজয়, সমাজের সে বিন্যাস যে

সমাজেরই ক্রমবিকাশ। আর সে বিজয় যে তাই সাহিত্যেরও বিজয় আর তারও ক্রমবিকাশ। অবশ্য সে সব বিজয়েও মানুষের চূড়ান্ত জয় হয় নি। মাত্র দশজনকে আজ পর্যন্ত সে দিয়েছে মুক্তি, স্বাধীনতা, শক্তি; নব্বুই জন রয়েছে বন্দী, শাসিত ও শোষিত। আর বারে বারে এক-একবার এক পা এগোবার পরই আবার সমাজ স্থাণু হতে চেয়েছে—যারাই শাসনশক্তি হাতে পেয়েছে তারাই শাসন-শক্তি আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। শাসনদণ্ডের জোরে অন্যদের চেয়েছে শায়েস্তা করতে, আইন ক'রে চেয়েছে নিজেদের সুখ সৌভাগ্য সব পাকা করে নিতে—অর্থাৎ বাদবাকীদের ওপর শোষণ আর অত্যাচার কায়েম করে রাখতে। অবশ্য, তা কেউ পাকা করে রাখতে পারে নি। সামন্ত-কর্তারা পারে নি, বণিকেরা পারে নি, আজ ধনিকেরাও পারছে না। কারণ তাদের যার যখন যা দেবার ছিল তা চুকিয়ে দেওয়ার পর আর সমাজে তাদের কিছু দেবার থাকে নি। সমাজ তাদের দান পেয়ে বেড়েছে; কিন্তু তার পরে আরও নতুন শক্তি না পেলে যে সমাজ আবার বাড়তে পারে না। তাতে সমাজে একটা জরার ভাব দেখা দেয়। অথচ নতুন শক্তিকে শাসকেরা কি সহজে পথ ছেড়ে দেয়? কখনো না। মানুষের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে নাকি? নেই বলেই দ্বন্দ্ব বাড়ে, মারামারি বাড়ে। এদিকে সমাজও এগোতে না পেয়ে কেবলই ঘূর্ণীপাকে পাক খায়। এমন কি, একটা সংকটের দিনও সমাজের বারেবারে আসে—মানুষের ইতিহাসে যখন এক একবার ঘূর্ণীপাক সৃষ্টি হয়। আর সাহিত্য? সমাজের সহিতই সাহিত্য চল্‌ছে তো; তখন তাহলে কি করে সাহিত্য? ঘূর্ণীপাকে পাক খায়, দিশা হারায়, ওলট-পালট হয়; ডিগবাজি খায়, পথ খুঁজে পায় না। পথ খুঁজে পায় না—তাই করে backward march. তারা পিছু হটে, কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করে mark time, কসরৎ। আর—যখন যুগের ব্যর্থতা দেখে, দেখে নতুন শক্তির উদয়াভাস—তখন গেয়ে

ওঠে নতুন উৎসাহে তার আগমনী, গায় নতুনের আবাহন গান, গায় সৃষ্টির সংবাদ, জীবনের জয়গান—আর দেখা দেয় মানুষের ইতিহাসে আর এক আবির্ভাব।

এই তো সাহিত্যের ইতিহাস—তার স্বতন্ত্র ইতিহাস আবার কি? কি তার স্বাধীনতার অর্থ? স্বতন্ত্র অবশ্য সাহিত্য হয়েছে তা তো দেখেছি। শিল্পকলার একটা বিশেষ দেশ বলে গণ্য হয়েছে সাহিত্য; তেমনি সাহিত্যেরও আবার বিশেষ বিশেষ প্রদেশ, জনপদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এটা হল বিকাশ, বিকাশেরই নিয়ম। স্বতন্ত্র মানে তা বলে 'বিচ্ছিন্ন' নয়। আসলে এ স্বাতন্ত্র্য কতটুকু? জীবনেরই একটা কোঠা সাহিত্য, হয়ত তার চূড়া। জীবন থেকে নিচ্ছে আর জীবনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আবার ফিরে নিচ্ছে, আর তেমনি ফিরিয়ে দিচ্ছেও।—আদান-প্রদান চলেছে বরাবর, চল্‌ছে প্রত্যেক নিমেষে। পৃথিবীতে এই জন্য pure কোনো শিল্প নেই, আর স্থির সত্যও কোনো কিছু নেই—pure কোনো-কিছুই নেই, মানে, 'বিচ্ছিন্ন' বা 'বিশুদ্ধ'—সবই পরস্পরের সম্পর্কিত, আর সবই ক্ষণে ক্ষণে সেই দেনা-পাওনার ফলে আবার নতুন হচ্ছে। সাহিত্যকেও তাই বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই। তার নিজের এলাকা আছে, কিন্তু তাও জীবনের ওলট-পালটে নতুন হচ্ছে। বিজ্ঞান তাকে বদ্‌লায়, জীবনযাত্রার তাগিদে তার আয়োজন নতুন হয়, আবার তার নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়। এমনি শতভাবে তা শতপাকে জড়ানো জীবনের শত ভাগ-বিভাগের সঙ্গে। শুধু সাহিত্য, নিছক সাহিত্য, এসব কথার তা হলে মানে কোথায়? মানে নেই। তাই আঁরি ব্রিমোঁ pure poetry বলেন প্রার্থনার মতো কবিতাকে, আর পল্‌ ভালেরি pure poetry বল্‌তে বোঝেন গানের মতো কবিতাকে। দুইই সত্য আর দুইই মিথ্যাও। কারণ কবিতারও নিজ এলাকা আছে। আর কবিতার সে এলাকায় সেই শান্তরসাস্পদ মন্ত্রও শুন্‌তে পাই, আর সঙ্গীতময় গুঞ্জনও শুন্‌তে পাই। কিন্তু তা ছাড়াও আরও শুন্‌তে পাই অনেক কিছু—শুন্‌তে পাই বরাবর সৃষ্টির

বাণী। আর কবিতাও সাহিত্যের একটা এলাকা শুধু, কবিতা ছাড়াও কাব্য হয়, কথা ফোটে।

সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য এমনিতরই। তার স্বাতন্ত্র্য এই—তাতে তত্ত্ব বড় কথা নয়, তাতে তথ্যও বড় কথা নয়; তা নিজের ঐতিহ্য মেনেও চলে, আবার তা ঐতিহ্য ভেঙেও চলে; তাতে শাস্ত্রের দোহাই কোনো কাজ দেয় না, এমন কি, হিতাহিতের দোহাইও নিষ্ফল—শুধু তা জীবনযাত্রার সহযাত্রী, সৃষ্টির নিয়মে-ধরা।

আর এ যখন সাহিত্যের মূল কথা, তখন সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতাই বা কতটুকু? যতটুকু যখনকার জীবনযাত্রা তাকে দেয় তখন ততটুকু; যতটুকু যে সমাজ মানুষকে দেয় ততটুকুই। জীবনযাত্রায় যতদিন শাসক ও শোষক কর্তৃত্ব করবে, ততদিন শাসকদেরই আছে স্বাধীনতা। আর শিল্পীর বা সাহিত্যিকের তখন স্বাধীনতা থাকে শাসক-ও-শোষকের সঙ্গে এক হতে পারে বলে—সেই সঙ্গে চলেছে বলে, তাদের 'কলমচি' বলে। তাই, যেমন শাসিতের স্তর থেকে শাসক সমাজে এক-এক দল প্রোমোশ্যন পায়, শিল্পীর বা সাহিত্যিকের আসর সেই পরিমাণে বড়ও হয়, তাদের সৃষ্টির এলাকাও বিস্তৃত হয়। জীবন-যাত্রার সীমারেখা বেড়ে যায়, আর শিল্পী আর সাহিত্যিকও সেই পরিমাণেই আবার জীবনযাত্রায় ব্যাপ্তি দেখে, মুক্তি পায়। কথাটা বোঝা সহজ। একদিন তো সাহিত্যিক ছিল রাজার পারিষদ—অবশ্য খুব বেশি সাহিত্যিকই কি আর সেই সৌভাগ্য পেয়েছেন? আর যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাও খুব সাবধানেই সে সৌভাগ্য বজায় রেখেছেন। তবু, একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে তখন উজ্জয়িনীর বিজনপ্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি পাওয়া যেত—আর এই স্তুতি গেয়েই কবি বাঁচতেন। কবি বাঁচতেন রাজার প্রসাদে। রাজসভায় সেদিন তবু সেনাপতি আর বীরের যুগ; কবি আর কবিতার সম্মান কতটুকু ছিল কে জানে? তারপরে তো কবি বাঁচতেন সামন্তদের বীর্যের আর শৌর্যের গান গেয়ে, প্রেরণা যুগিয়ে।

তেমনি কবি চারণ আর ভাট। কতকাল ধরে এমনি গেছে সাহিত্যিকের জীবন—গেয়েছেন 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'। সব সময়ে কি তবু কবি পেয়েছেন শান্তি বা স্বস্তি? দামুন্যায় অত্যাচার সয়েছেন, বর্ধমানের জন্মভূমি ছেড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছেন। ওদিকে ছিল রাজা-রাজড়ার সভার নর্ম জোগাবার জন্য নটনটী—ইউরোপে ছিল রাজা আর সামন্তদের খাশ নাটকের দল। সামন্তদেরই মূর্তি গড়তেন শিল্পী, তাদেরই মর্জি হলে গড়তেন মন্দির মস্‌জিদ গির্জা। তারপর বণিক-রাজত্ব দেখা দিল। সাহিত্যিকরাও আরও একটু স্বাধীন হতে পারল। আর এল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এল গণতন্ত্র। সাহিত্যিকরা হলেন এবার গণতন্ত্রের গুরু, জনগণের রাজকবি। তাদের লেখার দাম হল—পৃথিবীতে দামের ও বাজারের নিয়ম এসে গেছল। সাহিত্যিকরাও পেলেন সাহিত্যিক হিসাবে স্বাতন্ত্র্য,—পারিষদ আর তাঁরা নেই। সংবাদপত্রে, রেডিওতে, সিনেমাতে আজ গণতন্ত্রের যুগে তাঁরাই পান রাজসম্মান। ভাস্কর বা স্থপতি আগে পেতেন প্রিন্‌স্ পোপের হুকুম, এখন পান পৌরসভার অর্ডার কিংবা ধনিকগোষ্ঠীর অর্ডার, আর চিত্রশিল্পীর চিত্র নিয়ে বাজার বাড়ান পিয়ার্স কোম্পানি কিংবা বেঙ্গল কেমিক্যাল, শিল্পক্রয়ের কাড়াকাড়ি পড়ে ধনকুবেরের বংশে।

এই গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে সাহিত্যিক অনেকটা স্বাধীন হয়েছেন। তাই তাঁরা মনে করেন, আর তাই অন্যেরাও মনে করেন, নইলে এ যুগের এই ঠাট টিক্‌ত না। বণিকেরা শোনায় মজুরকেও, —'মজুর, তোমার স্বাধীনতা আছে। তুমি ইচ্ছা করলে কাজ না করেও পার, তুমি তো কলের মালিকদের ক্রীতদাস নও। সামন্ত যুগ তো নেই, গোলামিও নেই।' কিন্তু কতটুকু তা নেই—তাই শুধু বুঝতে ভুল হয়। ভুল হয় মজুরদের, ভুল হয় লেখকদের। ক্রীতদাস আজ কেউ নেই। কিন্তু খেতে হবে, আর তাই চাই জমি গোরু আর লাঙ্গল; মজুরের হাতে তা নেই। তা হলে হতে হয়

তাকে কারিগর; চাই তার কারিগর-মিস্ত্রীর যন্ত্র। তারও দিন শেষ হয়েছে কল-কারখানার দাপটে; আর সে কল-কারখানা মালিকের হাতে। ত হলে যেতে হয় কল-কারখানায়—আর উপায় যখন নেই। "স্বাধীন" মজুরের উপায় নেই, বাধ্য হয়েই "স্বাধীন"ভাবে বাজার বুঝে মেনে নেয় যা পায় "মজুরী"। এই তার দাম। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই মূল্য, শতকরা নব্বুইজনের এই হল বাজার দর। ক্রীতদাস নেই, আছে 'মজুরীর দাস', বা 'দরের দাস'। আর সাহিত্যিকেরও কদর তাঁর দর আছে বলে; সে দরও তার থেকে ভিন্ন রকমের কিছু নয়। আজ তো তাঁরা আর রাজারাজড়ার পারিষদ নন, সামন্তদের তাঁবেদার নন,—তাঁরা লেখেন জনসাধারণের জন্য, অর্থাৎ যারা পড়তে পারে তাঁরা তাদের সাহিত্যিক—এদেশে পড়তে পারে শতকরা ক'জন?—তারপরে যারা কিনতে পারে তাঁরা তাদের সাহিত্যিক;—এদেশে কিনতে পারে শতকরা ক'জন? তা হলে লেখককেও বুঝতে হয় এ 'বাজারের ভাও'। সাহিত্যিক অনেকটা স্বাধীন, আর বড়লোকের মোসাহেব নেই তাঁরা;—কিন্তু কতটা স্বাধীন? পাঠক না হয় পরোক্ষে থাকেন, প্রত্যক্ষে আছে কাট্তির ভাবনা, আছে প্রকাশকের শাসন, আর শাসকদের পরওয়ানা। তাই, বাজার বুঝে চল্তে হয়—বাজারের দালালের মর্জি জানতে হয়। এই 'বাজার' সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ।—কত লেখা কত শাখা আজ সাহিত্যের! এই 'বাজার' সাহিত্যের শ্রীহীনতারও কারণ—বাজার বেতালা। এদিকে মন্দা, ওদিকে বেকার। এদিকে ক্ষেতভরা গম পুড়িয়ে দিতে হচ্ছে, ওদিকে লোকে খেতে পায় না। এদিকে জাহাজ-বোঝাই কফি যাচ্ছে সমুদ্রের তলে, ওদিকে লোকে তা চোখে দেখে নি। এদিকে খেটে খেটে মানুষের বুকের রক্ত মুখে উঠছে, আর ওদিকে বেকার মানুষের বুকের রক্ত শুকিয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে। এদিকেও বেকার ধনী, leisure class; ওদিকেও বেকার মজুর, unemployed workers. এদিকে বেকার ধনীর চাই সূক্ষ্ম কথা,

সরু কাজ, ডিটেক্‌টিভ্ গল্প, thriller, sex appeal, যৌন বিশ্লেষণ—অমনিতর কৃত্রিম কিছু, চাই 'good time'—আর ওদিকে বেকার মজুরের চাই উত্তেজক নেশা—উন্মাদনা, রোমাঞ্চ, সেক্‌স্; crude ও violent কৃত্রিম কিছু। বাজার আজ বেতালা, সাহিত্যও আজ বেতালা। তাতে বিকারই বেশী। বিকারের ছাপ পাতায় পাতায়—লরেন্সের চিত্তবিক্ষোভে, প্রুস্তের প্রাক্তন-উজ্জীবনে, অল্‌ডাস্ হাক্‌সলির ঝরা পাতায় ও এপিঠ-ওপিঠের দ্বন্দ্বে, এলিয়টের ধ্বংসলোকে। সমাজ ঘূর্ণীপাকে পাক খাচ্ছে, সাহিত্যেও ঘূর্ণীপাক। তবু কি সাহিত্যিকের আছে স্বাধীনতা আর মজুরের আছে স্বাধীনতা?

'সাহিত্যিক বাজারের দাস নন'। সত্য কথাই। বই-এর কাট্‌তির উপর ভরসা করে থাক্‌তে হলে আমাদের দেশে অন্তত সাহিত্যিকের জীবনই কাটত না। শরৎবাবুই তবু পেয়েছেন সেভাবে বাঁচতে। কারণ, শরৎবাবু সত্যি আমাদের মধ্যবিত্তের সাহিত্যিক—আমাদের আশার নিরাশার, আবেগের আনন্দের, সংস্কারের আর বিকারের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন। আমাদেরই একজন তিনি—জ্ঞানে-অজ্ঞানে। কিন্তু আর কোনো সাহিত্যিক পেরেছেন কি সে ভাবে বাঁচতে, সেভাবে লিখতে? রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান—সেটা আমাদেরই সৌভাগ্য—নইলে তাঁকে খুঁজতে হত ডিপুটিগিরি। নিদেন—হতেন সাংবাদিক, লিখতেন সম্পাদকীয় লেখা। টেক্‌স্‌ট্ বই লিখতেন, নাটক লিখতেন, আর লিখতেন সিনেমার গল্প। আমাদের দেশ আবার বণিকরাজের দেশও নয়—এটা বণিকের চাকরের রাজত্ব।

আমাদের দেশ 'গোলাম-রাজার দেশ'—গোলামীর চেয়ে প্রশস্ত পথ জীবিকার আর নেই। বঙ্কিম গোলামী করলেন, মাইকেল তা না করতে পেয়ে মরলেন। আজকের সাহিত্যিকরাও সেই গোলামীর তখ্‌তে বস্‌তে পেলে হাতে চাঁদ পান। আমি কবি হতে চাইলে আমার পরিবার কপালে করাঘাত করবে। আমি কেরাণী হতে চাইলে আমার পরিবার তবু আশ্বস্ত হবে। আর আমি ডেপুটি না

হয়ে সাহিত্যিক হতে চাইলে বলবে—'মনে করো বঙ্কিম, মনে করো নবীন, মনে করো—' আমাদের সাহিত্য চাকুরের সাহিত্য। এই চাকুরের সাহিত্য আসলে 'চাকরের সাহিত্য'। হবেই ; কারণ এযে গোলাম-রাজার দেশ। আমাদের সাহিত্য-সভা হবে—তার সভাপতি হবেন বড় চাকুরে। মেয়েদের আসর বস্‌ছে, তার কর্ত্রী হবেন বড় চাকুরের গিন্নী। আমাদের সভায় চাকুরে এলে আমরা বর্তে যাই—একটা লোক এল! নামের পিছনে একটা আই-সি-এস্ দেখলে আমাদের মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা আভূমিপ্রণত সেলাম করেন। চাকুরেরা বই লিখলে আমাদের ভাষা ধন্য হয়। তারা সাহিত্যিক হলে আমাদের সাহিত্যিকদের আর গর্বের শেষ থাকে না। তারা ডাকলে আমাদের লেখকেরা ছুটে যান। না ডাকলে আমাদের লেখকদের মান ম্লান হয়ে যায়। তারা আমার বই পড়েছে জানলে আমার নতুন গর্ব আসে, আমি নতুন প্রেরণা পাই—দেশশুদ্ধ লোকই মনে করে আমি একটা মানুষ। এই গোলাম-রাজার দেশে তা হলে কতটুকু স্বাধীন সাহিত্যিক? কতটুকু স্বাধীন সাহিত্যিক মনের দিক দিয়েই বা? কতটুকু স্বাধীন প্রকাশের দিক দিয়ে, বিকাশের দিক দিয়ে? কতটুকু সে স্বাধীন জীবিকায়,—আর কতটুকু স্বাধীন তাই জীবনে? আর কতুটুকু স্বাধীনই বা ধনিকরাজ্যের দেশে সে দেশের সাহিত্যিকরা? তবু সৌভাগ্য তাঁদের যে তাঁরা চাকরের সাহিত্য লেখেন না। কিন্তু লেখেন কি? লেখেন দালালের সাহিত্য। সমাজে সেখানে দালালিতে সুবিধা বেশি—'বাজার' সেখানে বড় সত্য, তা পরোক্ষ জিনিস নয়। সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে সেখানে শেয়ার মার্কেটে ঘোরা বেশি লাভের—আর বেশি লোভের। ক'জন পারেন সাহিত্যের নামে সেই লোভ ছাড়তে? আবার, বই লেখার থেকে সেখানে বই বেচার কথাটা আরও বড় ; ক'জন পারেন বিক্রীর কথা ভুলে বই লিখতে? আর, সেখানেও জীবনে কত বড় ঘূর্ণাবর্ত ; কি করে উঠবেন সাহিত্যিক তার উপরে? কতটুকু তা

হলে সে দেশেও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা—মনের, মতের, প্রকাশের, বিকাশের জীবিকার, জীবনের? বাজারের দরই তাঁরও দর—কতটুকু তাঁর স্বাধীনতা?

যতটুকু ধনিকের সমাজ সইতে পারে ততটুকু—ততটুকুই। যতটুকু নব্ব্ইজনের অধীনতার সঙ্গে পাওয়া যায় ততটুকু—ততটুকুই।

তা'হলে কি করেন সাহিত্যিক? শুধুই দশজনের কথা করেন প্রকাশ—যেমন, আমরা অসাহিত্যিকরা করি তাদের কথা প্রচার। দশজনের শ্রেণীকে আমরা চিনি। সেখানেই আমরা বাঁচতে চাই, সে বাঁচা মোটের উপর আরামের। নব্ব্ইজনের শ্রেণী ও জীবন এক বিভীষিকা। তাই আমরা নিই সেই উপরওয়ালা শ্রেণীর প্রচারের ভার, হই খবরের কাগজের লেখক। এই দশজনের শ্রেণীতেই বাঁচতে চান সাহিত্যিকও। তিনিই বা কেন পৃথিবীতে শক্তি নিয়ে জন্মে বইবেন অভাবের অভিশাপ? নব্ব্ইজনই তাঁরও কাছে এক বিষম দুঃস্বপ্ন। ওই ওপরওয়ালা শ্রেণীর কথা আর ভাবনাকেই তিনিও প্রকাশ করেন! আমরা প্রচার করি, তাঁরা প্রকাশ করেন। আমরা সরাসরি দশজনের ক্ষেত নিড়োই, তাঁরা সে ক্ষেতে ফসল ফলান,—কিংবা ফোটান তাদের সখের বাগানে ফুল।

প্রচারে আর প্রকাশে তফাৎ আছে। অবশ্য সব জিনিসের মতোই এই দুই লোকেও দেনা-পাওনা চলে। প্রচারও কত নিপুণ হতে পারে, তা কত লেখায় আমরা দেখি। আর প্রকাশ যে কত সুন্দর প্রচার হতে পারে তার প্রমাণ মহাকাব্য থেকে ছোট গল্পে পর্যন্ত রয়েছে। তবু প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পষ্ট বিজ্ঞাপন! প্রকাশের একদিকে ফল হয় জ্ঞাপন, আমাদের সম্মতি আদায় করে নেওয়া,—বিশেষ করে ওটাই প্রবন্ধ-সাহিত্যের লক্ষ্য। তা সুলিখিত হলে তাতে আমরা সায় দিই। আর দিকে রস-সাহিত্যের ফল হল স্বীকৃতি—কথা ও চিত্রের মধ্য দিয়ে তা আমাদের অনুভূতিকে পরোক্ষে স্বীকার করিয়ে নেয়, কল্পনা ও ছন্দের মধ্য দিয়ে তা আমাদের

অনুভূতিকে একেবারে সরাসরি স্বীকার করিয়ে নেয়। তবু আমরাও যার কথা বলি সাহিত্যিকেরাও তার কথাই বলেন। এদেশে বল্‌তে হয় গোলাম-দেশের ভদ্রলোকদের কথা, বাবুগোলামের কথা! আর ওদেশে ধনিক-দেশের ধনিক আর তার দালালের কথা—মোটামুটি, উপরওয়ালা শ্রেণীর কথা। শ্রেণীর কথাই বলতে হয়—শ্রেণী যতদিন আছে।

কিন্তু শ্রেণীর কথাই কি শুধু বলেন সাহিত্যিকরা, কিংবা বলি আমরাও? 'বলি না আমাদের নিজের কথা? আমার কথা—যা আমারই কথাও?' বন্ধুরা বেশ ব্যঙ্গভরেই হাসেন। প্রচার যদি নৈর্ব্যক্তিক হত, তা'হলে সব প্রচারকই হতেন একরূপ। কিন্তু দেখেছি কি সাংবাদিকে সাংবাদিকে লেখার কত সূক্ষ্ম তফাৎ; আর লেখকে-লেখকে তফাৎ কত সূক্ষ্মতর? লেখক তো নৈর্ব্যক্তিক নয়। সব লেখাই একটা বিশেষ মনের কথা—তার মধ্যে ব্যক্তির ছাপ আছে। আর ব্যক্তির পরিচয় আছে বলেই তা মানুষকে সচেতন করে। আর সত্যি, সাহিত্য কি শুধুই শ্রেণীগত প্রচার বা শ্রেণীগত প্রকাশ? সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক যে আপনাকে আবিষ্কার করেন। লেখা যে দরকার তাঁর নিজের জন্য, আত্ম-পরিচয়ের জন্য, আত্ম-উদ্‌ঘাটনের জন্য। কথাটা মিথ্যা বলি কি করে?—আমরা জন্মেছি আর একটু-একটু করে নিজেকে চিন্‌ছি, নিজেকে আবিষ্কার কর্‌ছি। শিশুর চেতনায় কতটুকু থাকে তার বৈশিষ্ট্য আর নিজস্বতা? শিশু-সত্তা হচ্ছে অব্যক্ত। সে বড় হয়, বাইরের সম্বন্ধে সচেতন হয়—মায়ের দেহ থেকে তফাৎ হয়ে প্রথম সে পায় 'স্ব'-দেহ। তার আগে দেহও নেই, 'স্ব'-ও নেই—একদিন মানুষেরও তেমনি ছিল জীবজগতের সঙ্গে একাঙ্গতা। চোখ মেলে চেতনায় শিশু দেখে—মাকে, অপরকে, যা সে নয় তাকে। অপরকে চেনে সে, তাতেই নিজেকেও চেনে। এমনি চলে মানুষের আত্ম-পরিচয়। এরূপেই আমরা সমাজের সংঘাতে প্রতিদিন নিজেকেই চিন্‌তে চিন্‌তে চলেছি, আবিষ্কার

করেছি। সেই পরিচয়ই আমরা লিখেছি আমাদের কাজে প্রথমে, তারপরে কথায়। আরও পরে লেখায়, ছাপায়, কত কিছুতে। আবার লিখতে লিখতে সে পরিচয় ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে, লেখা আমাদের ঢেকে দেয়, তা হয় ছদ্মবেশ, চিন্তার আত্ম-গোপন। কিন্তু মজা এই—লেখার এই ছদ্মবেশের মধ্যে দিয়েই মানুষ সব চেয়ে বেশি ধরাও পড়ে। যা সে নয় যতই সে জোর দিয়ে তা ঘোষণা করুক, তার নিজের স্বর তবু ধরা যাবে, ধরা যাবে তার নিজের অ্যাক্‌সেণ্ট। তার নিজের চিন্তার, কল্পনার ও জীবনাবেগের সমস্ত সুর ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসবে। আর যদি খুব সাধুভাবে কেউ লেখায় খুলতে চায় নিজের মন—সজ্ঞানে চেষ্টা করে নিজের পরিচয় নিতে ও নিজের পরিচয় দিতে—তা হলেও সে মানুষকে চেনা যাবে। তার নিজের যে রূপ সে আঁকতে চায়, তারও পশ্চাতে রয়েছে যে তার অপরিচিত তার ছায়া-দেহ, তা পর্যন্ত দেখা যাবে সে লেখায়। ওর জন্যে মনোবিদের শরণ নিতে হয় না। পড়ুন যে কোনো স্মৃতি-গ্রন্থ, যে কোনো আত্ম-চরিত, কিংবা ডায়েরি। লেখার মধ্য দিয়ে মানুষ ফুটে বেরুবেই—জেনে হোক্‌, না জেনে হোক্‌। কিন্তু জেনে যে মানুষ লেখার মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-উদ্ঘাটনের জন্য, যে হাতে নেয় কলম, তার কাছে লেখা হয় রিলিজিয়ন। জানেনই তো, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই হল আমাদের সব শাস্ত্রের কথা। 'Know thyself'—বৃদ্ধ পেলোনিয়াসও বল্‌ছেন তাঁর ছেলেকে, বল্‌ছেন 'Above all to thy own self be true', জানো নিজেকে, আর তোমার নিজের কাছে তুমি সত্য হও—পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও জ্ঞানের এই শেষ যুক্তি।

পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের সেরা রহস্যও এই মতে নিজে, এই সত্তা। কি ওর স্বরূপ ? কি সে, তাই জিজ্ঞাসা করে করে এগিয়ে চলে মানুষ ; প্রশ্নের উত্তর আর শেষ হয় না। শেষ হবে কি করে ? কি আপনার আমার সত্তা, আমিই কি তা জানি, না আপনি তা জানতে পারেন ?

এবেলা আপনার যা ভালো লাগে ওবেলা তাতে রুচি হয় না। অস্থির মানুষের মন, আর অস্থিরতাই হল জীবনের ধর্ম। তবু নাকি সত্তা এরই মধ্যে আছে স্থির, অচঞ্চল। পরিবর্তনের স্রোতে সব ভেসে যায়, শুধু সত্তাই থাকে অপরিবর্তনীয়। অথবা, সত্তা তাতে হয়ে ওঠে পূর্ণতর।—এই হল সাত্ত্বিক বন্ধুদের কথা। কতটা এ ধারণা বিচারে তর্কে টেকে তা বলা শক্ত। এই মানব-চৈতন্যের সঙ্গে কুকুর-চেতনার কতটা তফাৎ তা কে বলবে? বলছেন তো পণ্ডিতেরা—এই আমাদের সত্তাও হয়ত মাত্র কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্সের সমষ্টি। ঠিক সময়ে এক পেয়ালা চা না পেলে মনে হয় দুনিয়া বিস্বাদ,—আর এক চুমুক শ্যাম্পেন পেলে দুনিয়া রঙীন। মাত্রা চড়লে আপনিই অতি সহজে হতে পারেন সম্রাট আলমগীর। অন্তত, সত্তা যে হেরিডিটি ও পরিবেশের মিশ্র পূরণ-ভাগ তা মানতেই হয়। বিজ্ঞান একদিন হয়ত পরীক্ষা করেই বলে দেবে আপনার স্বরূপ। যা'ই ভাবুন, মোটের উপর আপনার সত্তার খোঁজ শুধু আপনাতে পাবেন না। পিরান্দেল্লোর Six Characters in Search of a Dramatist-এর থেকেও অদ্ভুত হবে আপনার এই অনুসন্ধান। দেখবেন আপনারও ভেতরে শুধু six characters নয়, ছ'শো ক্যারেক্‌টার। তার কে অভিনেতা আর কে মূল পাত্র, তা বলা অসম্ভব। আর কোন্ রসস্রষ্টা নাট্যকার বা কোন্ রসবেত্তা দর্শক যে তাদের এই অভিনয় উপভোগ করছে তা জানা আরো অসম্ভব। হয়ত সেও গেছে এই অভিনেতার দলে মিশে—যেমন রবীন্দ্রনাথের নাটকের কবি বা রাজা নেমে পড়েন রঙ্গমঞ্চে। হয়ত সে রয়েছে এদের সবার থেকে স্বতন্ত্র—সাংখ্যের পুরুষের মতো। সত্যাই, আপনি অনেক শীর্ষ, অনেক পাদ, অনেক বাহু। কিংবা সত্যই আপনি বহুরূপী। প্রত্যেকেই তাই। তবু, নিজের এই বহুরূপের আড়ালে স্বরূপ একটা আছে, এই হল আমাদের অনুভূতি। আর তা একেবারে অসম্ভবও নয়। জন্মসূত্রেও আমরা সবাই বিচিত্র-দেহ, যদিও সবাই

মানুষ। একটু বিচিত্র তেমনি হয়ত জন্মসূত্রেই আমাদের মনও,—এক একটা ব্যতিক্রম বিশেষ। তা আমার পরিবেশের যোগ-বিয়োগে বিচিত্রতর মুহূর্তে মুহূর্তে। পিরান্দেল্লোর মতো তার খোঁজে নামলে তাই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি; দেখি শুধু চারদিকে হাজার 'আমি'র কোলাহল। একেই তো জটিল জীব আমি। তারপর, জটিলতর সমাজে আমি আত্মসচেতন হই—কত জটিলতার মিশ্র-পূরণের ফল আমার প্রত্যেকটি mood· তারপর, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে আজ সমাজ; আপনার আমার ব্যক্তিত্ব আর সত্তাও খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে না তো কি? তা অনুসন্ধান তবু করতে হয়, পিরান্দেল্লোও তা ছাড়েন নি। আপনার আমার পক্ষেও ছাড়াবার পথ নেই। বরং যতই জীবনের অন্য প্রকাশপথ বন্ধ হবে ততই এ নেশা বাড়বে। দেখবেন—আপনার রূপের উপর রূপ ধরা পড়বে, আপনার খোলস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে কেবলি আপনি এগিয়ে চল্‌বেন—এরই নাম আজ 'স্বরূপ'-আবিষ্কার। মানে, আত্ম-ব্যবচ্ছেদ। কারণ, আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছুই করবেন না। কারণ আবিষ্কার করবার মতো সত্যই যা আছে তা বড় ভয়ানক—ভয়ঙ্কর, আর তা প্রলয়ঙ্কর। সে আবিষ্কার আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে দেখা দেবে, আপনি তা বুঝুন আর না বুঝুন। আপনার প্রত্যেকটি রূপই তো এক আবিষ্কার। প্রত্যেকবার আপনি যেমন নিরাশ হয়ে ছুট্‌ছেন এগিয়ে, অমনি পাচ্ছেন আর এক নূতন আবিষ্কার। আবার তা ফেলে যান। কারণ তাও তো একটামাত্র রূপ, আপনার সবটা নয়। আপনার খণ্ডরূপ, আপনার স্বরূপ নয়। ছুট্‌লেন নতুন আবিষ্কারের দিকে। তাও আবার তেমনি ভাবে আপনাকে নিরাশ করবে—এও তো আপনার আদি অন্ত নয়। আপনার স্বরূপ আবিষ্কার আর হবে না। আপনি জান্‌বেনও না যে এই সমস্ত রূপ তার থেকে পৃথক নয়। জানবেন না যে, এই শত শত রূপেই আপনার স্বরূপ। আর সে রূপ ফোটে সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে। দেখবেন না যে, আপনি দশ দিকের ঘাত-প্রতিঘাতে

ভেঙে ভেঙে চলেছেন আর গড়ে গড়ে উঠছেন। এই আপনার পরিচয়—এর কোনো-একটিমাত্র নয়, সব কয়টি। তার চেয়েও বেশি—আপনি আপনি হিসাবেও সমাজকে ভাঙছেন, গড়ছেন—ভাগ্যবিধাতা।

এ পরিচয় শুধু লেখার মধ্য দিয়েই সম্ভব, এরূপ ভাববারও তা হলে কারণ নেই। জেনে আর না জেনে মানুষ সব-কিছুর মধ্য দিয়েই কি এই আত্মপরিচয় দান করছে না?—লেখার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে, ছবির মধ্য দিয়ে, নাচের মধ্য দিয়ে। কথার মধ্য দিয়ে আর কাজের মধ্য দিয়েও কি এই পরিচয়ই ফোটে না? তবে, কারও পরিচয় নিজের কাছেও ঝাপ্সা থাকে, অপরের কাছেও থাকে ঝাপ্সা। তাদের যা বৈশিষ্ট্য তা চোখে পড়েও চোখে পড়ে না। তারা সামান্য-ধর্মা। হয়ত জন্মাধিকার তাদের অল্প, আর পরিবেশের প্রতিকূলতা করেছে তা স্বল্পতর। আবার, কারো পরিচয় স্বল্পস্থায়ীও। কথার আর কাজের থেকে লেখার আর ছবির আয়ু দীর্ঘতর। গানের আর নাচেরও জীবন এখন থেকে দীর্ঘতর হবে। এসবের মারফৎ যাঁরা নিজেদের উদ্ঘাটন করবেন তাঁদের নাম বেশি দিন টিক্‌বে। কিন্তু শীঘ্রই হয়ত সে সব নামও সংখ্যায় ভয়ানক বেড়ে যাবে। এখন আমরা কিছুই ধ্বংস হতে দিই না, সব কুড়িয়ে রাখি,—গজে গজে ফিল্‌ম, ইঞ্চি ইঞ্চি রেকর্ড সব জমা করি। ফলে, জমে উঠ্‌বে লক্ষ লক্ষ কৃতী পুরুষের নাম, thick as leaves of Vellambrosa. তখন আবার ছেঁটে ফেলতে হবে কিছু নাম। এমনি করে মহাকালের কাস্তের সাম্‌নে আমার মতো আপনার মতো প্রায় সবাই যাবে শেষ হয়ে। তবু, আপাতত কিছুদিন কৃতীদের নাম শোনা যাবে, আর তাই কি কম? দু'দিন বেশি বাঁচতে পেলে মানুষ কি না দেয়?

কিন্তু, ঠিক মতো আত্ম-পরিচয়ও মানুষ আজ কিছুতেই দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। ঠিক মতো নিজের স্বরূপ যেমন আজ আমরা জানতে চাই না, তেমনি যতটুকু জানি তারও পরিচয় আমরা আজ দিয়ে উঠতে পারি না। গানে, লেখায়, ছবিতে, কথায়, কাজে,

কোনোটাতেই সম্পূর্ণ পরিচয় আজ ফোটে না। খুব ভালো করে ওসব পথের বিশেষ আঙ্গিক অধিকার করছি, তবু পরিচয়ে ফুটছে না। শুধু আত্ম-সাধনায়ও তা হয় না—জন্মাধিকারের সঙ্গে অবশ্য থাকা চাই সাধনা, আর থাকা চাই নিপুণতা, কৌশল। অনেকটা মেরে দেওয়া যায় বুদ্ধির কৌশলেও। এসব থাকলে অবশ্য নিজেকে খানিকটা উদ্ঘাটন করা সম্ভব। তবুও অনেক বাকী থাকে। কেউ আরো অনেকটা প্রকাশিত করে দেন—যতটুকু রূপ অপর-গ্রাহ্য প্রায় সব। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় আজ কেউ দিয়ে উঠতে পারে না। কতটুকু দিতে পারি? যতটুকু এই সমাজের কাঠামোর মধ্যে দেবার সুযোগ আছে। মানুষের কাছে মানুষ যতটা প্রকাশিত হতে পারে, যতটা পারে মানুষ মানুষকে দিতে,—তাও আর দিতে পারি না আমরা আজ। কি করে পারব? এ যে পতিত জমি—waste land. জন্মসূত্রে যদি কবি হয়ে থাকি, তবু আজ গোলাম দেশে আমি হব মুনসেফ্, হব ডাক্তার, হব পুলিশ কোর্টের উকীল, আই. সি. এস্। কোথায় আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ—নিজের ভাষা? তা ছাড়া নেবার শক্তিও মানুষের সমান নয় তো। যথেষ্টও নয়—তাও দেখেছি। পাটের দালাল আমাকে নিতে পারবে, কিন্তু পাটের চাষী আমাকে নেবার জন্যই প্রস্তুত হয় নি যে। আজ মানুষের সৃষ্টিশক্তি মুক্তি চাইছে। সে প্রবল হয়েছে, ধনিকের প্রয়োজনের থেকে বড় হয়ে উঠেছে। তাই ধনিকের সমাজ চায় তাকে চাপা দিতে। ব্যক্তির সত্তা আজ চায় তাই এই দশজনের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি, নব্বুই জনের উৎপাদন-শক্তিও চায় সার্থকতা। আর সৃষ্টিশক্তির পক্ষে তা'ই স্বাধীনতা। তা হলে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাই বা আজ কিসে?—মানুষের এই চাপা-পড়া সৃষ্টিশক্তিকে মুক্ত করায়, নব্বুই জনের সৃষ্টিশক্তিকে বিকাশ করায়। এরই অর্থ সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ। আর এই হল সৃষ্টির স্বাধীনতার মূল অর্থ—দশজনের দৌরাত্ম্য থেকে সকলকার সৃষ্টিশক্তির মুক্তিলাভ।

তা হলে কি কলম ছেড়ে সাহিত্যিক নেবেন কোদাল, কিংবা কাস্তে আর হাতুড়ি? নিলে খুব অন্যায় করবেন না—অন্তত পক্ষে যা সৃষ্টির কাজ তাই করবেন। সে হিসাবে হয়ত কলম দিয়ে নিজের মনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার থেকে বেশি সার্থক হবে কোদালি দিয়ে সাহিত্যের জমি গড়ার কাজ। কিন্তু তার চেয়েও দরকারী কাজ আছে কলমদারেরও। সৃষ্টির নিয়মে তার স্থানটা গৌণ নয়। সেটাও বোঝা দরকার। আর সৃষ্টির সেই দাবি বুঝলে তার কলমও ছুট্‌তে পারবে স্বচ্ছন্দে। মানুষের শিল্প-সাহিত্য অনেকাংশেই তো তার মনের ফসল। সে মন যে আবার সমাজের স্পর্শে গড়ে উঠছে, তা আর বারবার বলে কি লাভ? এই মন যে জীবজন্তুর চেতনার মত একটা অপরিণত অপরিস্ফুট জিনিস নয়, তাও বলার দরকার আছে কি? আর এই মন যে সভ্যতার স্তরে স্তরে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আর বিজয়ে, দিনে দিনে বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাও কি আমরা জানি না? জীবের প্রাণবেগ আমার মধ্যেও আছে, ছিল তা আদিম মানুষের মধ্যেও, আর আছে জীবজন্তুর মধ্যেও। কিন্তু তাতেও কি তফাৎ ঘটে নি? রূপে আর বলে আর ভঙ্গিতে তাও তো বিভিন্ন ধরণের হয়েছে। জীব তারই তাড়নায় এখনো বাঁচে মরে। কিন্তু আদিম মানুষ পর্যন্ত সেই তাগিদে নিজের জীবনকে আয়ত্ত করত, জীবিকার উপায় জয় করে নিত। তাতেই আবার মানুষের মন-বুদ্ধি-প্রাণ পায় একটু নূতনত্ব। আবেগ-অনুভূতি নাচে-গানে-শিল্পে রূপ নিয়ে তাকে প্রেরণা জোগাল, উৎসব জোগাল উৎপাদন শক্তি, আর উৎপাদনের প্রয়োজনে উৎসবও নতুন হয়ে উঠল। পূর্বের সেই জৈবীগ্রন্থিরস মানুষের দেহক্রিয়ায় শেষ না হয়ে মানুষের মনকে সরস করে তুলল, সক্রিয় করে তুলল—আর তাই হ'ল প্রথমকার শিল্প, দেহ-মন জুড়ে রসের প্রথম প্রকাশ। তাতেই আবার আয়ত্ত হ'ল জীবনযাত্রার নতুন উপায়। এইভাবে মনের রস-ভাণ্ডার জীবের বাস্তব প্রয়োজন বুঝে জীবনের রসরূপ উৎসারিত করল। সে সৃষ্টিতেই

বাস্তব জীবন আপনার ভাবী আভাস দেখল, মানুষ দেখল তার মুখচ্ছবি। আর বাস্তব ক্ষেত্রে সেই রস-রূপের আভাসে গড়ে উঠল নূতন উদ্যোগ, নূতন উৎপাদন। সৃষ্টির উদ্যোগ এমনি চলেছে—বাস্তব আর মানসক্রিয়ার সংযোগ রেখে, সংযুক্ত হয়ে। সৃষ্টির সেই বাস্তব প্রকাশের সহিত সংযুক্ত হয়ে ওঠে আবেগ অনুভূতির এক এক বিশেষ প্রকাশ—শিল্পে, সাহিত্যে। এ যোগ হারালে সাহিত্য রক্তহীন হয়। আর বাস্তবক্ষেত্রেও সাহিত্যের দান হারালে কর্মী খোয়ায় তার রস-প্রেরণা, খোয়ায় তার জীবনের পূর্ণ আস্বাদ, খোয়ায় তার রূপ-কল্পনা। সৃষ্টির দুই মহলে—বাস্তব-সৃষ্টিতে আর রস-সৃষ্টিতে,—এমনি চলেছে সমান তালে দেওয়া-নেওয়া।

মানুষের ইতিহাসে এত বড় কাজই শিল্পীর ও সাহিত্যিকের। তাঁরা সৃষ্টি করেন; আর শুধু সৃষ্টিই করেন না, মানুষকে আবার সৃষ্টি-মুখী করেন, মানুষের সাম্‌নে ধরেন জীবনের নবায়মান রূপ—আর তাই বাস্তব হয়ে ওঠে সত্য। রূপকল্পনাকে সত্য হবার পথে শিল্পীরা জোগান প্রথম দান। এ দান জোগানো মানে প্রচার নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ দান শিল্পীরা জোগান তাঁদের শিল্পকলার মারফৎ, সাহিত্যিক তাঁর ভাষার মারফৎ। ভাষায় এ দান সাহিত্যিক কবিতায় জোগান রসানুভূতি প্রকাশ করে আর সমাজের রসানুভূতিকে উজ্জীবিত করে। এ দান জোগান তাঁরা কথা-শিল্পে সমাজের চিত্রশালা খুলে দিয়ে; আর সেই রসচিত্রের মধ্য দিয়ে বাস্তব-সৃষ্টির ইঙ্গিত অন্তর্নিহিত রেখে। এ দান জোগান তাঁরাই আরও শত শত রচনা-রূপে—গল্পে, প্রবন্ধে, নাট্যে,—হাসির সংগে মিশিয়ে, কান্নার সংগে মিশিয়ে, সমস্ত রসের জোগান দিয়ে। আবার নানা টেক্‌নিকের রচনা-রীতির উদ্ভাবনে, সংমিশ্রণে। এ দান জোগাতে হলেই সাহিত্যিকদের যোগ থাকা চাই জীবনের সংগে; সৃষ্টির বাস্তব অধিকারীদের সংগে, জীবনযাত্রায় যারা উৎপাদনের অধিকারী, বাস্তব-ক্ষেত্রে যারা স্রষ্টা—তাদের সংগে, নব্বুই জনের সংগে। তা না থাকলেই তাদের সাহিত্য-কর্ম, কবি-কর্ম আর সৃষ্টিধর্মী

থাকে না। না থাকলে তখনো তা তৃপ্ত করতে পারে সেই দু' দশজনকে, তার টেক্‌নিক তখনো দু'একজনে তারিফ করতে পারে, কিন্তু তাতে নতুন সৃষ্টির পথ খুলে যাবে না। বাস্তবক্ষেত্রের স্রষ্টাদের সহিত তাই চলা দরকার সাহিত্য-স্রষ্টার—'সাহিত্য' সাহিত্যেরই প্রয়োজন। এটাই হল 'সৃষ্টির স্বাধীনতার' দ্বিতীয় অঙ্গীকার বা 'করোলারি'।

সৃষ্টির এই মূল দাবি স্বীকারেই সম্ভব হয় সাহিত্য-সৃষ্টি। সৃষ্টির যে শক্তি জীবনে মুক্ত হওয়া দরকার সে শক্তিকে মুক্ত করতে সাহায্য করা—এই হ'ল সাহিত্যের কাজ। এ কাজ সাহিত্য করে কাস্তে আর হাতুড়ি দিয়ে নয়—কলম দিয়েই। আর বাস্তবের সেই সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে যত নিবিড় হবে তার পরিচয় ততই সত্য হয় সাহিত্যিকের সৃষ্টিও। অর্থাৎ হাতুড়ির আর কাস্তের সঙ্গে যত হবে কলমের যোগ ততই কলম আপনাকেও সার্থক করতে পারবে। কিন্তু কাজ তাকে কলম দিয়েই করতে হবে—হাতুড়ি দিয়েও নয়, কাস্তে দিয়েও নয়। এই হল 'সাহিত্যের স্বরাজের' মূল কথা—মনের সৃষ্টিশক্তিকে ভাষায় প্রকাশ করা—ভাষা দিয়ে বস্তুকে রূপ দেওয়া।

কিন্তু রূপ দেওয়া চাই, চাই objectification কল্পনার 'তাদ্‌গত্য' না হলে হবে না। কারণ সাহিত্যের সৃষ্টি ভাষা দিয়ে হয়। সাহিত্যের বাহন হল ভাষা। কিন্তু ভাষায় যা কিছু বলা হয় তা সাহিত্য নয়। প্রত্যেক শব্দের পিছনে থাকে অর্থ, থাকে ভাব, থাকে এমন কি লক্ষণ আর ব্যঞ্জনা।

এই সব শক্তি নিয়ে সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে বসেন। সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রকাশ। তার অর্থ বিকাশও। যা ভাষায় প্রকাশিত হল তা'ই সৃষ্টিরূপে বিকশিত হল। বিকাশ তা হলে প্রকাশ-সাপেক্ষ। সাহিত্য হচ্ছে তাই প্রকাশ-ধর্মী। আর, এই প্রকাশেরও তাই রীতি আছে, নিয়ম আছে। সে নিয়ম অবশ্য বাঁধা-ধরা নয়, অনড়-অচল নয়। সৃষ্টির যেমন নতুন মাল-মশলা জোটে, নতুন উপাদান যেমন হাতে আসে, তেমনি প্রকাশের পুরনো রীতির রূপান্তর

হয়। নতুন রীতির আবিষ্কার হয়—প্রকাশ-রীতির সীমানা বিস্তৃত হয়। মহাকাব্য ছাড়িয়ে তাই আমরা এসে গেছি গীতিকাব্যের যুগে, এসে গেছি গদ্যকাব্যের যুগে—যখন সেই পুরনো গদ্যকাব্য আবার নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য হল এই—প্রকাশ। সেই প্রকাশেরও নিয়ম তবু আছে, আর সেই নিয়ম মেনেই সাহিত্যিক ভাষার রাজা হন, সৃষ্টিতে সার্থক হন। আবার অমনি নিয়মকে মেনেই সাহিত্যিক নিয়ম-ভাঙা পথে নতুন সৃষ্টিও উৎসারিত করেন, প্রকাশের রীতিকে করে তোলেন বিচিত্র আর বিস্তীর্ণ। মোটকথা—প্রকাশের দাবিই হল সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কথা। আর 'সাহিত্যের স্বরাজ' মানে হল এই প্রকাশের রাজদণ্ড চালনা। অবশ্য এই সাহিত্যে প্রকাশ অর্থ হচ্ছে ভাষায় প্রকাশ—শব্দ, অর্থ, ভাব, ধ্বনি—এদের নতুন নতুন সন্ধি আর সমন্বয়। কখনো তাতে প্রাধান্য পায় কল্পনা আর সঙ্গীত, যেমন কাব্যে; কখনো প্রাধান্য পায় কথাবস্তু বা জীবনচিত্র—যেমন গল্পে, উপন্যাসে, নাট্যে। এদেরই নানা জাতি-উপজাতি দেখা দেয়—শব্দের অর্থ, ভাব, ধ্বনির নানা সূক্ষ্ম আদান-প্রদানের দরকার হয়। তাতেই তাদের প্রকাশ হয় সম্ভব, আর প্রকাশ সার্থক হয়। এইজন্য দরকার হয় চেনা—একেবারে সম্পূর্ণ করে চেনা ভাবকে, অর্থাৎ চেনা বিষয়-বস্তুকে আর ভাব-বস্তুকে; চেনা আর তাদের একেবারে কবলিত করে নেওয়া, পাওয়া ভাব-রূপ। অর্থাৎ ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু, এই দু'য়ের সুসঙ্গতি আনা, চেনা সেই সুসীম রূপ। তার সঙ্গেই আবার দরকার চেনা সেই ভাবের উপযোগী উপকরণকে, ভাষাকে। একেবারে সম্পূর্ণ করে চেনা, চেনা এই আঙ্গিক (technique)। তার অর্থ চেনা—ভাষার অর্থকে আর ভাষার পিছনের লক্ষণ ও ব্যঞ্জনাকে, ইঙ্গিতকে,—কল্পনা আর সঙ্গীতকে। কোনো দিকে পথ ভুল না করে ঠিক আয়ত্ত করা এই ভাষাকে। একটু অসতর্ক হলেই ভাব ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে, ঠিক যে ভাষার কাছে যে ভাব বাগ্‌দত্ত তাকেও আর চেনা যাবে না,—নানা ভাব কোলাহল

জুড়ে দেবে। লেখা আর রসরূপ লাভ করবে না, হবে বাজে লেখা। Objectivity—এইটিই হল তাই 'সাহিত্যের স্বারাজ্যের' creed, বস্তুর তাদ্‌গত্য, মূল লক্ষ্য রূপ দান। ভাব আর ভাষার প্রকাশ-কলা এই রূপায়ণ-রহস্য।

এই প্রকাশ-কলার ব্যাকরণ শিখতে তাই বসে যান সাহিত্য-জিজ্ঞাসুরা। কেউ বলেন এই প্রকাশের মূল উপকরণ হল অলংকার। কেউ বলেন তা শব্দালংকার, বক্রোক্তি,—যেমন দেখি জয়েসে, এলিয়টে, ভার্জিনিয়া উল্‌ফে। কেউ বলেন—অর্থালংকার, 'ফর্ম',—যেমন দেখি ওসব লেখকে ও এজরা পাউণ্ডে। কেউ বলেন শব্দালংকারই বটে, তবে ধ্বন্যাত্মক—যেমন, গীতধর্মী কবিতা বা Pure Poetry ভ্যালারির মতে ; কিংবা চিত্রধর্মী—যেমন রসেটির কবিতা। ধ্বনিতে বা রূপকল্পে, দু'য়েতেই এক স্নায়ুগত প্রতিধ্বনি বা—প্রতিলিপি জাগে—রস জমে। এ সাহিত্য দেহাত্মবাদীর রূপ-তত্ত্ব। আর কেউবা বলেন—প্রকাশ-কলা রসেরই উজ্জীবন ; তবে রস 'লোকোত্তর', 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর', 'ভাগবতী', ইত্যাদি ইত্যাদি,—যা অধ্যাত্মবাদীর মামুলী তত্ত্ব। কথার পরে কথা বাড়ে ; কিন্তু প্রকাশ-কলার মূল কথা হল এই যে—তা অখণ্ড, এক unity। সৃষ্টি মানেই একটা অখণ্ড আবির্ভাব। প্রায় organic, আর প্রকাশও তা'ই। লেখার অর্থ চিরে, ধ্বনি বিচার করে আর অনুভূতি বিশ্লেষণ করে ওকে গেঁথে তোলা যায় না। এইখানেই সৃষ্টির রহস্য—ওতে বিষয়বস্তু ও ভাববস্তু, শব্দচিত্র আর ধ্বনির ইঙ্গিত, সব এক-একটি বিশেষ প্রয়োজনে একটি অখণ্ড (integrated) রূপ লাভ করে, তাতে সুষমা ফুটে ওঠে, তা অখণ্ড। প্রত্যেক রসরূপ তাই অখণ্ড (unity) আর অপূর্ব (unique)—বিশেষ করে কবিতা। উপন্যাসে তবু ভাষা একটু গৌণ—কথাবস্তু আর চরিত্রচিত্রই আসল জিনিস, ভাষা তার বাহন মাত্র। কাব্যে কিন্তু এই শব্দের দৌত্যেই সমস্ত খণ্ডতা অখণ্ডরূপ লাভ করে। তা হলে, সাহিত্য শুধু সামান্য প্রকাশ নয়—

একটি অখণ্ডরূপ সৃষ্টি—একটা অপূর্ব সমন্বয়—শব্দের মারফতে ভাবের ও বস্তুর একাত্মতা লাভ, integration। আর এইটিই প্রকাশ-কলার আসল কথা—শিল্প এক অখণ্ড রূপসৃষ্টি।

আজ আবার শিল্পী সেই অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করতে পারছেন না। কারণ, প্রথম তো তাঁর নিজের যা সত্তা তা'ই পড়ছে চাপা—গোলামিতে আর দালালিতে, বাজারের দর-দস্তুরের চাপে। তারপরে, আমাদেরও প্রত্যেকের প্রাণমন সেই বাজারের দর-বাঁধা। আমরা যে যাই শক্তি নিয়ে জন্মি, আমরাও তা ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারি না, তার খোঁজও পাই না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগের এই হয়েছে আজ দশা। ব্যক্তিই আজ আর নেই—আছে working class type, আছে কেরাণী, আছে মিস্ত্রী। পৃথিবীর নব্বুইজনের উপর মাল টানবার ভার—নইলে সমাজের মালগাড়ী অচল হবে। অতএব মানুষ হওয়া তাদের নিষেধ—আর চাপা পড়ল তাদের অনেক শক্তি, অনেক অনুভূতি। উপবাসী রইল আত্মা। তাদের জন্য রইল জমা—মদ আর উত্তেজনা, crime stories, thriller, boxing, sex ribaldry. আর দশজনেরও সামনে খোলা লাভের দুয়ার—লোভ তাদের সেখানে, তারা ডিভিডেণ্ড কুড়োয়, বাজারের উপরতলায় বসে বাজারকে হাত করবার নেশায় তারা মশগুল থাকে। আর যারা তাতে মাতে না—তারা চায় সময় কাটাবার মতো মৌতাত—যেমন, বাজার-ফেরতা তাদের বন্ধুরাও চায়—চায় thriller, চায় sexy ফিল্‌ম, গল্প ইত্যাদি। উপবাসী রইল তাদেরও আত্মা। সব দিকেই উপবাসী মানুষ আর উপবাসী তার আত্মা। দাবি তাদের—tinned food ও tinned সাহিত্য। কি করে তা হলে তারা নেবে কবির দান, সাহিত্যিকের মনের ফসল?—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী—মানুষের ঠাঁই নাই, মুনাফার সোনার ধানে গিয়াছে সে ভরি'। অতএব সাহিত্য হল Escapist সাহিত্য, হয় ভোলবার মতো আফিম, নয় দুধের সাধ ঘোলে মেটানো।

তা হলে আজ যখন চাই 'সৃষ্টির স্বাধীনতা' তখন ভুল চাই না, তবে তা ভুল করে চাই। সে ভুল এই যে, সৃষ্টি শুধু সাহিত্যের বা শিল্পের কাজ নয়; কবিকর্মও কর্ম, অন্য সৃষ্টিকর্মের তা সগোত্র। বৈজ্ঞানিক আর কর্মীও সৃষ্টি করছেন, আর আজ আসলে সৃষ্টি করছেন যাঁরা নব্বুইজন তাঁরাই। আর 'স্বাধীনতা' অর্থও শুধু 'বিচ্ছিন্নতা' নয়, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো নয়; কিংবা জীবনে যা-খুশী করবার অধিকারও স্বাধীনতা নয়। 'স্বাধীনতা'র মানে প্রায় তা হয়ে উঠেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে। আমরা ভাবতে শিখেছি—ব্যক্তির যা-খুশী করতে পারাই বুঝি স্বাধীনতা, তাতেই বুঝি বিকাশ। আসলে যতই দেখছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ আজ ব্যক্তির প্রকাশের পথ বন্ধ করেছে, যতই আমরা উপবাসী থাকছি, ততই স্বাধীনতার মন-গড়া ধারনা তৈরী করছি,—জীবনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কল্পনা করছি, ভাবছি, যা-খুশী করতে পারাই স্বাধীনতা—তা'ই বুঝি Rights of Man. আমাদের এই rightও abstract, manও abstracted. এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—concrete living বা প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এরূপ মন-গড়া জিনিসের আশ্রয়ই নিতে হয়। সামন্তযুগের গোলামিতে পীড়িত হয়ে রুশো ঠাওরালেন, Man was born free and he is everywhere in chains. আর ধনিকবাদে বিকৃত-ব্যক্তিত্ব মানুষকে দেখে ফ্রয়েড্‌ও বল্‌ছেন—Life is hard to endure—অর্থাৎ সভ্যতার অর্থ হচ্ছে প্রাণাবেগের উপবাস। স্বাধীনতার এই মিথ্যা ধারণা আমাদের জীবন-বিমুখিতারই ফল। কিন্তু তা আমাদের পেয়ে বসেছে ফ্রয়েডের কল্যাণে আরও বেশি করে। তা'তে স্বাধীনতার যা স্বরূপ তা'ই আমরা ভুলে যাচ্ছি। আর ফলে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই—ডি. এচ্. লরেন্সের যেমন অনেকটা মত—প্রকৃতির পুতুল হও। কিংবা টি. ই. লরেন্সের যেমন দৃষ্টান্ত—পালাও আরব সমাজে যেখানে মানুষের হৃদয়াবেগ ও জীবনযাত্রা এখনো তার প্রাথমিক

রূপ একেবারে হারায় নি। মানুষের সভ্যতার আজকের বিকৃত রূপ ও আজকের বিকৃত অর্থ থেকেই স্বাধীনতারও এমনিতর বিকৃত থিওরি আজ গড়ে উঠছে! অথচ ইতিহাস বলবে—মানুষ স্বাধীন ছিল না, স্বাধীন হচ্ছে। জীবজন্তু স্বাধীন নাকি? 'জঙ্গুলে আইনে' স্বাধীনতা কোথায়? সর্বত্র ভয়, সর্বত্র বিভীষিকা। ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে ফিরতে হয়, প্রাণের মমতায় পালাতে হয়—প্রকৃতির নিয়মের নিগড়ে জীবজন্তু বাঁধা। সেই নিয়ম থেকে মানুষই একটু একটু করে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে নিয়মকে বুঝে তার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সে আপনার জীবিকা-বস্তু আপনি উৎপাদন করতে পারে—জীবন তাই তার হল একটু আয়ত্ত, হল সে একটু আত্মবশ।—সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারে, আর ব্যবস্থার দ্বারা তার অবস্থাকেও আবার নতুন করে নিতে পারে, এই তার 'স্বাধীনতা'র দ্বিতীয় কারণ। তাই সে আগুন আবিষ্কার করল, হাতিয়ার গড়ল, যন্ত্র গড়ল, প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করল; আর তাতেই নিজেই হল নিয়মের রাজা। নিয়মকে উড়িয়ে দিলে না, নিয়মকে অধিকার করে নিলে। জলবায়ু সবই সে মেনে নিলে, বুঝলে তার প্রয়োজন, তার দাবি; তাতেই পেল সে শক্তি, পেল মুক্তি। জলকে বেঁধে সে চালায় কল, বায়ুকে ধরে নিয়ে সে বাড়ায় আয়ু, বিদ্যুৎকে নিয়ে সে হল বজ্রধারী। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা, আর ব্যবস্থার দ্বারা সেই অবস্থার পরিবর্তন করা—এই হল তার স্বাধীনতার মূল কথা। স্বাধীনতা মানে মাথা নিচে দিয়ে আর পা উপরে দিয়ে হাঁটা নয়—তেমন যা-খুশী তা করবার "স্বাধীনতা" মানুষের নেই। প্রাকৃতিক নিয়মকে জেনে সে তা কাজে লাগায়, কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে সে তাই বলে বাতিল করতে পারে না,—সে কেন, তার ভগবান্‌ও পারে না।

জীবিকার দাবিকে বুঝে জীবনযাত্রা গড়া, তা'ই হল স্বাধীনতা। সাহিত্যের স্বরাজ মানে—প্রকাশের দাবিকে সাহিত্যে চূড়ান্ত বলে

স্বীকার করা—যে প্রকাশ অখণ্ড আর অপূর্ব। আর সৃষ্টির স্বাধীনতাও দেখেছি—বাস্তবের সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে রসস্রষ্টার নিবিড় সংযোগ রক্ষা। তার অর্থ, জীবন ও জীবন-সত্যের কাছে সাহিত্যের আত্মসমর্পণ—হাতুড়ি আর কাস্তের সঙ্গে মিলন কলমের—তাতেই কলমের মুক্তি। আর রূপদান অর্থ—সেই জীবন-সত্যকে প্রকাশ, এক অখণ্ড উপলব্ধির প্রকাশ, বাস্তবের সত্যিকার রূপান্তর। এতেই কলমের সার্থকথা, তা'ই তা'র স্বারাজ্য।

শেষ কথাটি এবার আর একবার বলি—প্রকাশ মানে প্রচার নয়। সৃষ্টি প্রকাশই চায় সাহিত্যিকের কাছে, প্রচার চায় অ-লেখকের কাছে। মাভৈঃ, আমাদের গোলাম-রাজের দেশের সাহিত্যিকরা,—প্রচার আপনাদের করতে হবে না। সে দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা তা পালন করবেন। তাঁরা লড়াই করবেন কলম নিয়ে, কালি নিয়ে। তাঁদের কথা যেমন লোকে পড়ে তেমনি আবার বিরূপ হয়। কারণ প্রচারের রূপ নেই—আছে বড় জোর আওয়াজ। কিন্তু সাহিত্য রূপ দেয়—তাই তাতে বিরূপ হওয়া শক্ত। সে সম্মতি আদায় করে নেয় বাক্যের স্বচ্ছতা দিয়ে, সে স্বীকৃতি আদায় করে নেয় অনুভূতিতে আলোড়ন তুলে। তা হ'লে বল্‌ব, এ যুগের সাহিত্যের কাজ হ'ল এই—সৃষ্টি-প্রেরণা যখন জীবনে পথ খুঁজে পাচ্ছে না—গদ্যের কোদালি চালিয়ে গড়তে হবে সৃষ্টির জন্য সেই পতিত জমি ; কাব্যের কলম চালিয়ে ফলাতে হবে তাতে সৃষ্টির সোনার ফসল ; সৃষ্টি করতে হবে, মানতে হবে সৃষ্টির দায়িত্ব ; চাকরের সাহিত্য হবে মানবের সাহিত্য ;—আর সৃষ্টির স্বাধীনতা জয়ী হবে জীবনযাত্রায়, জয়ী হবে সাহিত্য-কর্মে, জয়ী হবে জীবনে—এই প্রথম সর্বদিকে।

১৯৩৪

কোদালি ও কলম

What shall I sing when all is sung,
And every tale is told ?

আমার লেখবার কি আছে যে আমাকে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন আপনারা ? কি আমি লিখব ? অবশ্য লিখতে আমি এখনো পারি—ইউরোপের পলিটিক্যাল পরিবর্তন সম্বন্ধে, তুনিয়ার বর্তমান অর্থসংকট সম্বন্ধে ও ভাবী রাষ্ট্রসংকট সম্বন্ধে। আর স্বদেশের পলিটিক্স্ ও ইকোনমিক্স্, তু'য়ের সম্বন্ধেই পারি কিছু না কিছু লিখতে, তা-ও ঠিক। কিন্তু সে সব কথা পুরনো, সব কথাই বাসি মাল। অবশ্য উপায়ও নেই। আমরা থাকি বন্ধ ঘরে, আমাদের কাছে খবর যখন পৌঁছোয় তখন খবর আর তাজা নেই—তা তুনিয়ার শেষ হাটের কেনা, বাজার-কুড়োনো জিনিস। আমাদের দেশে, আমাদের ভাষায় এখনো এই জিনিসকেই ঢেলে সেজে দিতে হয়, আর দেশের লোকেরও তাই উদরস্থ করতে হয়। এই আমাদের সমস্যা, অবস্থা এই।

আপনারা অবশ্য তুনিয়ার হাল বুঝ্‌তে চান না, আপনারা চান সাহিত্য। সাহিত্য—যা একালেরও নয়, সেকালেরও নয়, ভাবী কালের। আপনারা চান আগামী কাল ; আপনারা সাহিত্যে 'নূতন-বাদী'। কিন্তু আগামী কাল কি হবে, তা জানতে হলেই তো জানতে হয় তুনিয়ার হাল। আগামী কাল অবশ্য সূর্য উঠবে, সন্ধ্যা আসবে, আকাশে কালপুরুষের এমনি আবির্ভাব হবে,—এসব আমরাও জানি। পঞ্জিকাকার বলে দেন আরো একটু বেশি—সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ, আকাশে নতুন গ্রহের আবির্ভাব, ইত্যাদি।

কিন্তু তা হলে তো সাহিত্যে 'নূতন' বলেও কিছু নেই, আছে শুধু সেই পুরাতন কথা। আপনারা তা মান্‌বেন না।

আমি কিন্তু বলব,—এ শুধু পলিটিক্‌সের কথা নয়, সকল ক্ষেত্রেরই কথা। দুনিয়ার হালে ভাবীকালের একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সে হিসাব বুঝলেই আপনাদের সাহিত্যের ফসলেরও একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। তা না হলে সাহিত্যে কি ফসল ফলবে তা কি আপনারা বলতে পারেন? আপনারা বলবেন,—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পের দিন গিয়েছে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও—যে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী,' 'মানসী'র কবি—তাঁর লোকান্তর-বার্তা তিনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন 'শেষের কবিতা'য়; 'পুনশ্চ' তো আপনাদেরই পুরশ্চরণের বাণী। এসব কথা মিথ্যে নয়। সমস্ত মোটা কথাই খানিকটা সত্য দিয়ে দোমেটে করা, জেনারিলিজেশান মানেই আধা-সত্য। কিন্তু তাকে পুরা সত্য বলেও তাই মনে করা যায় না। পৃথিবী এমনি প্যারাডক্‌স্‌ দিয়ে গড়া; তার একদিকে হিট্‌লার আর দিকে ষ্টালিন। আর তারই ঠোকাঠুকিতে পৃথিবী আপনাকে ভাঙছে আর গড়ছে। কিন্তু গড়ছে, বারে বারে গড়ছে। আর সেই গড়ার ইঙ্গিতের দিকে এগিয়ে দেওয়া হল প্রত্যেক কালে সমকালীন সাহিত্যের ধর্ম; আর সেই গড়ার ভঙ্গী বুঝে নেওয়া, ইঙ্গিত ধরে ফেলা হল সকল কালে দর্শনের বা বিজ্ঞানের ধর্ম।

ভাবী গঠনের সে ইঙ্গিত না জান্‌লেও কি ভাবী কালের সাহিত্য গড়া চলে?

আসলে পুরনো সাঁচ্চা জিনিস অচল হয় না। তাই পুরনো রবীন্দ্রনাথই সব চেয়ে নূতন রইলেন। দেখুন 'মহুয়া', দেখুন 'পুনশ্চ', ভাবে ও ভঙ্গীতে দুয়েতেই আশ্চর্য জিনিস। মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসলে ঘটে নি, ঘটে না। Change of voice হয়, change of heart হয় না। পৃথিবী বদ্‌লায় বারে বারে; মনেও তার ছাপ পড়ে। তাতে মন ছাড়া পায়, প্রাণ জীইয়ে ওঠে। সেই মনপ্রাণের সৃষ্টিস্পর্শে পৃথিবীও আবার সচকিত হয়, নূতন করে বদ্‌লাতে চায়,—এই হল পরিবর্তনের ধারা। এর বেশি আমূল

পরিবর্তন বিপ্লবেও ঘটে না; এমন কি শিল্প-বিপ্লবেও ঘটেছে কিনা সন্দেহ। তা যদি ঘট্‌ত, তা' হ'লে আজ সেক্সপীয়র ইংরেজই বুঝতে পার্‌ত না। প্রাণ-মূল শুকায় না বলেই যা মৌলিক তা চিরজীবী। সেই মূল হচ্ছে জীবন—জীবন-যুদ্ধ আর জীবনের জয়। এ যুদ্ধ চিরন্তন—সে চিরনূতন এবং চিরপুরাতনও। আর যুদ্ধজয়, যুদ্ধের তাড়না আর জয়ের প্রেরণা, বিরোধ আর বিকাশ,—এই হল নিয়ম। মানুষের মন ও মানুষের জীবন পুরনো পাতা ঝেড়ে ফেলে, পুরনো শাখার মায়া কাটায়; কিন্তু এই অনন্তকালীন অশ্বত্থ এই মূল ছাড়তে পারে না। তার নতুন ফুল, নতুন পাতা, নতুন শাখা, সবই এই মূল তরুর। মূল তরুর আর তাই তরু মূলেরও—মাটির ও জলবায়ুরও। এই মানব-মহীরুহেরও রসই প্রাণ, তা' আর্ট। সে রস তার ভিতরে জন্মে—আসে মাটি থেকে, বাতাস থেকে, আকাশ থেকে—জীবন থেকে, জীবিকার দাবি থেকে, জীবিকার দায়ে—তাই তা চিরদিনের।

কিন্তু সাহিত্যে কি তবে নতুন কিছু নেই? পুরনো বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এ যুগের বাঙলা সাহিত্যের তফাৎ নেই? নেই, কে বলে? আছে নিশ্চয়ই; জীবিকার ধরণ বদ্‌লাচ্ছে যে, জীবনযাত্রাও বদ্‌লাচ্ছে যে। অবশ্য, আজ আবার তা বদ্‌লাতে পারছে না, চাপা পড়ে আছে। তাই নতুন হচ্ছে আজ প্রধানত আঙ্গিকের নতুনত্ব। টেক্‌নিক্‌ দিন থেকে দিন বদ্‌লায়—যেমন তা বদলায় কলকারখানায়। তাতে রস বদ্‌লায় না। সেক্সপীয়রের টেক্‌নিক আর ইস্কাইলুসের টেক্‌নিক এক নয়; তাতে কি ক্ষতি বলুন। আমি তো দুই-ই পড়ে আনন্দ পাই। আর দিন থেকে দিন আবার বদলায় আবেষ্টন, আবহাওয়া; আর বদলায় তাই মনের আইডিয়া, আউটলুক। ভিক্টোরীয় যুগ পঞ্চাশ বছরেই হয়ে উঠেছে হাসির জিনিস; জর্জীয় যুগ নিশ্চয়ই পঁচিশ বছরেই বিদ্রূপের জিনিস হবে। কিন্তু কোনো আইডিয়াও একেবারে নতুন হয় না, আউটলুক

একেবারে উদ্ভাবনা নয়। ইতিহাসের ক্রম-পরিণতি আবেষ্টনেও থাকে, থাকে মনের পাতায় লেখা। ইস্কাইলুস থেকে ইয়ুরিপেডিস কত বড়ো মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু একই পেরিক্লিসের আয়ুষ্কালে এথেন্সের জীবনে এই ট্রিলজি অভিনীত হল—ইস্কাইলুস, সোফোক্লিস আর ইউরিপেডিস্। আইডিয়া কত তাড়াতাড়ি বদ্‌লেছে। নিশ্চয়ই এরূপ ইতিহাস আপনাদের আরও জানা আছে—ইউনিভার্সিটি উইট্‌সদের থেকে 'রক্ত আর বজ্র ট্র্যাজিডি' পর্যন্ত দেখলেই হবে। কিংবা আমাদের সমকালের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

কিন্তু আউটলুকও বা কতখানি বদলায়? আমি তো আজকের আপনাদের সমস্ত নতুনতম সাহিত্যের মধ্যে সেই পুরনো য়ুনানী ভাব-সংকটেরই একালীয় রূপ দেখ্‌ছি। একালীয় রূপ, কারণ আবেষ্টন বদলায় দিন থেকে দিনে। তবু কোনো আইডিয়াই সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক নয়। তা কারো একান্ত বা একারও নয়—তা'হলে অন্যে তার মর্মই বুঝত না। তবু আবেষ্টন, টেক্‌নিক আর আউটলুক, এসব দিন থেকে দিন বদ্‌লায়। এসবের ওপর থাকে সমকালের জীবনযাত্রার ছাপ—জীবিকার মোটা হাতের দাগ, সমাজের রূপের ছায়া। এদের বেড়া যে যত খাড়া করে তোলে, অন্য কালের যুগের কাছে তাদের রাজ্যই হয় তত দুষ্প্রবেশ্য। এজন্যেই অনেক সংস্কৃত কবিতায় আমাদের প্রবেশ করতে কষ্ট হয়। জীবনের স্রোত থেকে তার লেখকরা সরে গেছেন—বক্রোক্তিতে তাঁদের কীর্তি। মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা, মেটাফিজিক্যাল স্কুলের অনেক ইংরেজি কবিতাও তাই ক্লান্তিকর। জীবন থেকে তারা সরে গেছে, ভাব তাদের জীবন-গঙ্গায় ফিরে যেতে চায় না, তা আদিগঙ্গায় আবদ্ধ। তাই দিন থেকে দিন বদলানো পুঁজি নিয়েই তারা বাড়াবাড়ি করে, ভঙ্গী নিয়ে কারি-কুরি করে, যুগ নিয়ে গর্ব করে; এমন কি ভুলে যায়, আসল বস্তু যা তা বদলায় কতটা বা কি ভাবে। আসল বস্তু, বলেছি, এই জীবনযাত্রা ও মনের দ্বৈতলীলা—মানুষের ও প্রকৃতির পরিচয়, জয়

ও পরাজয়। আধুনিকতার দাপটে ঢাকা পড়ে এই সত্য, এই চিরন্তনতা। আজ আর বিগত কাল, আর আজ আর আগামী কাল, এদের মধ্যে তফাৎ ঘটায় এই আঙ্গিক, আবেষ্টন আর আউটলুক। এ হল জীবনের একদিক—কারণ জীবন চলন্ত, কেবলি বদলাচ্ছে। আমাদের উপন্যাসে গল্পে এই ক্রমগতির ছাপই বেশি পড়ে। কাল আর আজ, আর আজ আর আগামীকাল,—এদের মধ্যে যোগও রাখবে প্রাণলীলা, জীবিকার দায়, আর রসচৈতন্য। কবিতায়, আর কাব্যধর্মী কল্পনায়, গল্পে, লেখায় ফোটে এরই বেশি আঁক। এই হল জীবনের আর একদিক। কারণ জীবনের ধারা বিচ্ছিন্ন নয়—তা বিবর্তন—তবে discontinuous continuity।

বলবেন, বাঙলা সাহিত্যে নতুন ঢঙ আস্‌ছে। তা মান্‌ছি। কিন্তু সে তো চিরদিনই আস্‌ছিল—যেদিন থেকে বাঙলা কবিতা জন্মেছে। যখন নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র মহাকাব্য লিখছেন, তখনো বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁদের দান, ভাব ও রূপের দিক থেকে কি তা নতুন ছিল না? তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর এক জীবনে কত নতুন সুর যে বাঙলা কাব্যে তিনি সৃষ্টি করলেন, আমরাই কি তার হিসাব করে উঠতে পারি? তারপর তো এসেছেন আপনারা। কি বল্‌ব আপনাদের? 'যুদ্ধান্ত যুগের' বল্‌ব?* কিন্তু যুদ্ধ ঘটেছিল ইউরোপে, আপনারা তার ধাক্কা প্রত্যক্ষভাবে পান নি। হয়ত তখনো বয়সে ছিলেন খুবই ছোট; তাই তার আর্থিক, মানসিক কোনো আঘাতই আপনাদের সইতে হয় নি। আপনাদের 'যুদ্ধান্ত যুগ' রূপ নিয়েছে পরবর্তীকালে, যখন আপনারা

---

* পঁচিশ বৎসর পরে অচিন্ত্যকুমারের লেখার গুণে আজকের পাঠকদের কাছে তার নামকরণ হয়েছে 'কল্লোল যুগ'। সম্ভবত নামটা হওয়া উচিত 'কল্লোল হুজুগ'। নইলে পুরাতন পরিচয়টাই যথেষ্ট—'অতি আধুনিক'।—লেখক
১।৩।৫৬ইং

ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে তা পেতে শুরু করলেন। প্রথম এল রুশ সাহিত্যের ঢেউ, তারপর স্কাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের। ইউরোপের অন্য কোনো সাহিত্য এ দু'দেশের মতো হালে (১৯১৮-২৪) আমাদের ওপর অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অবশ্য দানুনৎসিও জানা ছিল; হাউপ্টম্যান, জুদারম্যান, বার্ণার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দিও ছিলেন পরিচিত; মেটারলিংক, ফ্রাঁস আর সর্বশেষে রলাঁ আপনাদের খুব আপনার হয়ে উঠেছিলেন এক সময়ে। তবু রুশিয়া আর নরওয়ের লেখকরা হন বিশেষ প্রিয়। এই যুগটাতেই হঠাৎ আপনারা দু'একজন ক্ষেপে উঠলেন 'দরিদ্রের সাহিত্য' নিয়ে। বোধ হয় রুশ সাহিত্যের ও রুশ কম্যুনিজমের ওটা পরোক্ষ ফল। অথচ 'রিয়েলিজম'-এর নামে যৌনচিত্রও এসময়েই আপনাদের পেয়ে বসল। তা তারুণ্য। ওটা বয়ঃ-সন্ধিকালীন wish fulfilment. ব্যক্তিগতই বেশি, খানিকটা তবু সমাজগতও,—এ তো আজ বুঝতেই পারছেন। নইলেও কাল পারবেন —যখন সত্যিকার যৌবনে এসে উত্তীর্ণ হবেন। সেই 'অতি-আধুনিকদের' সাহিত্যে রিয়েলিজম প্রায়ই কিছু নেই, আছে কল্পনা-বিলাস। আরও পরে আপনারা আবিষ্কার করলেন ইউরোপীয় 'যুদ্ধান্ত' সাহিত্য—যার প্রধান ফুল হল অশ্রদ্ধা, cynicism. কিন্তু ওটার জন্ম হয়েছে ভার্দ্যুনে ও ভার্সেঈতে; তার পিছনে রয়েছে যুদ্ধের সত্য ও দুঃস্বপ্ন, ইউরোপীয় রাজনীতিকদের রচা কথা; আর আরও পিছনে ইউরোপের পথহারা ধনিক সভ্যতা, সাম্‌নেও আবার সেই পচ-ধরা ধনিক সভ্যতা। আপনাদের পিছনে তা নেই; সাম্‌নে আছে কি? অবশ্য পিছনে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছিল, বন্যা আর অনাবৃষ্টি বরাবরই আছে। কিন্তু তা আমাদের গা-সহা; আমার আপনার অনুভূতিতে তা নতুন কম্পন তোলে না। ইউরোপের যুদ্ধান্ত সাহিত্য তার নিজেরও আধুনিক; কিন্তু আমাদের এ সাহিত্য ধার-করা ভাবের, তাই 'অতি আধুনিক।' শুধু গোর্কি পড়ে কতটুকু নিজের এই চিত্তবৃত্তিকে আমাদের গা-সহা দুঃখ-বেদনা সম্বন্ধে চাগিয়ে তোলা যায়? তবু

চেষ্টা কম করি নি,—বিশেষ করে যুদ্ধান্তের বিলাতী অশ্রদ্ধার সুরটা আয়ত্ত করতে। তাই আপনাদের সিনিসিজমও হয়েছে উদ্ভট। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ভেতরে ভেতরে সেন্টিমেন্টালিজম ও রোমান্টিসিজমের ইন্দ্রধনু সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু হাওয়াটা পশ্চিমে যখন সিনিসিজমের খর-তাপের, তখন উপায় নেই, ইউরোপীয় আধুনিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও হতে হবে মাধুর্যহীন খর আতপতাপের উপাসক। কারো কারো তখনকার লেখা হচ্ছে এই আত্মগোপনের ইতিহাস। এখনো তাই তাঁরা নিজেদেরই খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রেমেন্দ্রের মতো কেউ কেউ অবশ্য নিজেকে কোনো সময়ে হারিয়ে ফেলেন নি। ইউরোপীয়ের ভাব তাঁদের দোলা দিয়েছে ; কিন্তু তাঁদের চারি দিক্‌কার আবেষ্টন তো পচ-ধরা ধনিক-সভ্যতার নয়। তা বরং চাপাপড়া জাতীয় চেতনার। হয়ত তা না বোঝাতেই তাঁদের শক্তি চাপা পড়ে রইল। আর অন্যেরা কেবলই দু'হাতে যাঁকে পান তাঁকেই আঁকড়ে ধরেন। আপনারা এখন পেয়েছেন প্রুস্ত ও জেম্‌স্ জয়েসের অদ্ভুত প্রতিভার সংবাদ ; অল্‌ডাস হাক্‌সলির চমকলাগানো বিদ্যা বুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের সাক্ষাৎকার। আর এ সময়েই—যখন ডি. এচ. লরেন্সের আত্ম-পীড়িত দেহ-আত্মা লাভ করেছে বিশ্রাম—পেলেন আপনারা তাঁরও সন্ধান। এখন তো আপনাদের আকাশে এই দুই নক্ষত্র উজ্জ্বল। বুদ্ধদেব বাংলায় অলডাস্‌কে ঢালতে সচেষ্ট এবং আশ্চর্য রকমের সার্থকও হয়েছেন—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সর্বোপরি লেখার স্বচ্ছতায়। এমন কি, অলডাস্ প্রথম জীবনে ছিলেন এসেয়িষ্ট ; পরেকার উপন্যাসেও সে ধাত তিনি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছেন না। . বুদ্ধদেব বরাবর লিখেছেন উপন্যাস, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের মধ্যে, লক্ষ্য করবেন, ফুটে উঠছে ক্রমশ তাঁর এসেয়িষ্ট রূপ। হাক্‌সলির ভূত তাঁর ঘাড়ে চেপেছে—তাঁর ভাবে, ভাষায়, কথার ভঙ্গীতে। অবশ্য হাক্‌সলির ভূত নাকি কথা বলে না সাজিয়ে কথা বলে। তবু ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেলে বুদ্ধদেব দেখা দেবেন, তৎপূর্বে তিনি যা পাচ্ছেন তা সবটা তাঁর নয়, ওই ভূতের

পাওনা। অবশ্য এ ছাড়া আরও নতুন নক্ষত্র দেখা দিচ্ছে,—টি. এস. এলিয়ট আজ আমাদের পরিচিত। আগেকার থেকে ইউরোপকে আমরা ঢের বেশি করে জানছি। সাহিত্যেও তার ছায়া পড়ছে—সাহিত্য তো আর আজব জিনিস নয়।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্য, সে তার সিনিসিজম্‌ই হোক্ আর যাই হোক্, তার জীবন থেকে উদ্ভূত—তার জীবন থেকে আর সেই জীবনানুভূতি থেকে। তার মানে অবশ্য শুধু জীবন থেকে আর জীবনানুভূতি থেকেও নয়—গণ্ডি-জীবন থেকেও, আর গণ্ডিবদ্ধ জীবনানুভূতি থেকেও জন্ম নিচ্ছে ইউরোপের সাহিত্য। কারণ ওদেরও জীবন সত্যই গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে গেছে—এগোতে পারছে না। সভ্যতা অনেক পুঁজি হাতে পেয়েছে—কত কল, কত কারখানা, কত শক্তি আর কত তার ঐশ্বর্য। কিন্তু সব খান-খান হয়ে যাচ্ছে। লোকে বেকার বসে আছে, আর বেকারের সমাজে বিকার দেখা দেবেই। তার সাহিত্যও তাই বিকারবহুল হবেই। মুনাফার ফাঁস ওদের গলায়। তাই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যারা এই মুনাফা সৃষ্টি করে তাদের দম ফেলবার সময় নেই। তারা দম নেয় ছায়াচিত্র থেকে, গৈবী খুনের কাহিনী থেকে, রোমাঞ্চকর উপন্যাস থেকে, যৌন-উত্তেজনার শিল্প থেকে। তাদের জীবনযাত্রা ধরাবাঁধা, কলে-পেষা। কলে তৈরী তাদের মনের খোরাকও—যেমন, ছায়াচিত্র আর তেমনি গল্প-উপন্যাস। যারা এ স্তরের ওপরে, মধ্যস্তরের, তাদের মনে জাগে এই নিম্নবর্তীদের জীবনের বিভীষিকা। তাই এই জীবনের বীভৎসতা থেকে তারা দূরে পালাতে চায়। যারা পারে একেবারে অলস ও অবকাশের জগতে বসে জাল বোনে। জীবনের সৃষ্টিশালায় আর মুখ দেখায় না। যা বিকোয়, এরাও অবশ্য তাই লিখতে বাধ্য। আসলে তারাও বেকার। মুনাফাদারের মুঠো থেকে গলে স্বর্ণকণা তাদের হাতে এসে পড়ে—তাই তারা স্বচ্ছল। কিন্তু তবু বেকার,—সমাজে ওদের কাজ নেই। তবে স্বচ্ছল, তাই তারা

বাঁচে। বাঁচে নিচেকার জীবনযাত্রা থেকে, জীবন-যুদ্ধ থেকে; বাঁচে নিজেদের দেয়াল-ঘেরা মধ্যস্তরে। জীবনের ছোঁয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে তারা বাঁচে। তাই তাদের কল্পনা গণ্ডি-জীবনের বাইরে আর যেতে চায় না, যেতে পারে না। আর ফলে তা হয়ে ওঠে শুধুই সূক্ষ্ম, শুধু সরু কাজ। আপনার নিয়মে আপনি তা চলে—আর্ট ফর আর্টস সেক্,—বাইরের জীবনের দায়িত্বকে তা মানে না। আর তার মানে গণ্ডির মধ্যেই তা থাকে; ক্রমেই মণ্ডলীগত একটা ব্যাপার হয়—এক্সপ্রেশনিজম্, সিম্বলিজম্, স্যুররিয়েলিজম্, অমনিতর যা খুশী। এমন কি, শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত—একার জিনিস—যেমন জয়েসের শেষদিককার লেখা, ষ্টাইনের ধ্বনিপ্রাণ কবিতা। তাতে আঙ্গিক বড় হয়ে ওঠে। যেমন কলকারখানায় আশ্চর্য আবিষ্কার দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় ধ্বনি গাঁথবার, কথা গাঁথবার আশ্চর্য কৌশল। অথচ যন্ত্রের উন্নতি সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না—সভ্যতার এখন এমনি দুর্দশা। সাহিত্যের কৌশলও তেমনি কৌশল থাকে, যথার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে না—এ যুগের সাহিত্যের এমনি দুর্ভাগ্য।

তবু ইউরোপের সাহিত্যের শিকড় মাটিতে, অথবা মাটিহীন মূলে। আমাদের সাহিত্যের কিন্তু জন্ম আকাশে। তা সুন্দর অর্কিড। আপনাদের নির্ভর করতে হয় আপনাদের মনের জমির উপর। অবশ্য সে জমি গড়া হয় ইউরোপের পুঁথি আর পাতা দিয়ে, তাদের উড়ো আশা আর ঝ'ড়ো নিরাশা দিয়ে। মধুসূদনের আমল থেকে তাই হয়ে আসছে। নইলে বাংলা সাহিত্য জন্মাতও না। আর এই রহস্যটুকু ধরতে পেরেছিলেন বলেই রাজা রামমোহনকে বলতে হয় যুগাবতার। তিনি বুঝেছিলেন—আমাদের জমি গড়তে হবে ইউরোপীয় জ্ঞান আর বিজ্ঞান দিয়ে। আর তেমনিভাবে জমি গড়া হলে যা হয় তা'ই মধুসূদন, তা'ই আমাদের বঙ্কিম, আর তারও পরেকার বাঙ্লা সাহিত্য। কিন্তু মুশকিল আমাদের অনেক। ইউরোপের জ্ঞান আর বিজ্ঞান তার

জীবনের ফল—তার সামাজিক ব্যবস্থার ফল, চিন্তারও ফল। সমাজে আর মনে চলেছে আদান-প্রদান, আর ওরই নাম সভ্যতা। ইউরোপে এযুগে সেই সভ্যতার বনিয়াদ তার শিল্প-বিপ্লব। সেই বিপ্লবেরই পরিণতি আবার আজ সে সমাজের অন্তর্বিরোধ। তা'ই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাতে আছে সেই সভ্যতার অন্তর্দাহ—তার সাহিত্যে, তার শিল্পে,—তার ছাই, তার ধোঁয়া, তার জ্বালা, আর তার দীপ্তিও। আমরা কিন্তু ইউরোপের জাহাজ-বোঝাই বই পেলাম, পেলাম না তার যন্ত্রশক্তি। তার যন্ত্র-বিপ্লব আর জীবনযাত্রা তাই আমরা এখনো পাইনি। কারণ আমরা তার 'বাজার',—তার কলের মালের খরিদদার আর তার কাঁচা মালের জোগানদার। বরং তার ধনিকতন্ত্র আমাদের চেপে জীবনের পুরনো কোঠায় বন্দী করে রাখল,—হ'ল আমাদের চলার পথে বাধা। আমাদের জীবিকায় ও জীবনে এভাবে আমরা রইলাম ধনিকতন্ত্রের বন্দী,—'উপনিবেশের' বদ্ধ ঘরে। ওদিকে মনের জীবনে আমরা পেলাম ইউরোপীয় ধনিকতন্ত্রী চিন্তার উপজীব্য। তা জীবিকা নয়, উপজীব্য ; ফসল নয়, বাইরের চালানী মাল। তাতেও আমাদের মন একেবারে আনন্দে শিউরে উঠল—ইউরোপের সেই আঘাতে আমাদের সমাজ তখন একেবারে ভিৎশুদ্ধ নড়ে উঠেছিল। ইউরোপের বণিক্‌রাজ আমাদের নতুন সমাজ গড়তে দেয় নি। দিলও না। কিন্তু পুরনো সমাজ ভেঙ্গে যেতে লাগল। আর আমরা আনন্দে আশায় শিউরে উঠলাম, ভাবলাম নতুন সমাজই গড়ে উঠছে, তারই সূচনা হয়েছে। তখন আমাদের কত আশা, কত স্বপ্ন মনে! আমরা জীবনে যেন এক মহাকাব্যের মহিমা দেখলাম—জীবনে দেখলাম এক রোমান্সের রূপ আর বিস্ময়!

আমরা নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠলাম। কিন্তু সে সৃষ্টির প্রেরণা জীবন থেকে পাওয়া নয়, পাওয়া মন থেকে। আর সে মন আমাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গেও এখন আর সন্ধি করে উঠতে পারছে না। কারণ দেখছি, সেই জীবনের উপরে চেপে বসে আছে উপনিবেশের

ব্যবস্থা, তার উপদ্রব। তাতেই আমাদের জীবনও মুক্ত হতে পারেনি, বন্দীর জীবন হয়েছে, গণ্ডির জীবন রয়েছে। আর এজন্যই ইউরোপের বর্তমান মুহূর্তের সাহিত্যও আমরা খানিকটা বুঝে উঠতে পারি—দুইই ধনিকতন্ত্রের দুই দিক্‌কার দুই গণ্ডিবদ্ধ রূপ। তবে ইউরোপ আছে প্রত্যক্ষের কোঠায়, আপনারা আছেন পরোক্ষের। ওদের অনুভূতিটা বাঁকাচোরা, কিন্তু সাঁচ্চা; আমাদের অনুভূতিই নকল। এ সাহিত্যও কাজেই derivative. ইউরোপীয় লেখকদের ভাব-ভঙ্গী-ভাষা আপনারা গ্রহণ করেছেন,—করছেন, করবেন—এইটাই আপনাদের বিশেষত্ব। তা হলে আপনাদের মধ্যে নূতনত্বই বা কোথায়?

তাই কবিদের বলব, সে গান গাও যে গান গাওয়া হয়েছে, যে কথা হয়েছে কথিত। কারণ সত্যিকারের যে কথা, তা সৃষ্টি—আর তা বাস্তব ক্ষেত্রেও নূতন সৃষ্টি দান করে। তাই গাওয়া হলেও তা শেষ হয় না, কওয়া হলেও তা ফুরিয়ে যায় না। বরং তখনি বুঝি আরও বেশি—এ গান অশেষ, এ কথা অসমাপ্ত; চিরকাল এ গান গাওয়া চলবে—চিরদিন।

অবশ্য এ হল কাব্য-সাহিত্যের কথা—তা বিশেষ করে অন্তরাবেগের কথা। তা চিরায়ু হলেও তা কিন্তু জীবনযাত্রার সঙ্গেও সম্পর্কিত। তার আসল মূলও হল জীবনক্ষেত্র, তার ফলও হল সেই জীবনক্ষেত্রকে পরিসর করা, পরিবর্তিত করা। বাস্তবে মোটেই তা উদ্দেশ্যহীন নয়—যেমন তা বাস্তবে কারণশূন্যও নয়।

আপনারা বলবেন—'পিওর আর্ট' উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু সত্যি 'পিওর আর্ট' কাকে বলে, তারও কি ঠিক আছে? ফ্রান্সে এই সেদিন আঁরি ব্রিমোঁ (উচ্চারণ 'পিওর' হল কিনা জানি না) নতুন করে 'পিওর পোয়েট্রি' বা 'বিশুদ্ধ কবিতা'র রূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে 'পোয়েট্রি' হচ্ছে 'প্রেয়ারেরই' নামান্তর। এই ক্যাথোলিক 'অ্যাবে'র মতে 'মরমীয়া' কবিতাই খাঁটি কবিতা। অবশ্য এদিকেও ক্যাথোলিক মরমীয়া কবিতাই সম্ভবত তিনি 'বিশুদ্ধ কবিতা' বলে গ্রাহ্য করবেন।

কিন্তু কবিতা কি শুধুই প্রার্থনা, বা স্তব বা ধ্যান বা (যেমন ক্রোচে বলবেন) ইন্‌টুইশ্যান—অতীন্দ্রিয়ানুভূতির একটা দ্যোতনা? 'পিওর পোয়েট্রি'র এই সংজ্ঞা কি আপনারাই মানবেন? না, অন্যেরাও সবাই মানে? ব্রিমোঁ নিজেও বলেছেন—ফ্রান্‌সে 'পিওর পোয়েট্রি'র সোরগোল বাধান পল্‌ ভ্যালেরি। আর পল্‌ ভ্যালেরির মতে 'পিওর পোয়েট্রি' হচ্ছে নিছক একটা ধ্বনির প্যাটার্ণ বোনা, যাতে মনে আনন্দবোধ হয়। বিষয়বস্তু, শব্দের অর্থ, কল্পনা, ওসব কিছু তাই কাব্যের দরকার নেই, চাই শুধু ধ্বনিময় শব্দের জাল বোনা। পল্‌ ভ্যালেরির মতবাদের পিছনে আছে ফরাসী কবি মালার্মের কবিতা ; আর সাম্‌নে—নানা স্যুররিয়েলিষ্ট্‌ লেখকের অদ্ভুত প্রয়াস। মালার্মের দৃষ্টান্ত নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কবিতার অর্থ শুধু এক রকমের vulgarised সংগীত মাত্র। আর স্যুররিয়েলিষ্ট্‌ বাড়াবাড়িতে কবিতা মানে নিছক ব্যক্তিচেতনার একটা প্রকাশ—তাতেও শব্দের অর্থকে দূরে রাখবার চেষ্টাই স্পষ্ট। দু'দিক থেকেই এভাবে বাক্যের অর্থ, বিষয়বস্তু প্রভৃতি এড়াবার চেষ্টা দেখা যায়। তার কারণও বোঝা যায়। বাক্য জিনিসটা দশজনে বোঝে, দশজনের সঙ্গে কাজ-কারবারে তা গড়ে উঠেছে। ওটা সামাজিক সৃষ্টি। এ যুগের লেখকরা সামাজিক সংবদ্ধ, অর্থাৎ জীবনক্ষেত্রের দায় ও তার দায়িত্ব, আর নিতে পারছেন না। তাই, শব্দ, বাক্য, এসবের সাধারণ-স্বীকৃত রূপ যেন তাঁদের পক্ষে বাধা হয়ে উঠছে। তাই তাঁরা নিজেদের মুক্তির পথ খোঁজেন নানাভাবে—খুব বেশি নিজেদের রূপকর্মের উপর ঝোঁক দিয়ে, টেক্‌নিক্‌কে বা কলা-কৌশলকে একেবারে চরম বলে মনে করে ; কিংবা নিজের মনকেই নিজের একমাত্র আশ্রয় করে—একেবারে আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে, অথবা একেবারে রহস্যবাদী অধ্যাত্মধর্মী হয়ে। প্রত্যেকেই ভাবেন—তাঁর পথটাই খাঁটি পথ, 'পিওর আর্টের' পথ।

আসলে এই রূপকর্মের উপর ঝোঁক দেওয়া বা আত্মপ্রকাশের নামে পলায়ন-বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া—এসব সেই পুরনো আর্ট ফর্‌

আর্টস্‌ সেক্‌ মতবাদের এদিক-ওদিক। আপনারাও 'পিওর আর্ট' বল্‌তে বোঝেন—আর্ট ফর্‌ আর্টস্‌ সেক্‌। চাইবেন—'পিওর আর্ট'; বলবেন—'আর্ট ফর্‌ আর্টস্‌ সেক্‌'। যেন আর্টিষ্টের পৃথিবী আর্টের ত্রিশূলের চূড়ায় স্থাপিত—ত্বনিয়ার ভূমিকম্পে তা টলবে না। এমন ভূয়ো কথা আর আছে? সে যে পাগলের পৃথিবী। পৃথিবীতে সব চেয়ে খাঁটি আত্মকেন্দ্রিক বা individualist হচ্ছেন উন্মাদ—কবি আর প্রেমিকের কল্পনা বা কথাও অত 'স্বতন্ত্র' নয়, তাও পরের পরওয়ানা রাখে। আপনার আমার পৃথিবী তো দশজনের পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা—আপনার আমার মন তাদের মনের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙছে, গড়ছে। আর আবার ভাঙছি গড়ছি সেই দশজনের পৃথিবীও একটু একটু করে আপনি আর আমি,—আপনার সৃষ্টি, আমার দৃষ্টি। কেউ আমরা 'পিওর' নই—নিজস্ব যা, তাও একার নয়, একান্ত নয়। যদি তা একান্ত হত তা হলেও এই তত্ত্ব তথ্যই থেকে যেত। তা পৃথিবীতে সত্য হয়ে উঠতে পারত না, কারণ অন্য কেউ তার মর্ম বুঝত না। আত্মতান্ত্রিকের বিশুদ্ধ আর্ট, বিশুদ্ধ রস তাই অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্‌শান্‌। আবার রূপকর্মবাদীর বা টেক্‌নিক্‌বাদীর বিশুদ্ধ আর্ট হল ধ্বনি দিয়ে স্নায়বিক উত্তেজনা জাগানো। ভাবের ও রসের মূল শেষটা তাই দাঁড়ায় এই—হয় তা কয়েকটা স্নায়ুর উত্তেজনা, নয় সত্তার স্বগতোক্তি। জীবন-সত্য ভুলে গেলে কাব্য এমনিভাবে হয়ে ওঠে দেহতত্ত্ব বা রসতত্ত্ব, বা এমনি বিরোধী নানা 'তত্ত্ব'। তখনি আর্টের সঙ্গে জীবনের যোগ অস্বীকার করবার নানা ওজর খুঁজতে হয়। বল্‌তে হয়—আর্ট কি সবাই বোঝে?—তার ফলে নানা ছোট গণ্ডির মধ্যেই আর্ট আপনাকে বন্দী করে।

আপনাদের যুক্তি—আর্ট সকলের জন্য নয়, মাত্র রসিকের জন্য। কিন্তু তার রসিক 'লাখে না মিলয়ে এক'; অবশ্য তার ফ্যাশান চল্‌তি হলে সমঝদার লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয়। কিন্তু তার পূর্বে তার আসর খুব সীমাবদ্ধ। আবার এরূপ আর্টের স্রষ্টার

সংখ্যা তাহলে আরো অল্প। তা 'কোটিকে গোটিক'। প্রিটেণ্ডারের সংখ্যা তাহলে বেশি হবেই। তাঁরাই প্রচণ্ড রকমের 'পিওরিষ্ট' হন। তাঁরাই সে আর্টকে করেন ফ্যাশান। ফ্যাশান খাঁটি না মেকি তা বলার দরকার নেই। একবার যা ফ্যাশান হল, তার ভবিষ্যৎ গেল ; তবে তার বর্তমান খুব ফাঁপানো ফোলানো জাঁকালো। যতক্ষণ 'পিওর আর্ট' পিওর ততক্ষণ তা প্রায় esoteric, মণ্ডলীগত। আত্ম-রতি আর আত্মছলনা। যখন ফ্যাশান তখন যৌথ-ছলনা, আর যৌথ-বিলাস। যখন পিওর আর্ট esoteric, তখন তা গণ্ডির সৃষ্টি, সৃষ্টি-শক্তিহীন ; আর যখন ফ্যাশান তখন machine production, প্রাণশক্তিহীন।

আমরা সাধারণ মানুষ। দশজনের সঙ্গে মিলেই বাঁচি—আর দশজনের সঙ্গে মিলে উপভোগ করতে পারলে আমরা খুশী হই। কাজেই আমরা 'পিওর আর্ট' বুঝি না। আমরা সাধারণ লোক—বই পড়ি। বাঙলাদেশে ক'জন লোক বই পড়তে জানে ?—শতকরা পাঁচ জন। পাঁচ কোটি বাঙালীর মধ্যে পাঁচ জনের বেশি ওরূপ বিশুদ্ধ আর্টের অধিকারী আছেন কি না জানি না। কিন্তু জানি, পাঁচ কোটি বাঙালীর মধ্যে পাঁচ শ' লোকও নেই, যাঁরা হতে পারেন এর সমঝদার।

তাই বলি, যা আমরা বুঝি তাই বরং আপনারা আমাদের এখন দান করুন। আর যা আমাদের দরকার, তাই এখন আপনারা জোগান। দরকার কিসের জানেন ? দরকার জমি গড়ার, দরকার আমাদের রুচি গঠনের। দরকার আমাদের মনকে মার্জিত করবার আর আমাদের বোধকে গভীর করবার। দরকার আমাদের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করবার আর দৃষ্টিকে ব্যাপক করবার। দরকার জীবনভূমিতে ফিরে যাবার আর সেই জীবনভূমিকেও গড়বার। অর্থাৎ দরকার জীবনে ও জীবনযাত্রায় বিপ্লবের। তাই দরকার আসলে জীবনকে এখন চিনবার ; আর তা হলেই সাহিত্যকে চিনতেও দেরী হবে না।

অবশ্য যদি আপনাদের জানাশোনার মধ্যে কেউ এমন থাকেন,

যাঁকে 'সৃষ্টি-প্রেরণা' ডাক দিয়েছে, তিনি কারও তাগিদের অপেক্ষায় নেই। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর প্রকাশ-পথ খুঁজছেন। জানবেন, তাঁর পক্ষে সে ডাক না শুনে উপায় নেই। কানে মোম পূরেও যদি নিজেকে তিনি কোনো কাজের জাহাজের মাস্তুলে বেঁধে রাখেন, তা হলেও তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। তাঁর কানে বাজবেই সেই আহ্বান, আর তাঁর কলমে ফুটবেই তাঁর মনের রূপ—সে পিওর আর্টই হোক আর সংকর আর্টই হোক। কিন্তু জানেনই তো সমস্ত বাংলা দেশেই এমন লোক আছেন জন পাঁচ ছয়। বাকী যে পাঁচ শ' জন লেখক কলম চালান, তাঁরা জন্মসূত্রে সে কলম পাননি। লেখা তাঁদের সখ, লেখা তাঁদের সামাজিক অ্যাম্বিশান, লেখা কারও পক্ষে সামাজিক দায়িত্ব থেকে আত্মগোপনের পথ, দেশকে বঞ্চনা ও বঞ্চনা নিজেকে। এঁরাই সবচেয়ে বেশি 'নিত্যকালীন দাবি' আওড়ান, 'স্বরাজ' কিম্বা 'সমাজ' আন্দোলনকে পরিহাস করেন। এ হচ্ছে তাঁদের আত্ম-বিদ্রূপ, এ হচ্ছে তাঁদের আত্মবিদ্রোহ, কিংবা জীবন থেকে ভয়-ভাবনায় পিছিয়ে-যাওয়া মনের rationalisation; আত্মপ্রসাদ নয়, মূলত আত্ম-ধিক্কার—জেনে আর না জেনে। অধিকাংশ লেখকই হচ্ছেন লেখার কারিগর। কিন্তু এঁরাই তবু আসর জমিয়ে রাখেন। আর তাই কলাবিদের আবির্ভাব না হলেও আসরটা টিকে থাকে। সেটা কত দরকারী, তা বলাই বাহুল্য। এ শ্রেণীর লোক চেষ্টা করলে কিছু-না-কিছু লিখতে পারেন—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চলনসই কিছু। একটু ভালো, কি একটু মন্দ। এসব তাঁরা দিতে পারেন আমাদের। দিতে পারেন সেই অর্কিড। কিন্তু তার চেয়ে ভালো কাজ হয় তাঁরাই যদি আমাদের জমি তৈরী করেন, রুচি গঠন করেন। কি করে করবেন? পুরনো-নতুন হাজার খানেক দেশী বিলেতী বই তর্জমা করে। স্পষ্ট কথা বলচি, বাঙলায় ভালো বই অনুবাদ করে। শুনে এসব লেখকরা রাগ করবেন কি? কেন? সমস্ত বাংলা সাহিত্যই দেখেছেন বিলেতের সাহিত্যের 'ভাবানুবাদ'। আমাদের

জন্ম-লেখকের দলও জেনে-শুনে বাংলায় ইউরোপীয় চিন্তাই ঢেলে সাজছেন। তা' করতেও হবে যতদিন আমরা ইউরোপের সমান হয়ে না উঠি। তখন দুনিয়ার মানসিক ইতিহাসে এত বড় ভেদ থাকবে না। আর তখন আমাদের জন্মাধিকারী লেখকও হয়ত ইউরোপীয় চিন্তাজগতের ভাবগুরু হয়ে পড়বেন। কিন্তু যতদিন আমরা এগুতে না পারছি ততদিন তা সম্ভব নয়। তাই আমাদের মানসিক স্তরটা দরকার তাড়াতাড়ি উন্নীত করা। দরকার রুচি গঠন আর বোধশক্তির উজ্জীবন। দরকার জমি তৈরী করা। তারই একটা অর্থ—বিষয় ঠিক করে নিয়ে বিলেতী হোম ইউনিভার্সিটি সিরিজ বা এভ্রিম্যান্ (এখন পেলিকান্) এর মতো বাঙলায় হাজার খানেক বই তৈরী করা—নানা বিষয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক সংবাদ বাঙলায় পরিবেশন করা। বিশেষজ্ঞরা লিখলে ভালো হ'ত, কিন্তু তাঁরা বাঙলায় লেখেন না। অতএব, সাধারণ লেখকরাই বিলেতী বিশেষজ্ঞদের বইগুলি ঢেলে সাজান। তার সঙ্গে সঙ্গে রাখুন শ' দুই পুরনো বইয়ের অনুবাদ। পশ্চিমী ক্লাসিক্স ও দেশীয় ক্লাসিক্স বাঙলায় অনুবাদ করুন—স্যাগা আর এদ্দা, গ্রীক নাট্য আর মহাকাব্য, মূল আরব্য উপন্যাস আর শাহনামা (দোহাই আবার তা যেন সচিত্র করা না হয়), আর তামিল, শৈব আলোয়াড়দের গান, গুজরাটী ও মারাঠী প্রাচীনদের গাথা, আর হিন্দী পৃথ্বীরাজ রসো, রাজপুত বীরত্বগাথা, আলহার গান ইত্যাদি। এ সবের প্রসাদে আমরা পাব ঠিক পরিপ্রেক্ষিত—জীবনের ও জাতির, সমাজের আর যুগের। আর ততক্ষণ পড়ুন ইংরেজিতে কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য, ইচ্ছা হয় করুন তারও অনুবাদ।

তা'হলে দরকার জমি তৈরী করা—শুধু লেখা নয়, মাঠে নামা। সত্যি জমি তৈরী করা—অনেককাল যে জমি পতিত পড়ে রইল, যাতে আবাদ করলে ফলত সোনা। অনেককাল রয়েছে পতিত—কবে থেকে? জানি না, হয়ত আকবরের পর থেকে, হয়ত আরো আগে থেকে; কিন্তু পতিত রয়েছে অনেককাল, তাতে সন্দেহ নেই।

সেই জমি আবার তৈরী করতে হবে—অনেক আগাছা সাফ করতে হবে, অনেক জঙ্গল কাট্‌তে হবে, উপড়ে ফেলতে হবে মূল শুদ্ধ অনেক গাছ-গাছড়া, খুঁড়ে তুল্‌তে হবে মাটির তল থেকে জল, নদী কেটে আনতে হবে নহর। জমি তৈরী করতে হবে। এটাই আজ আমাদের কাজ, আর তারই নাম বিপ্লব—খুলে দেওয়া বন্ধ ঘরের দুয়ার, মুক্ত করা চাপা-পড়া জীবন-ধারা, এগিয়ে দেওয়া ইতিহাসের বিকাশ-শক্তি। একাজ শুধু কলমের জোরে হবে না—হবে কোদালির কোপে, তারপরে কাস্তের ঘায়ে, হাতুড়ীর জোরে। সেটাই আসল অস্ত্র,—আজ সৃষ্টির আসল উপকরণ। আর তাই নামতে হবে মাঠে —আগাছার বনে।

কিন্তু কোদালিই কি সব? তা নয়। দেখছি, কলমের কাজও আছে। এই জমি তৈরীর দায়েই আবার দরকার মনের জমিও সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করা। তা তৈরী করতে পারি আমরা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে আর হৃদয়ের বোধ-শক্তিকে উজ্জীবিত করে। বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করতে চাই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইস্পাত, আর বোধশক্তিকে উজ্জীবিত করতে চাই কাব্য, আর জোর প্রাণরস। বুদ্ধিকে নির্মল করতে চাই সাদা কথা, খাঁটি গদ্য। তার কাজ বুঝানো আর পড়ানো: মনকে মতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলা, আর মনের গতিকে করা সুনিশ্চিত। অন্যদিকে কাব্য আর কল্পনা দোলা দেয় হৃদয়বৃত্তিকে, তার যুক্তি হল logic of emotion—আর তা'ই logic of creation, তাই তা সৃষ্টি। সৃষ্টি বলেই তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। প্রাণকে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় পাগল করে দেয়। আর এই ভাবে বুদ্ধি আর অন্তরাবেগ আর চঞ্চল পৃথিবীর জীবন-ধারা—সবে মিলে জীবনের উত্তাপে রচনা করে নূতন সৃষ্টি, দেখা দেয় নূতন সমাজ ব্যবস্থা,—আর তাই বিপ্লব।

তার জমিই তৈরী করতে হবে কোদালি দিয়ে আর কলম দিয়ে, হাতে-কলমে এবং হাতে আর কলমে।

বক্‌সা, ১৯৩৩।

মুদ্রাদোষ

অসহ্য গরম। অসম্ভব লেখা। আমি লেখকও নই—আমি লিখতে পারি না, লিখতে চাইও না। তবু আমাকে লিখতে হবে। তবু লিখতে হবে—কারণ, আপনাদের হাতে-লেখা জেলের কাগজ বেরুবে।

আপনাদের কাগজের অবশ্য কোনো কাগুজে লক্ষণ নেই—তবু কাগজের দাবি তার আছে—"লেখো, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই—লেখো। তুমি লেখক না হলেও লিখতে হবে, লেখক হলেও লিখতে হবে। তোমার শরীর ভেঙে পড়লেও লিখতে হবে, তোমার মন টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও লিখতে হবে।" অথচ কোনো কাগুজে লক্ষণ আপনাদের নেই—না আছে মুদ্রা, না আছে মুদ্রাযন্ত্র। কাগজের ওসব না হলে চলে? কাগজ জিনিসটাই মুদ্রাযুগের জিনিস; আর মুদ্রাদোষ ওর সমস্ত দেহে—দেহে মনে, চেতনায়। মুদ্রাযন্ত্র আসলে মুদ্রার হাতের যন্ত্র, ধনিকতন্ত্রের উপকরণ।

আপনারা মনে করেন—কাগজ ফোর্থ এষ্টেট্, রাজসভা। তাও সত্য, তবে বণিক্ই সেই রাজা। কাগজ এ যুগের রাজসভা। রাজসভা এ যুগের—যখন সভ্যতা রাজসভা ছেড়ে রাজপথে এসেছে, যখন রাজা-বাদশার দরবারে আর তা আবদ্ধ নেই, এমন কি উজীর ওম্‌রাহের মজলিস্ও আর নেই, জমিদার-জায়গীরদারের পর্যন্ত দিন ফুরিয়েছে। 'মুদ্রা-রাজ্যে'র সেই পরোয়ানা নিয়েই মুদ্রাযন্ত্র জন্মে। মুদ্রাযন্ত্র দেখা দিলে বুঝতে হবে সভ্যতা একেবারে বাজারে এসে উপস্থিত হচ্ছে, তা কারো জমিদারী নয়—তা সওদার জিনিস, সওদাগররা তার কাণ্ডারী। সেই সওদার জন্যই চাই তাদের পর্চা—চাই সংবাদপত্র—বণিক্ রাজার বিজ্ঞাপনী। আর বিজ্ঞাপনই হল সংবাদপত্রের রক্ত। এই হল ফোর্থ এষ্টেট—সওদাগরের যুগের প্রধান

বাহন। অর্থাৎ, ফোর্থ এষ্টেটও অন্য এষ্টেটের মতোই। যে যখন কর্তা সে তখন সেই দেশও শাসন করে। মুদ্রাযন্ত্র উঠল মুদ্রার যুগের রাজত্ব ঘোষণা করতে। আজ টাকা যার আছে সেই প্রেসের রাজা। টাকা যার আছে প্রেস তার কথাই কয়। তার কথাই অন্যান্য এষ্টেটও বলে, বলে আইন সভার সাধারণরা, আইন সভার অভিজাতরা, আর বলে এই সওদাগরী সভ্যতার হাতে-গড়া জিনিস—সংবাদপত্র। মুদ্রাজীবী যুগের অস্ত্র মুদ্রাযন্ত্র,—তারই জোরে যুদ্ধ জয় হয়, তারই চেষ্টায় যুদ্ধ বাধে। আর মুদ্রাযন্ত্রের এই চাবিকাঠি মুদ্রার—মানে, সওদাগরের। সওদাগরের দরকারে যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ চলে, তারই কথা মত পার্লিয়ামেন্ট কথা বলে, চলে প্রেস, চলে প্ল্যাটফর্ম। এ যুগের রথী সে—আমরা তার সারথী, তার কথা মতো রথ হাঁকাই—লেখা জোগাই, এমন কি খবরও জোগাই তার দরকার মত।

সত্য বটে, আজও আমাদের দেশে আমরা কাগজকে অতটা ব্যবসা করে তুলিনি। আমাদের খবরের কাগজ একটা স্বপ্ন মনে নিয়ে জন্মেছিল—দেশকে জাগাব। আমরাও তাই এখনো ভাবি—ওটা ব্যবসা নয়, ওটা আমাদের স্বদেশীর অস্ত্রাগার। এ ছাড়া আমাদের কি আর অস্ত্রাগার আছে? কথা আর লেখা ছাড়া, কণ্ঠ আর কালি ছাড়া কি আছে অস্ত্র? এজন্যই আমাদের সংবাদপত্র 'স্বদেশী'র শস্ত্রাগার।

সত্যই তাই। তবে স্বদেশীর অর্থ টা আমরা ঠিক বুঝি নি। দেখবেন—স্বদেশী মানে দেশী ব্যবসা। যতই 'স্বদেশী' জমবে ততই তা ব্যবসা হয়ে উঠবে। 'স্বদেশী'র যুগ এল—দেশী ব্যবসা বাণিজ্য জন্মাতে লাগল। 'স্বদেশী' চাই, কাপড়ের মিল গড়ে উঠল, দেশী মিলওয়ালা দেখা দিল, দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল—বোম্বাই জন্ম নিল, জন্ম নিল গান্ধীজীর আহমদাবাদ। আরও স্বদেশী জমবে, দেখবেন আমাদের কাগজের কাটতি আরও বাড়বে—বিজ্ঞাপন পাব; আবার আমাদের নর্থক্লিফ বিভারব্রুক দেখা দেবেন, আমাদের

হাপ্টে দেখা দেবেন, আবার আমাদের মিৎসুই-মিৎসুবিশির হাতে আমাদের কাগজও কথা কইবে। এই হল নিয়ম—'স্বদেশী' মানেই ব্যবসা। আমাদের স্বদেশী কাগজও ক্রমশই হবে বড় কারবার, ক্রমশই হবে ব্যবসা; হবে আমাদের সওদাগরের যুগের যোগ্য বাহন—মানে খাঁটি ফোর্থ এষ্টেট। আজ সেই 'স্বদেশী' আমাদের জন্মাতে পারছে না বলেই না এই 'ফোর্থ এষ্টেট' এখানকার বিদেশীদের হাতে এতটা লাঞ্ছনা সইছে। সইতেই হবে। কারণ, বিলেতী সওদাগর আমাদের সওদাগরদের বাজার ছেড়ে দেবে না—মানে, সাম্রাজ্যবাদ আমাদের 'স্বদেশী' সইতে পারে না, স্বরাজ সইতে পারে না। তাই স্বরাজ স্বদেশীদের সাধন, আমাদের সাধন। দেশী সওদাগরী-যুগের যুদ্ধ আমরা যুঝছি, আর এজন্যই দেশী সংবাদপত্রের জন্ম। তা যেমন বাড়বে—তেমনি ব্যবসা হয়ে উঠবে। উঠছেও—এখনি তা ব্যবসা হয়ে উঠছে। আমরা হতভাগ্যরা ভাবি ওটা স্বদেশীর অস্ত্রাগার। জানি না, এ অস্ত্রাগারেরও পিছনে আছে তার কর্তা সওদাগর। জানি না, আর তাই মনে করি সংবাদ-সেবা বুঝি একটা বড় 'স্বদেশ-সেবা'। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যাবে, দেখবেন। মানে, আমরা সারথীরাও বুঝছি—বেতনের কত দরকার। আর রথীরাও জানেন—আমাদের "স্বদেশীয়ানা"ও বাজারে কেনা যায়। বুঝছি—পৃথিবীর বাজারে সংবাদের ব্যবসায়ে আমরা জোগানদার আর ওঁরা মালদার। যতই দিন যাবে ততই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অথচ আমরা ভাবব বুঝি আমরা বড় একটা কিছু করছি—দেশের লোককে চালিত করছি, দেশের মনকে শাণিত করছি, দেশকে গড়ছি, জাতকে গড়ছি, গড়ছি ভাষা, সাহিত্য। আমরা তা ভাবব—কারণ, আমাদের হাতে আমরা কোদালি ধরি না, ধরি কলম, আর তাই মনে মনে কল্পনা করি—'আমরা লেখক'। আর তার পরে—'আমরা মাস্তিকের মগজ', 'এ যুগের মেধা'। আর তাই—'আমরা হাত-পায়ের সঙ্গে চলিনে, তার উপরে থাকি,

চালাই'। 'আমরা মজুর নই, মগজ; অতএব, আমরা হাঁত-পায়ের সংগে চলি না'। মানে, চলিই না। আর মালিকও তাই মজুরীর বিনিময়ে আমাদের মত 'মগজ' কেনেন—আর ছাড়ান। এবং না কিনেও বেকার মগজীদের পান, তাঁর কাগজ চলে। বিজ্ঞাপন আছে, কাগজ চলে; বিজ্ঞাপন-লোভী আছে—কাগজ চলে; ছাপার হরফে নাম বেরুবে, ভারী নামের অধ্যাপক সেই লোভে লিখবেন; নামের মুদ্রা-মান আছে, নাম-করা লেখকও তাই কাগজে লিখবেন; বেকারে লিখবে, বিকারে লিখবে; প্রচারের সুযোগ আছে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও তাই লিখবেন;—লিখবেন—আর কাগজ চলবে। কাগজ চলবে—আর আমরা back-number এর মত আবর্জনায় চলে যাব,—এই আমাদের নিয়তি।

এই আমাদের নিয়তি। মুদ্রাদোষ আজ সভ্যতার গায়ে—পৃথিবীই মুদ্রাঙ্কিতা। অন্তত মুদ্রাযন্ত্র তার কথাই কয় যে মুদ্রার মালিক। আর সংবাদের সওদায়ও মালিকের মর্জিই বড় কথা। সংবাদ কেন, পৃথিবীতেই আজ মালিকের মর্জি মূল কথা। 'পৃথিবী টাকার বশ'। সত্যি, টাকা মূল কথা—মুদ্রা চাই, মুনাফা চাই; তাই মালিককেও আবার খুঁজতে হয় মুনাফার পথ। আপনি কাগজ চালাবেন—দেখবেন লোকে যেন তা কেনে, যেন বিজ্ঞাপন পান। অবশ্য, ও দুশ্চিন্তা রুশিয়ার কাগজের নেই, তার কারণ সে দেশ সওদাগরের দেশ নয়—কাগজেও বিজ্ঞাপন তাই নেই, মুনাফার রাজত্বও নেই। আপনাদের জগতেরই মত আর কি? তফাৎ শুধু—ওদের যন্ত্র আছে আর আপনাদের যন্ত্র নেই, আছে যন্ত্রণা। —যাক্। কাগজ চালালে, কাগজের মালিক বিজ্ঞাপন পাবেন যদি বিজ্ঞাপন-দাতা জানে লোকে সে কাগজ কিনছে এবং বিজ্ঞাপন-দাতার মুনাফা ও স্বার্থ সে কাগজে নষ্ট হচ্ছে না। এ দুয়ের মধ্যেও একটা সীমা আছে। বিলাতী বণিক্ও আমাদের দেশী কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—আর দেশী বণিক্ও বিলাতী কাগজের কৃপার

ভিখারী হয়। অর্থাৎ মুনাফাটা প্রধানত ব্যক্তিগত, দলগত বা জাতিগত নয়। কাগজের মালিকের তাই দেখতে হয় তার কাগজের কাটতি হবে কিসে, লোকে কি চায়,—আর লোকে না চাইলেও কি করে লোককে আকৃষ্ট করা যায়। লোকের কৌতূহল জাগাতে হবে—এক নিমেষের জন্য হলেও জাগাতে হবে।

এই কৌতূহল জাগাবার পক্ষে বড় জিনিস হল নতুন কথা। মানে, সংবাদ; তা'ই news. কৌতূহল জাগে পুরনো কথায়ও—যদি নতুন দৃষ্টিতে তা দেখা যায়, আর কৌতূহল জাগে তা নতুন করে পেলে। মূলত, news হবে new। যা নতুন তা মানুষ মুখ তুলে দেখে। নতুন চাই—এই হল নিউজ্-তত্ত্ব। "কুকুরে আপনাকে কামড়ালে তা সংবাদ হয় না, আপনি কুকুরকে কামড়ালে তা হবে সংবাদ"—এই হ'ল সাংবাদিকের কথা। যা স্বাভাবিক তা কি সংবাদ নয়? যা ব্যতিক্রম তা'ই নতুন, তা'ই সংবাদ? আর দেখুন, এই সংবাদপত্র থেকেই এ কালের ইতিহাস আমরা লিখবো বলি। তা হ'লে লিখবো না কি প্রধানত দিনের ব্যতিক্রমের ইতিহাস? কাগজে দেখবেন, কল্‌কাতা শহরে ১৯৩৫ সালে পথে বেরুলেই রাহাজানি হ'ত, মানুষ মোটরে চাপা পড়ত, স্ত্রী অপহৃতা হ'ত, ইত্যাদি। এই ১৯৩৫এর কল্‌কাতা, সংবাদপত্রের কল্‌কাতা। এ সব মিথ্যা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এই কি সত্য? সত্য। সংবাদপত্র সমসাময়িক ইতিহাস—মানে, যে ইতিহাস সত্যকে গোপন করতে গিয়ে বলে ফেলে, যে ব্যতিক্রমে নিয়মের কথাই আরও ঘোষণা করে। আপনি কুকুরকে কামড়ালে সেই কথাটাই ঘোষণা করতেন, যে,—১৯৩৫ সনে মানুষ কুকুরকে কামড়াতো না। তাই আপনার কথাটা হয়েছে উল্লেখযোগ্য—যেহেতু তা একেবারে নতুন।

'নতুন চাই,' 'নতুন চাই,'—এ যুগের এই নির্দয় তাড়া দেখি সংবাদপত্রে। কোনো দিকে তার চোখ নেই—লক্ষ্য শুধু জীবনযাত্রা আর তার বাস্তব প্রকাশ, তার ঘটনা আর ঘটনা, তার গতিময়তা।

জীবনের এই সাক্ষীই সংবাদপত্র আর সাংবাদিকরা,—জীবন-রসের অধিকারী আমরা নই। তাই আমাদের লেখক না হলেও চলে। কিন্তু তবু জীবনের এই সাক্ষ্য জড় করতে গিয়ে দেখি—তারও রূপ আছে, তারও রং আছে, আর জীবন-রসের রসকণায় তাও নিষিক্ত। জীবনের কোনো বস্তুই রূপহীন নয়, বর্ণহীন নয়, রসহীন নয়। আর এই রূপ রস রেখায় মিলিয়ে বস্তু বা ঘটনাকে দেখলে, জীবনের সেই ছেঁড়া-ছেঁড়া টুক্‌রো জিনিস আর নিষ্প্রাণ থাকে না। তখন ঘটনার গায়ে যেন একটু নতুন চিক্কণতা দেখা দেয়; তাতে ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের আরও কৌতূহল জাগে, সে তা জানতে উৎসুক হ'য়ে ওঠে। এই কৌতূহল জাগাতে না পারলে, সংবাদপত্রের চলে না—ঘটনা 'সংবাদ' হয় না। তাই ডাক পড়ে লেখকদের—'জীবনের এই বর্ণ রেখা দিয়ে সাজাও জীবনযাত্রার কথাকে'। লেখকেরাও এগিয়ে আসেন। নতুন মহাদেশের বিস্ময়ে তাঁরাও স্বাধীনতার স্বাদ পান—আর তাঁদের শুধু নির্ভর কর্‌তে হবে না রাজারাজড়ার মর্জির উপর। তাঁরা এবার লোক-সমাজের নজরানা পেলেন—সংবাদপত্র দিল তাঁদের টাকা আর বড় প্রকাণ্ড আসর, গুণীর মজ্‌লিস্ আর মানুষের মেলা। তখন সংবাদপত্রের অক্ষর-গোণা সীমায় লেখকরা আসর-মাফিক রস জোগান—দেখা দেন চেষ্টারটন, দেখা দেন বেলক্, নেভিনসন। অক্ষর গুণে তাঁরা লেখা সাজান—আর অক্ষরের ওজনেই তার দামও হয়। এমনি করেই লেখারও নূতন আসর জুটেছে—এ্যাডিসন গোল্‌ডস্মিথ্ ল্যাম্ব থেকে কিপ্‌লিং ও ফ্রাঁস, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ সে আসরে বস্‌তে দ্বিধা করেন নি। আর সংবাদপত্রেরও সেই পাঁচমিশেলি আসরে আবার নতুন নতুন আয়োজন দেখা দিয়েছে। রস নূতন ভাবে পরিবেশনের সুযোগ হয়েছে—দেখা দিয়েছে এ যুগের ছোট গল্প, এ যুগের ছোট কবিতা, এ যুগের নিবন্ধ, এ যুগের প্রবন্ধ—আলোচনা আর সমালোচনা। অর্থাৎ লেখকদের না হ'লে সংবাদপত্রেরও আর চলে না। আর তা'ই

অ-লেখকদেরও শিখতে হ'য়েছে মানুষের মর্জি, মানুষের রুচি ; শিখতে হ'য়েছে ঘটনার তত্ত্ব, চিনতে হ'য়েছে ঘটনা কী ? কারণ, তা'ই আসল কথা। আমাদের লেখার দাম হ'ল রস দিয়ে নয়, ঘটনা দিয়ে। খবরের দামেই সাংবাদিকের লেখার দাম। তাই শিখে নিতে হ'য়েছে তার সঙ্গে-সঙ্গে লেখার সংকেত, কথা সাজাবার, শব্দ গাঁথবার আর ভাবকে ঢেলে সাজবার কৌশল—যেন ঘটনা মূর্ত হয়ে ওঠে। আর তাই সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আজ কাগজ পেতে পাশাপাশি বসে গেছেন—তাঁদের তফাৎ চোখ এড়িয়ে যায়।

আমরা অ-লেখকরাও কথার কৌশল একটা আবিষ্কার ক'রেছি—আর তাতে গড়ে উঠেছে নতুন একটা শৈলী—জর্ণালিজম্। অ-লেখকদেরও এভাবে লেখক বানিয়েছে সংবাদপত্র। অ-লেখকদেরও কাজ হ'য়েছে লেখা। লেখা তাদের লিখতে হয়—কারণ, জীবনযাত্রার দাবি তা'ই। লিখতে হয়, কারণ এই সভ্যতা তাদের চায়—তাদের না হ'লে চলে না। এ কালের তারাই বিশেষ সৃষ্টি। এমনি এ কালের আরও সৃষ্টি আছে—চলচ্চিত্র আছে, বেতার আছে, আছে বিমান। আরও হয়ত কত আসবে, হয়ত ভাবী কালের কথা তাদের মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সংবাদপত্রকেই এ কালের খাঁটি মাল বলা চলে। এই জীবন্ত, এই চলন্ত কাল—এমন ক'রে তার কথা কে আর কোথায় বলতে পারত ?—চলচ্চিত্র পারেনি, বেতার এখনো পারছে না, আকাশে শব্দ বোনা এখনো সার্থক হয়নি। এখনো কাগজেই তার দাগ লেখা হচ্ছে—ঘণ্টায় বিশ হাজার কাগজ ছাপিয়ে, লক্ষ-লক্ষ কাগজের পাতা উড়িয়ে, কোটি কোটি অক্ষরের মালা বুনে। কী জীবন্ত আর কী চলন্ত এ কাল! এক মুহূর্ত স্থির নেই—তিষ্ঠোবার উপায় নেই—অসংখ্য কাজ, অসংখ্য অকাজ, আয়োজন আর আবর্জনা—আর সকলের উপর কী তার গতি!

আর এ গতির ঝড়ে আমরা অ-লেখকরাও হয়েছি কত বড় সত্যের

সারথী। প্রতি মুহূর্তে আমরা সংবাদ খুঁজছি; সংবাদ সাজাচ্ছি। কত কাজ, কত অকাজ। প্রতিদিন আমরা জীবনের ঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি—ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে যাচ্ছি, আবার ভাসছি। এক নিমেষ দাঁড়াই না, নিঃশ্বাস নিতে পারি না। এই লবণসমুদ্রের মধ্যে আমাদের একি অশেষ আলোড়ন! প্রতি নিমেষে ঘটনার ঢেউ ভেঙে পড়ছে মাথার উপর, প্রতি নিমেষে নতুন ঘটনার তরঙ্গ-চূড়ায় ভেসে উঠতে হচ্ছে, প্রতি নিমেষে নতুন গর্জনে ঢেউ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আবার টেনে নেয়—আমরা ঢেউ কাটি, ঢেউ সই। প্রতি নিমেষে এই সংগ্রাম,—চোখের পলক ফেলবার অবকাশ নেই, একবার তিষ্ঠোবার সময় নেই। প্রতি প্রভাতে এই নতুন অভিযান, নতুন সংগ্রাম, নতুন জয়! দাঁড়ালেই পরাজয়—সমুদ্রের আবর্জনার মত শুধু পড়ে থাকব বালুর শয্যায়! একি অদ্ভুত আমাদের জীবন—কোন্ সিসিফাস্-এর মতো এই অশ্রান্ত পরিশ্রম। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, রাত নেই দিন নেই, একি নিয়তি—দেখো, দেখো, দেখো; আর লেখো, লেখো, লেখো। একি নিয়তি—একি নিষ্ঠুর নিয়তি। আড়াল নেই, অবকাশ নেই—লেখক নও তুমি, তবু লেখো—লেখো লেখো, —একি ভয়ংকর অভিশাপ—লেখো, লেখো, লেখো। জীবনযাত্রা প্রচণ্ড প্রবাহে ছুটেছে—কিছু থেমে নেই, কিছু থামতে পারে না— তুমিও থামতে পার না, থামাতে পারবে না কলম! 'লেখো, লেখো, লেখো—' প্রতি নিমেষে জীবনের এই ডাক আসছে। প্রতি নিমেষে আসছে তার কানে যুদ্ধের আহ্বান, তা মানতেই হবে। এই হল সাংবাদিক—সৈনিক সে; হয়ত শুধু পদাতিক, কিন্তু জীবনের যুদ্ধ থেকে সে পলাতক নয়।

এ যুগের এই অভিযানে এই আমাদের বড় পরিচয়। আমরা লিখি আর লিখি। আমরা জীবনের সাক্ষ্য সঞ্চিত করি, আমরা জীবনযাত্রার স্বাক্ষরকে তুলে ধরি। তাতে করে আমাদেরও হাতে লেখা একটা নতুন দান পেল। আমরা অ-লেখকরা তাকে দিলাম

স্পষ্টতা। সে সহজ হল। ভাষা সহজ হল। ভাবুন—এ কত বড় দান! এমন সাধনা আর কি আছে—এই সহজ হওয়ার সাধনার মত! আমরা তাকে দিলাম—একটা চলন-সই রূপ, দিলাম কাজ চালাবার মত একটা পরিচ্ছদ, আর দিলাম যা সব চেয়ে বড় শক্তি—স্বচ্ছন্দ গতি। এই অ-লেখকরা অর্থাৎ আমরা ভাষাকে স্বচ্ছ করলাম, স্বচ্ছন্দ করলাম,—এই আমাদের সব চেয়ে বড় গর্ব, সব চেয়ে বড় সাধনা। আর এ সাধনা যে কি আপনি বাঙলা ভাষার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। এখনো তা স্বচ্ছন্দ হতে পারে নি—লেখকের দৌরাত্ম্যে তা পোষাকী হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাতে চমক লাগে, তার চমৎকারিত্ব বেড়েছে—কিন্তু সহজ সে হতে পারছে না, 'কাজের ভাষা' হতে পারছে না। প্রাঞ্জল, স্বচ্ছন্দ, অনায়াস—আর সর্বোপরি গতিশীল—কোথায় সে বাঙলা গদ্য? হয়ত অ-লেখকের হাতে হাতেই তা তৈরী হয়ে উঠবে মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রণাগারে। আমরা জানি ঐ আমাদের লেখার গুণ—তা বাজারের জিনিস, তা কেনাবেচার কাজে সাহায্য করবে, সাহায্য করবে দুনিয়ার দোকানদারীতে, সাহায্য করবে দুনিয়াদারীতে—আর তারই মধ্য দিয়ে শেষে লেখক যিনি তিনি তৈরী করবেন—the other harmony of prose. আমরা তারই পথ করছি।

সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমাদের কাজ হল বলা। সহজ করে, সুস্পষ্ট করে বলা—হৃদয়-গ্রাহী করেও বলা। কিন্তু বিষয়-বস্তুর দামেই আমাদের দাম, কথাটাই আমাদের আসল লক্ষ্য—সুর নয়, ছন্দ নয়, কল্পনা আর সংগীতে মেশানো রস-সৃষ্টি নয়। সে কাজ লেখকের, যাঁরা রস-রচনা করবেন—রসবোধকে তাঁরা জীইয়ে তুলবেন ; সে কাজ কবিতার, সংগীতের, সে কাজ চিত্রের, রসশিল্পের। আমরা অ-লেখকরা গদ্য রচনা করি, বলি তথ্য ; তথ্য বলি আর তত্ত্ব শোনাই। কাজের কথাই গদ্যের কাজ, অন্তরের কথা হল কাব্যের কাজ। গদ্য দিয়ে কাজ কারবার চলে, অথবা দশ জনের সঙ্গে বোঝাপড়া করি, মানুষকে

করি সজ্ঞান—আর সচেতন। কাব্য দিয়ে লেখকরা মানুষের অন্তরে অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন, মানুষকে করেন প্রাণবান আর সৃষ্টিশীল। তাঁদের রস-রচনা আর আমাদের কাজের রচনায় গোড়ার তফাৎ এই। সংগীত আর কল্পনা বড় হলে কথা আড়ালে পড়ে যায়, বাস্তব তার নিজের স্বাক্ষর হারিয়ে ফেলে। অবশ্য তাতেও তার মর্মবাণী বেজে উঠতে পারে। মনে করুন 'বলাকা'। এ যুগের গতিবেগ এমন-ভাবে আর কোথায় মূর্ত হয়েছে? কিন্তু মনে করুন আবার কবিরই 'যোগাযোগ'। শুধুই যেন বাঁশী বেজে গেল, মীরার ভজন ছেয়ে দিলে মনের আকাশ। কিন্তু মানুষ কই? মানুষ দেখা গেল এক ঝলক—শ্যামার মধ্যে। জীবন একবার চমক দিয়েছিল, জীবন-যাত্রা থমকে রইল বরাবর। সংগীত আর কল্পনায় মিলে তার ওপরে একটা অনুভূতির আড়াল রচনা করলে—দু'এর মধ্যে পড়ে কুমুদিনী আর মানুষ হয়ে ফুটল না, 'চরিত্রবতী' হয়ে উঠল না, সংগীতময়ী হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এমনি ভাবে কবির ধর্ম ঔপন্যাসিকের কথা-কর্মকে ঢেকে দেয়। এজন্যই কবিও আজ এ যুগের কথা বলতে পারেন না, যুগের মর্মকথা প্রকাশ করতে পারেন না। এযুগের সে কথা বলতে পারেন বরং ঔপন্যাসিক। নাট্যকারও তা বলতে পারেন না—নাটকও একটা সংঘাতের মুহূর্তকে গ্রহণ করে বটে, আর তারও প্রাণ ঘটনা—action. আর এ যুগ ঘটনায় মুখর, সংঘাতে সংক্ষুব্ধ। তবু নাটক এ যুগকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না—একটা বিশেষ সংকট-নিমেষেই নাটকের চরিত্র ফুটে ওঠে। নিমেষটিই তার সব—যখন জীবনের পথ-রোধ হয়েছে, আর মানুষ ঘটনার সংগে সংঘাতে নেমেছে, ন্যায়-অন্যায় ধর্মবোধ তার আর টিকছে না, এমনি এক ট্র্যাজিক নিমেষ। কিংবা বিক্ষোভ শেষ হয়েছে, এসেছে ছোট বড় দ্বন্দ্বের, অসামঞ্জস্য ভরা কৌতুকের দিন—তেমনি একটি 'কমিক' নিমেষ। নাটকের আসল জিনিস এটি—এই নিমেষ—situation. কিন্তু এমন প্রবহমাণ কাল, জীবনযাত্রার এমন দুর্জয় গতি, ঘটনার

এমনি অজস্রতা, চরিত্রের এমন জটিলতা—নাটক ভালো প্রকাশ করতে পারে না। তা পারে উপন্যাস। জীবনযাত্রার জীবন্ত লেখা ফোটে অনেকটা উপন্যাসে—যদি উপন্যাস সত্যিই সার্থক সৃষ্টি হয়। তাই উপন্যাস এতটা আজ জীবন্ত, সব চেয়ে জীবন্ত সাহিত্য, একমাত্র সাহিত্য যা প্রায় সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবন্ত, তাই এযুগের তা সব চেয়ে সার্থক রস-পরিচয়। যেমন সংবাদপত্র এযুগের সাধারণ পরিচয়—কারণ, জীবন্ত।

আমরা সাংবাদিক, তবু জানি সাহিত্যিকের যুগ শেষ হয়নি। The poetry of earth is never dead—কবিতা তা বারে বারে বলছে—এই মুদ্রার যুগেও বলছে—'আমি আছি, আছি আছি,—এ সত্য কথা। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদনায় আমি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম—আজও সে বেদনা মিথ্যা হয়নি, মানুষের অন্তরের সত্যই তার প্রাণধর্ম'।

সত্যই, মিথ্যা হয়নি। আজও মানুষের প্রাণধর্ম সর্বজয়ী—তার শিরার মধ্যে, বুকের তলে, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে হাজার সূক্ষ্ম গ্রন্থি তার জৈবীরস তেমনি ঢেলে দিচ্ছে। এখনো মানুষ পাগল হয়ে ফেরে কস্তুরী মৃগের মতই। ফেরে কামনায়, ক্ষুধায়, পিপাসায়, ফেরে জরা-মৃত্যু-তাড়নায়-ত্রাসে, ফেরে জন্ম-জীবন-প্রয়াস-উল্লাসে, ফেরে জন্ম হতে মৃত্যুর দিকে—অসংখ্য মৃত্যুর পৃথিবী-জোড়া হাঁ-এর মধ্যে। জৈবীরস বুকের তলায় জমে থাকে। আর তাইতো তার অনুভূতি শুধু দেহের সীমায় শেষ হয় না, জৈবী স্পর্শে সম্পূর্ণ হয় না, শুধু জীবধর্ম পালনে তার তৃপ্তি নেই। রসের পিপাসাও তাই তার মেটে না—কত ভাবে, কত ভাষায়, কত কল্পনায় তা মেটাতে হয়। রূপ রেখা শব্দ স্পর্শ রস গন্ধ—কত সূক্ষ্মভাবে সেই রসের বোধন চলছে।

সাহিত্যিক প্রাণধর্মের স্বাক্ষর ভুল করেন না। তাঁর ধর্ম—প্রাণধর্মকে স্থির রূপে জেনে স্থির রূপ দেওয়া, শব্দের ও সংগীতের মধ্যে মূর্ত করা—স্থির করে রাখা, রূপবদ্ধ করে নেওয়া।

কিন্তু প্রাণ স্থির নেই, বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। জন্ম ও জীবন নিত্য নতুন হয়ে উঠছে, এও সত্য, প্রাণেরই তা এক ধর্ম—'প্রাণলীলা'। কবি প্রাণধর্ম বুঝে তাকে যখন রূপ দিচ্ছেন, প্রাণলীলা ততক্ষণে নূতন নূতন রূপে ফুটছে,—অসংখ্য বৈচিত্র্যে, অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে, অসংখ্য বৈভবে। জীবনের এই দিক যেন লেখক দেখে দেখে আর শেষ করতে পারেন না! এ যেন আকাশের মত বিরাট—শেষ নেই, সীমা নেই, শত সূর্যের মেলা, তাদের জন্ম-মরণের নাট্যশালা—সৃষ্টি যেন সেখানে স্থিতিতে রূপ নেয় না—ফুটছে আর ঝরছে, ফুটতে না ফুটতেই ঝরছে, আর ঝরতে না ঝরতেই নতুন হয়ে হয়ে ফুটছে। জীবনের এই চির-চঞ্চলতার রূপ লিখে শেষ করা যায় না—লিখতে না লিখতে তা নতুন হয়, লিখতে না লিখতে তা বদলে যায়। লেখা তার সঙ্গে আর পেরে উঠছে না—কত আয়োজন কত আবর্জনা, কত ঐশ্বর্য আর কত বাহুল্য, কত অর্থ আর অর্থহীনতা। ডাক তাই পড়ল অ-লেখকদের—তোমরা একে দেখো, তোমরাও লেখো। তাদের কাজ দেখা—আর এই অস্থিরকে অস্থির বলেই চেনা। তা'ই সাংবাদিকের কাজ। প্রাণলীলার সাক্ষী সে। সে স্থির রূপ দেবার জন্য লেখে না। সে লেখে শুধু জীবনের অস্থিরতার কথা, ঘটনা যা ঘটে; লেখে, যা ছিল আর তা নেই। সাহিত্যিক বল্‌বেন—যা ছিল তা আছে, কিছু হারায় নি। আর সাংবাদিক প্রমাণ কুড়িয়ে রাখে—যা ছিল তা নেই; সব নতুন হচ্ছে—হচ্ছে আর হচ্ছে; 'আছে' নয়; এমন কি, 'ছিল'ও নয়, 'হচ্ছে'। শুধুই 'হচ্ছে'; জীবন আর জগৎ শুধু 'ভূ'ধাতুর রূপ। তাই তো জীবন যখন গতি-মুখর হয়ে উঠছে তখন সাংবাদিকের উদ্ভব হয়েছে। সে তার লেখার মধ্য দিয়ে প্রাণলীলার সন্ধান এনে দিচ্ছে—কিছু তার রাখবার নেই, কিছু তার ঢাকবার নয়। আজকের খবর কাল বাসি হয়—আজকের লেখা কাল ভোরে ঝরে যায়। এ এক দিনের ফোটা ফুল, এক দিন তার আয়ু। না, এক দিনও নয়। সকালের লেখা বিকালে

আর মনের পাপড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না; সকালের কথা বিকালে যে ম্লান হয়ে গেছে—তাজা নেই, নতুন নেই, আয়ু তার ফুরিয়ে গেছে। সাংবাদিকের লেখা ফুটতে না ফুটতেই শেষ হয়। সে একবেলার ফোটা ফুল; বড় জোর কখনও এক মাসের জন্য তার শোভা মাসিক-পত্রের তোড়ায়; তখন এক মাসের মত তার আয়ু।

এই হল সাংবাদিকের লেখা, তার কাজ। আর এই হল এ যুগের আসল চিত্র—চলেছে, সব চলেছে, মহাস্রোতের টানে সব চলেছে। দাঁড়াবার স্থান নেই, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই—অফুরন্ত আয়োজন, অফুরন্ত প্রয়োজন—আর অফুরন্ত তার প্রয়াস আর প্রলাপ—সব কিছু নিয়ে এই যুগ। সব কিছু নিয়ে,—তার খাঁটি নিয়ে, তার মেকি নিয়ে, তার কাজ নিয়ে, অকাজ নিয়ে, তার উচ্চতা নিয়ে, তার তুচ্ছতা নিয়ে, তার অর্থ নিয়ে, তার অবান্তরতা নিয়ে—এ যুগ। এ যুগের এইতো সত্য—আর সেই সত্যের সাক্ষী—সাংবাদিকরা। সাহিত্যিকরা প্রাণধর্মকে প্রকাশ করেন, তার প্রমাণ জড়ো করেন—প্রকাশ করেন প্রাণধর্ম; আর আমরা প্রাণলীলার সাক্ষী। ওঁরা দেখেন অন্তর দিয়ে, আমরা দেখি চোখ দিয়ে; ওঁরা লেখেন রঙ গুলে, রেখায়; আমরা লিখি কালি গুলে, আঁচড় কেটে।

আর, ওঁরা সত্য পান না, আমরাও হয়ত বাস্তবকে পাই না—মানে, সম্পূর্ণ করে পাই না। কারণ বাস্তবকে যে সম্পূর্ণ করে পেয়েছে সে তো সত্যকেই লাভ করেছে, তার সাক্ষাৎকার করেছে—তাকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। সে দেখেছে এই হাসি-অশ্রুকে এক করে, সম্পূর্ণ করে। সে দেখেছে শাসক-আর-শাসিতকে জুড়ে—সমাজের আবর্তনের মধ্যে। সে দেখেছে ভাঙা-গড়ার ছন্দকে মিলিয়ে—সৃষ্টির সংগীতে। সে দেখেছে মিলন-বিরোধ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, সকলের সংঘাত, সমাবেশ, সঙ্গতি-সমন্বয়। দেখেছে মহাসাগরের রূপ, শুনেছে মহাকাশের বাণী, আর বুঝেছে সৃষ্টিময় সত্যের চির প্রকাশ। বাস্তবকে যে এমনি সম্পূর্ণ করে দেখেছে সে সত্যকে পেয়েছে।

আমরা সাংবাদিক তা দেখি না। এ সত্য কবিরাও বড় পান না—পান ঔপন্যাসিক। কবিরাও সহজে কিন্তু সত্যকে পান না। তাঁরা সত্যকে খোঁজেন সত্তার সমুদ্র-তলে, তাঁরা সত্যকে খোঁজেন আত্মার হিমাদ্রি-চূড়ায়। দেখেন শুধু নিজেকে—দেখেন বিচ্ছিন্ন করে; আর তাই দেখেন তার অসম্পূর্ণতা। তাঁরা সত্যকে খোঁজেন হয়ত আবার ক্ষ্যাপার মত—খোঁজেন 'পরশ পাথর'—কখনো ধর্মের, কখনো instinctএর, এমনি। সোনা হয়ে উঠছে যে জীবনের শিকল তা তাঁদের চোখেও পড়ে না। তাঁরা সত্য খোঁজেন, পরশ পাথর খোঁজেন, —আর পান না। পান না,—আর তাই শিকলের সোনাকেই আগলে ধরেন—খেলা করেন সেই সোনার শিকল বাজিয়ে, তার কড়ার সংগে কড়া বাজিয়ে, ছন্দের টুং টাং তুলে। খেলা করেন শব্দ নিয়ে, খেলা করেন রঙ নিয়ে, খেলা করেন আপনার শিকল-বাঁধা হাতের সেই শিকল-ধরা জীবন নিয়ে।—সহজ সত্য আজ লেখক পান না। পেলে তাঁর সংগীতে সৃষ্টির আগুন লাগত, নতুন পৃথিবী গড়ে উঠত, মুক্তির ঝড় বইত, বিকাশের বান ডাকত—আর তাঁর বাণী হয়ে উঠত আগুনের মত, খড়্গের মত, সমুদ্রের মত, আকাশের মত। এ যুগের লেখা সেই উদার উদাত্ত বাণী পায় নি, তার অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নি, তার অগণিত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারে নি। এক একবার এ যুগের কথাশিল্প এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে যায়। এগিয়ে আসে—সে জীবনযাত্রার মর্ম বুঝে নেয়, বাস্তবের খণ্ড কুড়িয়ে সে শেষ পায় না—তার চলচ্চিত্র সে দেখে আর অনুভব করে। এক-একবার দেখে অশেষ প্রবাহ, আর দেখে যেন তার বিশ্বরূপ—মানুষের এই 'বিশ্বরূপ'! দেখে—আর দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার অনেক হস্ত অনেক পদ, অনেক বক্ত্র নয়ন,—এই রূপকে আর সে কি বলে শেষ করতে পারে? পারে না, পারে না। তবু কথা আর চরিত্র ফুটিয়ে তার চিত্র রাখতে চান লেখক। জীবনের চলচ্চিত্র ধরতে চান গল্পে, উপন্যাসে, চরিত্রে, ঘটনায়। সেখানেই তাই পড়ে

এ যুগের একটু ছায়া। জীবন আজ কত জটিল, কত সংকটময়, কত কঠিন—আর কত বিচিত্র। তার আঘাতে আঘাতে প্রত্যেক মানুষের আজ চেতনা বিচিত্র আর বিশিষ্ট, আর অমনি জটিল। প্রত্যেকে তার বিচিত্রতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠছে।—কেউ আর ধরাবাঁধা নেই। যত জীবন অগ্রসর হচ্ছে, তত প্রত্যেক মানুষের সামনে জীবনযাত্রার নতুন নতুন দিক উন্মুক্ত হচ্ছে।—'গুণ-কর্মে'র চার বিভাগ শুধু নেই, লক্ষ লক্ষ তার বিকাশের পথ—জীবনযাত্রার বিচিত্র আয়োজন। অফুরন্ত আয়োজন—তার দাবিও তেমনি। তাই মানুষের যার যা গুণ ছিল তা ফুটে উঠেছে, জীবনের আয়োজনে স্ফূর্তি লাভ করছে। বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র গুণের তাতে বিকাশ হচ্ছে, আর তাই মানুষও বিচিত্র হয়ে উঠছে, জটিল হচ্ছে, হচ্ছে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী, হচ্ছে বিশিষ্ট মানুষ। বিভিন্ন ভাবে জীবন তাকে নাড়া দিচ্ছে; আর যত বিভিন্ন হচ্ছে মানুষের এই নিজ নিজ আবেষ্টন ততই তার চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠছে। সে আর টাইপ-চরিত্র থাকছে না, 'বর্গ-চরিত্র' হচ্ছে না—শুধু বীর, শুধু ধার্মিক, শুধু সতী বা অসতী। অমনি টাইপ ছিল সে গাথায়, মহাকাব্যে। সেই মূল আধার ফেটে চৌচির হয়েছে—অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে সে বিশিষ্ট হচ্ছে, হচ্ছে 'মানুষ'—পাপে ভরা, পুণ্যে ভরা, ন্যায়ে ভরা, অন্যায়ে ভরা, স্বপ্নে মুগ্ধ, বাস্তবে লুব্ধ, ক্ষুধাতুর, ব্যথাতুর, ইন্দ্রিয়াতুর,—আবার সৃষ্টিধর্মী!—মোটের উপর মানুষ; পশু নয়, দেবতা নয়,—মানুষ,—জটিল, আপনার কাছে আপনিই প্রশ্ন। এই ঘটনার জালের মধ্যে তার এই বিচিত্র বিকাশ লেখক দেখছেন, আর তাই লিখছেন।

আবার, তা লিখতে পারছেনও না। দেখছেন, মুদ্রার মোহর-আঁটা আজ পৃথিবীর দুয়ারে। দুয়ার খুলছে না। সত্য বটে, অনেক দুয়ার খুলে গেছে মানুষের জীবন-যাত্রার। তাতেই মানুষের মনেরও অনেক দুয়ার খুলে গেছে—ব্যক্তিরূপ অশেষ হয়েছে, মানুষ বিশিষ্ট

হয়েছে—তা দেখেই মানুষের বিস্ময়ের আর সীমা নেই। কিন্তু আজ আর নতুন দুয়ার খুলছে না। ব্যক্তিরূপ আর নতুন বিকাশের পথ পাচ্ছে না, মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। আজকের পৃথিবীতে মুদ্রার দাবি বড়। তাই সংগীত-কলার থেকে বড় সিনেমার দাবি, গল্পের থেকে বড় সিনারিওর প্রয়োজন। মুদ্রার দাবি বড়—তাই লেখার চেয়ে দালালি প্রশস্ততর পথ, গল্প লেখা থেকে বেশি দাম চায়ের বিজ্ঞাপন লেখার, কবিতা লেখা থেকে টেক্‌সট্ বই লেখার। আবার, যার যা বৈশিষ্ট্য থাক, সবাই ভিড় করছে এক পথে—যেখানে টাকা আছে। হয়ত গোলামের দেশে তা চাক্‌রি, আই-সি-এস্; আর বণিক রাজার দেশে তা সিটি আর বিজ্‌নেস্—বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ছে—টাকার তোড়ায়। মানুষ লাইনে সারবন্দী হচ্ছে, তার চরিত্র তাই ধরাবাঁধা হয়ে পড়ছে। সভ্যতার এই *Magic Mountain*এ যেন সবাই বক্‌সার বন্দী—এই পাহাড়ের চূড়ায় জীবন থেকে বিচ্যুত, জীবনযাত্রার প্রেতাত্মা। এই রুদ্ধ বায়ুর দেশে মুনাফার দায়ে সওদাগর চায়—স্তরে ভাগ করা মানুষ; চায় মানুষ নয়—মজুর, মানুষ নয়—কেরাণী, মানুষ নয়—কারিগর, মানুষ নয়—সেনানী, চায় regimented মানুষ, চায় decanted মানুষ। যে বৈশিষ্ট্য নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ফুটে ওঠে তা বর্জন না করলে আর এ ব্যবসা থাকে না—জীবনযাত্রার বনিয়াদ থাকে না—মুদ্রার প্রাসাদ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। সওদাগরী ডিক্টেটার আজ মুদ্রার মুকুট মাথায় নিয়ে দাঁড়াল, তাই fascismএর বেশে—এ হল ফোর্ড অব্দের 'Brave New World'. সভ্যতার মুদ্রাদোষ আর চাপা থাকছে না।

এই মুদ্রার রাজত্বে মুদ্রাযন্ত্রের দাবি মেটাতে আমাকেও লিখতে হবে—শরীর থাক্ কি যাক্, লিখতে হবে; ভালো লেখা হোক্ বাজে লেখা হোক্, লিখতে হবে; গ্রীষ্ম হোক্, বর্ষা হোক্, লিখতে হবে। আমার টাকা চাই, মুদ্রা চাই; উপায় নেই লিখতে হবে; কারণ এ

মুদ্রাযুগ। টাকার আমার প্রয়োজন—পৃথিবীর সবারই প্রয়োজন। আমার বাঁচা দরকার—আমার নিজের আর আপনার জনদের বাঁচা দরকার—তা টাকা না হলে হয় না। আর বাঁচার চেয়ে বড় আর কি আছে? এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে আনন্দকর, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের? এমন সত্য, এমন পবিত্র, এমন সুন্দর—কি আছে? আমার বাঁচা দরকার—আমার টাকা দরকার। 'আমি ভাবি তাই আমি আছি,' এই যেমন ডেকার্টিয়ান্ সূত্র, তেমনি 'আমার বাঁচা চাই, আমার টাকা চাই,' এই এ মুদ্রাযুগের মন্ত্র। আর যদি লেখা আমায় টাকার পথ দেখায়, মুদ্রাযন্ত্র আমায় মুদ্রার মুখ দেখায়—তা হলে স্বাগতং লেখা, স্বাগতং সাংবাদিকতা, স্বাগতং ছেলে-পড়ানোর মত, স্বাগতং দিনমজুরীর মত।

আমি লিখব—যদি আমি টাকা পাই, যাক্ আমার রক্ত জল হয়ে, গরমে আমার দেহ গলে, মন জ্বলে, আর শীতে দেহ কুঁক্ড়ে, মন মুষড়ে; আর রাত্রির নিদ্রা আর দিনের আরাম যাক্ জীবন থেকে চুকে। আমি লিখব যদি আমি টাকা পাই।

আর—আর—যদি আমি টাকা পাই—বাঁচবার মতো টাকা পাই—আমি লিখবোও না!

বক্সা,
১৯৩৩

সোনার কাঠি—রূপার কাঠি

ক্রমাগত কয়েকদিন চেষ্টা ক'রে লেখাটা আমি ছেড়ে দিলাম। আর হয় না, ওটাকে আর আমি কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছি না। অনেকবার কাটাকুটি করলাম, অনেক পাতা ছিঁড়লাম, ফেলে দিলাম দূর ক'রে। বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। উত্তরের উঁচু পাহাড়ের চূড়া তিব্বতের মেঘে লুপ্ত হয়ে গেছে; সে দিকটায় তাকিয়ে রইলাম। কি দেখলাম, কি দেখব, কি দেখতে চাই—কিছুই মনে পড়ল না, কিছুই মনে ঢুকছে না—সেই ছেঁড়া পাতা ক'টা, সেই কাটা লাইনগুলি, আঁকাবাঁকা সেই অক্ষরের সার আমার মাথায় তখনও ভিড় ক'রে আছে; তাদের মৃদু কোলাহল তখনও শুনতে পাচ্ছি। চোখে এই হিমালয়ের নিষ্প্রভ নির্দেশ ঠেকলেও মগজে তা পৌঁছতে পারছে না। যে স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে বাইরের বস্তু আমার মস্তিষ্কে প্রতিভাসিত হবে, সে স্নায়ুতন্ত্রী হয়তো তেমনই দৃশ্য প্রবাহ মনের দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে; তা গ্রহণও করছে মস্তিষ্কের বীক্ষণ-প্রকোষ্ঠের উত্তেজিত কোষগুলি—হাঁ, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করছে। আমার দৃষ্টিশক্তি ওই উত্তরের পথে দূরযাত্রী। কিন্তু আমার চিৎশক্তি সে খোঁজ রাখে না। বীক্ষণ-প্রকোষ্ঠের কোষগুলির উপরে এখনও রয়েছে সর্পিলগতি লেখার দাগ, মাটির উপরে যেমন প'ড়ে থাকে সরীসৃপের গতিরেখা। মেঘ নয়, ওই পাহাড়ের চূড়া নয়,—চোখের আরসিতে বৃথা তাদের ছায়াপাত; স্নায়ু বৃথা তাদের দৌত্য বহন করছে। আমার চোখের সামনে এখনও জাগছে সেই আমার হস্তাক্ষর—আমারই হাতের লেখা, শ্রান্ত হাতের লেখা—আমার অশান্ত মস্তিষ্কের অশান্ত মননক্রিয়ার স্বাক্ষর। আমি তা ফেলে দিয়ে এসেছি; না ফেলে দিয়ে উপায় ছিল না। আমি বার বার চেষ্টা করলাম আমার চিন্তাকে রূপ দিতে, বারে বারে তা আমার শাসন অগ্রাহ্য করলে।

এক একবার আমার লেখা অগ্রসর হয়—আপনার গতিতে আপনি চলে, আমার কলম তার পথ তৈরি ক'রে যায়। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, আমার কল্পনাকে তা ঠকিয়েছে, আমার চিন্তা তার আবরণে আবছায়া হয়ে উঠেছে, সে চিন্তা আর দেখা যায় না, লেখার সীমান্তে তাকে আর আবিষ্কার করা যায় না। থমকে দাঁড়াতে হয়।

ভাবের উষালোকে প্রথম যে মূর্তি আমার মানস-সীমান্তে পদার্পণ করেছিল,—তখনও তার মূর্তি রহস্যময়, তখনও তার রূপ আমি প্রত্যক্ষ করি নি, কিন্তু তার পাদস্পর্শে জেগেছে মনে শিহরণ—কৈশোরের প্রথম প্রণয়ের মত কাঁচা, ভীরু গোপন সেই মুহূর্তটি যখন আমি প্রথম অনুভব করলাম এই নতুন আবির্ভাব—প্রণয়েরই মত সে আমাকে টেনে নিলে। আমি কলম নিয়ে বসলাম।—জানি তার স্বরূপ এখনই আমার সম্মুখে প্রকাশিত হবে, এখনই খুলে পড়বে তার অবগুণ্ঠন, এখনই খুলে পড়বে তার শৃঙ্খল, তার বসন। রেখার টানে টানে, অক্ষরের আলোকে এখনই সে মূর্তি আমার সম্মুখে ফুটে দাঁড়াবে—মুক্তা অনাবৃতা। আমার চোখের সম্মুখে, আর পৃথিবীর চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে তার রূপ ; চিরদিনের মত স্থির, রূপে রেখায় সুনির্ধারিত ; স্পষ্ট, উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ ; আপনার প্রকাশ-মহিমায় এক বিস্ময়, এক রহস্য। অথচ তার সে রহস্য কারও চোখে ঠেকবে না। সে প্রতিদিনকার পরিচিত ব'লে মনে হবে। একেবারে বরাবরের চেনা, যাকে জন্ম থেকে দেখছি, যাকে প্রতি নিমেষে দেখি, উঠতে বসতে শুতে ঘুমুতে। কেউ সন্দেহ করবে না, এ নতুন ; আমার মনের আকাশে এর আবির্ভাব হবার পূর্বে এ ছিল সকলের অজ্ঞাত,—আমারও অজ্ঞাত। কেউ ভাববে না, আমি তাকে এনেছি আমার অস্পষ্ট ভাবলোকের প্রদোষান্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে ; তার জন্ম আমার মস্তিষ্কের ধূমায়মান গহ্বরে ; আমি তাকে উৎসারিত করেছি আমার কল্পনায় আর কালিতে মিশিয়ে কাগজের আঁকে

আঁকে। দুনিয়ার অনাবৃত আলোকের সম্মুখে তাকে আমিই করলাম প্রতিষ্ঠিত যে আকাশের নীলিমায় ছিল মিলিয়ে, বাতাসের প্রবাহে ছিল গা এলিয়ে, জ্যোৎস্নায় নেমে আসতে চাইত আমাদের সম্মুখে; যে কেঁদে বেড়িয়েছে নিখিল পৃথিবীর অনন্ত আকাশের মধ্যে। অপ্রকাশের বেদনায় যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল; আমার তোমার প্রত্যেকের কাছে যে চেয়েছে প্রাণস্পর্শ, চেয়েছে আপনাকে প্রকাশিত দেখতে, আপনাকে প্রকাশিত করতে। অতি-পরিচিতা সে সকলের—তাই তো তাকে দেখে কেউ চমকাবে না। তবু তার মূর্তি এই হবে প্রথম রেখায় সুস্থির। আর এই সহজ প্রকাশের অপূর্ব বিস্ময় বুঝবে সে, যে কোন দিন পেয়েছে নিজের চেতনায় এমনই পাদস্পর্শ, সে বুঝবে অব্যক্তের রূপায়ণ-রহস্য। আমি তার সে স্পর্শ অনুভব করেছিলাম; নিয়ে বসলাম কালি আর কলম। জানি সে ফুটে উঠবে।

কলম ব'য়ে চলল শান্তগতি, সংশয়হীন। ঋজু, স্থির আমার হাতের লেখা। একটু একটু ক'রে সে আপনার শক্তি সংহত ক'রে নিচ্ছে; সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে আমার মন আপনার আহৃত শব্দ-সম্পদকে—যেমন ক'রে বাষ্প পুঁজি করে নেয় ইঞ্জিন। তার প্রথম যাত্রা ধীর, অনুত্তেজিত; শুধু একটি ম্যুভমেণ্ট, সাড়া,—স্থিরতা, নিশ্চয়তা আছে এই সূচনায়। তার পর জেগে ওঠে তার দেহ জুড়ে শক্তির স্রোত, প্রত্যেক শিরা বেয়ে, প্রত্যেক রক্ত-প্রণালী দিয়ে তা ছুটে চলে। সমস্ত দেহ হয়ে ওঠে উত্তেজিত, উন্মত্ত, উদ্দাম। লেখা তার তাপ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে চলল। তার গতিবেগ জাগবে, এখনই জাগবে। আমার সন্দেহমাত্র নেই সে সাড়া দিয়েছে, যে প্রথম স্পর্শ তার দরকার সে তা লাভ করেছে। তার দেহ কাঁটা দিয়ে উঠছে প্রণয়ের প্রথম স্পর্শে। আমার সংশয় নেই সে সাড়া দিচ্ছে, প্রণয়বেদনায় প্রথম যেমনি দেয় দেহমন, ভীত, চকিত, শঙ্কায় সঙ্কুচিত। তার মুখে এখুনি ফুটে উঠবে কথা।

কথা ফুটল। আমার কথা জেগে উঠতে লাগল। আমার কলম এগিয়ে চলল, আমার লেখা হয়ে উঠল সহজ, নির্ভয়। অকুণ্ঠিত স্থির নিয়মে আমার কথা স্তরে স্তরে সাজান হচ্ছে, অক্ষরের পাশে দাঁড়াচ্ছে অক্ষর, শব্দের পাশে শব্দ। বহুদিনকার পরিচয়ে তারা পরস্পরের চেনা, বহুকালের আত্মীয়তা তারা নতুন ক'রে সন্ধান পেল আমার প্রসাদে, শুধু আমারই কলমের কৃপায়। অথবা আমারই মনের মধ্যস্থতায়! আমারই মনের মধ্যস্থতা অবশ্য, কিন্তু বহু যুগের পুরনো তাদের আত্মীয়তা-ডোর। অচ্ছেদ্য সে বন্ধন, অচ্ছেদ্য। বহু পুরুষের অনুভূতির সাম্যে তাদের এক একটি রূপ নির্ধারিত হয়েছে। উপলব্ধি আবিষ্কার করেছে এক একটি সঙ্কেত, ভাব মূর্ত হয়েছে ভাষায়, বোধ শব্দে। কত যুগের চেষ্টা, অথচ কি অনায়াসে নির্ভয়ে আমি তা ব্যবহার করছি।

আমার লেখা এগিয়ে চলল। অক্ষরের সার পাতার শেষে এসে পৌঁছচ্ছে, আমি মুখ না তুলে, কলম না তুলেও তা বুঝতে পারছি। ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠছে, ভাবটা এখানেই পূর্ণ করতে হবে। এই পাতাতেই তার সীমা; কিছুতেই অন্য পাতায় তাকে আমি যেতে দেব না। আমার চোখে এক-একটা পাতা যেন একটা সম্পূর্ণ জিনিস। একটা ভাব দু-পাতায় ছড়িয়ে পড়লে যেন তার ঐক্য নষ্ট হয়, তার আভ্যন্তরীণ মিল ভেঙে যায়—আমার মনের কোথায় গোপনে এমনই একটা ধারণা আছে। আমার লেখার এক একটি গ্রন্থি শেষ হয় এক একটি পাতায়। তার শেষ যতি এক পাতার সীমা ছাড়িয়ে অন্য পাতার শিখরে পড়লে আমার মন স্বস্তি পায় না। টেনে বুনে যে ক'রেই হোক পূর্বেকার পাতায় তাকে শেষ করতেই হয়। নইলে কোথায় যেন অসঙ্গতি ঘটে ব'লে মনে হয়। অথচ এসব পাতার কোনও মূল্য নেই, লেখার পাতা তো ছাপার পাতা নয়। এখানে যা দু' পাতায় ছড়িয়ে পড়ল, ওখানে তা এক পাতাও ভ'রে তুলতে পারবে না। এখানে যার শুরু হ'ল পত্রের চূড়ায়, ওখানে

হয়তো তার স্থান হবে পত্রের পদপ্রান্তে। পাতা জিনিসটা লেখার দিক থেকে অবান্তর। শব্দসংখ্যার দিক থেকে তো আরও বেশি অবান্তর, যে শব্দসংখ্যা গুনে আজকালকার দিনে লেখার পরিমাণ করা হয়। অবশ্য ছাপার পাতাটা অবান্তর জিনিস নয় (বিশেষ এখনও বাঙলায় পাতা গুনেই দক্ষিণা স্থির হয়, শব্দ গুনে নয়); সেখানে 'টপ' পাওয়ার জন্য প্রয়াস সব লেখারই আছে। আর কোনও লেখা ছাপার পাতার মাথায় সমাপ্ত হ'লে মনে হয় তা অসমাপ্ত। তবু, খাতার পাতার বা প্যাডের কাগজের সীমান্ত মধ্যে,—রয়েল আটপেজি বা ডবলক্রাউন ষোলপেজির এক একটি পিঠে,—আইডিয়াকে পূর্ণতা দিতে হবে এমন পাগলামো আর কি আছে? লেখার ইউনিট হচ্ছে প্যারা, এক একটি ভাবের এক একটি সুস্থির বাহন। আমি চাই প্যারা আর পাতার মিলন ঘটাতে, অন্তত কোনও প্যারাকে অল্পের জন্য অন্য পাতায় যেতে দিতে আমি কুণ্ঠিত। তাই পাতা শেষ হয়ে এলে আমার লেখা হয়ে ওঠে বর্ণমালার ঠাস-বুনোনিতে ভারী। আর আমার আইডিয়া তখন ক্রমশ আপনাকে টেনে সংযত ক'রে নেয়। তার মনে কুণ্ঠা জেগে থাকে পাছে সে সহজ পদচারণায় পাতার সীমা ডিঙোতে বাধ্য হয়।

কোনরূপে পাতার শেষ-সীমায় অঙ্কপাত ক'রে কলম তুলে বসলাম। সমস্ত পাতাটার দিকে প্রসন্ন চিত্তে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপর অস্ফুট গুঞ্জনে পড়তে শুরু করলাম আমার লেখা পাতাটা। শব্দের ওপরে শব্দ লাফিয়ে পড়ছে, ঢেউয়ের গায় যেমন পড়ে ঢেউ। বাক্যের ভারসাম্য অটুট রেখে বয়ে চলেছে বড় ছোট মাঝারি নানা জাতের ধ্বনি। তার তাল লক্ষ্য করবার দরকার নেই, সে তাল কাটলে আমার কানে লাগবেই; আর যতক্ষণ এই অসম মাত্রার শব্দমালা সে তাল অব্যাহত রাখবে, ততক্ষণ 'ঠেকা' দিয়ে গেলেই চলবে—দেখা দরকার শুধু রাগ-রাগিণী রূপ পেল কি না। আমি পড়ে চললাম অস্ফুট স্বরে। পাতার শেষে এগোতে এগোতে

সন্দেহ জাগল—কিন্তু রূপ ? কোথায় সে রূপ ? কিছু কি রূপ লাভ করেছে ? রূপ তো এখনও চোখে ঠেকছে না ! প'ড়ে চললাম। আমার মনের সংশয় ক্রমে শঙ্কায় পরিণত হতে লাগল—কোথায়, কোথায় সেই রূপ ? শব্দের পর শব্দ, ধ্বনির পিছনে ধ্বনি, তালে কাটে নি, বাক্যের গতিভঙ্গি বাধা পায় নি—কিন্তু রূপ ? যে রূপ আমার মানস-সীমায় পদার্পণ করেছিল, কোথায় তার দেহরেখা ? পাতাটা পড়া হয়ে গেল। আমি বুঝলাম, আমি তার নাগাল পাই নি। এ পাতায় তার পদচিহ্ন পড়ে নি। না, তার আভাসও আমার শব্দচিত্রে এখনও জাগে নি। পাতাটা ছেড়ে আবার দৃষ্টি গেল সামনে, মন ফিরে গেল পিছনে।

আবার আমি ফিরে গেলাম আমার চৈতন্যের রহস্য-পুরীতে, যেখানে গহন নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন থাকে অসংখ্য ভাব, অসম্ভব স্বপ্নে যেখানকার দিগন্ত ছাওয়া। ওরই হাজার মহলের এক মহলে বন্দিনী রাজকন্যা, কত লক্ষ লক্ষ যুগ থেকে সে অপেক্ষা ক'রে আছে—চোখে তার ঘুমের আলস্য, কিন্তু প্রাণে তার জাগরণের আকাঙ্ক্ষা—আমি দেখতে পেয়েছি তার দেহের আভাস, তার সকরুণ চোখের একটুখানি ইশারা। তাই আমার প্রাণে জেগেছিল শিহরণ, আমার বুকে এসেছিল প্রথম প্রণয়ের ভীরু আনন্দ। আমায় উদ্ধার করতে হবে এই রাজ-কন্যাকে, চেতনার গহনতল থেকে সেই মূর্তিকে টেনে তুলতে হবে, তার ঘুমের জড়িমা-মাখা চোখে জাগাতে হবে প্রাণের সচকিত দৃষ্টি। আমি বেরিয়েছি তারই সন্ধানে। কোথায় সেই সোনার কাঠি ?

দুয়ার খুলে গেল। সন্ধ্যা-তারার প্রদীপে তার মহল আলো করা—কোমল, মোলায়েম, স্নিগ্ধ সে আলো, আঁধারের মত নরম, আঁধারের মতই। প্রায় আঁধারই। সামনের লেখা পাতাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—না, সে মূর্তি ওখানে নেই, ওই লেখার মধ্যে। বরং শব্দের জালে সেখানে তার দেহাভাসও ঢাকা প'ড়ে গেছে, তার চোখের দৃষ্টিও আর ফুটে বেরুতে পায় না। চৈতন্যের এ মহল

এখনও বন্ধ হয়ে যায় নি, এখনও সেদিকে তাকালে আমি তার নির্দেশ পাই, কিন্তু শব্দের ধারা চৈতন্যের অন্য মহলের দিকে ব'য়ে চলেছে। সে আমাকে ব'য়ে নিয়ে চলেছে আর কোন্ এক অপরিচিত দুয়ারের দিকে। আশ্চর্য! আশ্চর্য এই শব্দের খেলা—কোথা থেকে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে এই শব্দমালা! আমি বেরিয়েছিলাম কার পিছনে, আর আমি ব'য়ে চলেছি কার সন্ধানে! কোন্ রূপ আমি চেয়েছিলাম প্রত্যক্ষ করতে, আর কোন্ অ-রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে চাইছে এই শব্দ-বন্ধনে। আবার পাতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমার সেই ভাবলোকের অস্পষ্ট মূর্তি অস্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে এই লেখায়। শুধু অস্পষ্ট নয় তার সম্মুখে নেমেছে নূতন এক আবরণ। তার রহস্য ঘনতর হয়ে উঠতে পারে নি, বরং তার আভাস ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য; আশ্চর্য এই শব্দ! যে শব্দের সরণী বেয়ে ভাবলোক থেকে আমার কল্পনা আসছিল রূপলোকের দিকে, তা-ই তাকে নিয়ে গিয়েছে ভিন্ন পথে, আঁধারহীন আদিম তমোলোকে—কেয়স্-এর তীরে। আশ্চর্য, আশ্চর্য এই শব্দ—এই আঁকাবাঁকা লেখা, ওই অক্ষরের সারে-বাঁধা ধ্বনি, যে ধ্বনি শুধু প্রতীক, আমাদের ভাবলোকে যা সংকেতমাত্র। সে প্রতীকই ঢেকে দেয় তার মূল উদ্দিষ্টকে।

ভাষা তো শুধু ভাবের প্রতীক, আর কাগজের পাতায় সেই ভাষার ছাপ বহন করে আমাদের লেখা—এই সহস্র সরীসৃপ। এই কালির আঁচড় ধ্বনির বাহন মাত্র, তা রোমান অক্ষরেও যা থাকবে, বাঙ্লা অক্ষরেও তাই থাকবে। শব্দ মূলত ধ্বনিদেহ। ভাষার অধিষ্ঠান-ভূমি কালি-কলম নয়, ছাপাখানাও নয়। সরস্বতী জিহ্বায় অধিষ্ঠান করেন। কিন্তু জিহ্বা-যন্ত্রে যে শব্দ ফুটছে সে শব্দও প্রতীক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অথচ এই প্রতীকের আড়ালে মূল উদ্দিষ্টই দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে, ভাষার এ কেমন অদ্ভুত ছলনা!—সামনেকার শব্দগুলোর দিকে আমি বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম, আমার ভাবলোকের দূত কেমন

ক'রে আমাকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে, গুলিয়ে দিয়েছে আমার ভাবকে ; তা আর রূপগ্রহণ করতে পারে নি। আমার কল্পনা যে প্রতীক আশ্রয় করলে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য, সে প্রতীকই তাকে আচ্ছাদিত করলে, আমার মন থেকে প্রায় তাকে অপসারিত করতে যাচ্ছে। এখনও তা মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু তার আয়োজন হয়েছে। শব্দের পর শব্দ, ধ্বনির পিছনে ধ্বনি, আমার কানের ভিতরে প্রবেশ করছে। পটহে তাদের মৃদু আঘাত লাগছে ; ঢেউ উঠছে সেখানকার ক্ষুদ্র তড়াগে, জাগছে স্নায়ুতে কম্পন, মস্তিষ্কের স্নায়ু-প্রকোষ্ঠে সে স্পর্শ ফুটে উঠেছে ধ্বনির লেখায়। তার সাড়া একটু একটু ক'রে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। বড়, আরও বড় হচ্ছে তার পরিধি। মস্তিষ্কের যে কোটরে এতক্ষণ ব'সে ছিল ভাবময়ী প্রথম কল্পনা, যেখানে তার ছাপ পড়েছিল, সেখানে এল এই নতুন তরঙ্গ। একটু একটু ক'রে শব্দাবেগ মুছে ফেলছে সেই পুরনো দাগ, সে দাগ ঝাপসা হয়ে উঠছে। শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে নতুন অস্পষ্ট, অনুদ্দিষ্ট ভাব সেখানে স্থান নেবার জন্য এগিয়ে আসছে। যে সব ভাবকে আমি চাই নি, জানি না, এই শব্দময় প্রতীক আশ্রয় ক'রে তারাই এসে উপস্থিত। অথচ, এই শব্দ আমিই ডেকে এনেছি আমার জ্ঞানলোক থেকে—আমার ভাবলোকের সেই অর্ধস্ফুট রহস্যকে মূর্ত করতে ; আমার সে-ই উপলব্ধির সংকেত হবার জন্যই এ কথার জন্ম, তার সৃষ্টি ; আর সে আমাকেই করেছে ছলনা, আমার সেই উপলব্ধিকেই দিচ্ছে অপস্থত ক'রে। এ অসম্ভব কি ক'রে সম্ভব হ'ল ? এ ভাষা কি আমার নয় ?

সত্যসত্যই কতটুকু আমার এ ভাষা! লক্ষ যুগের মানুষের উপলব্ধির রঙ মেখে এই ভাষা আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। কত পূর্বজের অনুভূতিলোকে একটু একটু ক'রে এর বিকাশ হয়েছে। সামান্য এক একটি ধ্বনির অস্থিমজ্জা নব নব অভিজ্ঞতা নব নব ব্যঞ্জনায় ভ'রে তুলেছে। এক একটি শব্দ এক একটি বিশিষ্ট অর্থের বাঁধন ছাড়িয়ে নতুন নতুন ইঙ্গিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এককালে

যিনি ছিলেন 'রুদ্র', ঝড় বিদ্যুৎ মেঘের ও মরুতের দেবতা,—হয়তো যিনি ছিলেন দ্রাবিড়ের জঙ্গলে-ভরা দেশের 'রক্তবর্ণ দেব',—আজও 'শিব' বললেও তিনি আমার চোখে ধ্বংসের দেবতারূপে দেখা দেন; আবার তিনিই কল্যাণময় হন; তিনিই হন সন্ন্যাসী, তিনিই আবার উমাপতি মহেশ্বর, ক্ষ্যাপা ভোলানাথ,—ডোমপাড়ায় তিনিই কুচনীর পিছনে ফেরেন। এক 'শিব' কথাটির আড়ালে তাঁর কত রূপ রয়েছে আবৃত। মানুষের কত বিচিত্র অনুভূতির, বিভিন্ন উপলব্ধির ইতিহাস ওই একটি শব্দ-সংকেতে জমা হয়ে আছে। এক একটি শব্দ এমন ক'রেই একাধিক ভাবের বাহন হয়ে উঠেছে। তার সামান্য অর্থ ছাপিয়েও তার ব্যঞ্জনা দূরে দূরে আমাদের প্রাণকে পৌঁছে দেয়। 'রাগ' আজ আমাদের কাছে ক্রোধ। তার সামান্য অর্থ উত্তেজনাও চলতে পারে, আর সঙ্গীতের পারিভাষিক অর্থও তার অটুট আছে। কিন্তু তার রাঙা আভা আজও লোপ পায়নি। আমাদের চোখের তারায় তা ধরা পড়ে; আর চোখেরও অতীত মনের এক দীপ্তিময় অনুভূতি ওই শব্দে এখনও আপনাকে প্রকাশিত করতে পারে; শুধু 'অনুরাগ' রূপে নয়, এখনও 'রাগ' শব্দটির সে ব্যঞ্জনা আছে। এমনই প্রত্যেক শব্দেরই অর্থকেন্দ্র ছাড়িয়ে তার ইঙ্গিত নানা দিকে চ'লে গেছে—মানব-অভিজ্ঞতার বিচিত্রতায় তা এমনই বিচিত্র ও বিস্তৃত হয়েছে। অর্থ তো শব্দের সামান্য গুণ, তার অসামান্য গুণ তার ব্যঞ্জনা।

একই শব্দের দেহমধ্যে রয়েছে বহু অনুভূতির বহুতর উপলব্ধি। শব্দ পরিমিত, অনেক সময়েই পুরনো, কিন্তু অভিজ্ঞতা অশেষ, বিচিত্র এবং নিত্য নূতন। তাই, এই চির-নবীন ও চির-বিচিত্র উপলব্ধির জন্য শব্দের ভাণ্ডার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হতে হয়—ঠিক সেই ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স প্রকাশিত হবে এমন শব্দ কোথায়? আর পৃথিবীতে মানুষমাত্রেরই অভিজ্ঞতা বিচিত্র, তার প্রত্যেক উপলব্ধিই ইউনিক। একই পদ্মা আমিও দেখি, রবীন্দ্রনাথও দেখেছেন, আর

শত শত লোকও দেখেন। চোখের ওপরে বাইরের দৃশ্য যে আঘাত দেয়, সম্ভবত তা সবারই পক্ষে এক রকম। চক্ষুর স্নায়ু বেয়ে এ বেদনা মস্তিষ্ককোষে সঞ্চারিত হ'লে যে বাস্তব অনুভূতি জাগে, তাও সাধারণের একই—যদি কারও কোনও 'চোখের দোষ' না থাকে। কিন্তু তা থেকে যে উপলব্ধি আমি লাভ করি, তাতে মনে হয় ওর সঙ্গে আমার জীবন কেমন ক'রে জড়িয়ে আছে, ও আমার আপনার, আমার আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অন্য ধরনের, আর সে ধরনও তাঁর কবিতার মারফৎ হয়তো আমার উপলব্ধির মধ্যে অজ্ঞাতে খানিকটা মিশিয়ে আছে। শিলাইদর কোনও চাষীর বা তারপাশার কোনও মাঝির উপলব্ধি অবশ্য আর এক ধরনের—তা থেকেও কি আমি একেবারে বঞ্চিত ?

কিন্তু প্রত্যেকেরই এই উপলব্ধি একটি অভিজ্ঞতায় পৌঁছচ্ছে—কেউ তা জানি, কেউ তা জানি না। আর প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই স্বতন্ত্র, ইউনিক ; তার সেই অসামান্যতা আমাদের নিকট বহন করবার ভার শব্দের উপর, কথার উপর। কিন্তু কথা যদি অসামান্য না হয়, শুধু তার সামান্য অর্থের কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে, তা হ'লে সে উপলব্ধির অসামান্যতাও প্রকাশ পায় না, নূতন সৃষ্টি হয় না। তার অভাবে সামান্য কথা নিয়েই কারবার করতে হয়। উপলব্ধিও তার বিশিষ্টতা হারায়, হয়ে ওঠে সামান্য। জীবনে প্রতিদিন আমরা এমনই সামান্য কথায় অসামান্য অভিজ্ঞতার ধার খুইয়ে চলি। ভাবি যে, সে অভিজ্ঞতাই বুঝি সামান্য। হয়তো তাতে জীবন-যাত্রা সহজ হয়েছে, ইউনিককে অ্যাভারেজের দরে পেয়ে আমরা হাটে-মাঠে সহজে কারবার করতে পারি। এমন কি মনের এলাকায়ও যথাসম্ভব এই অ্যাভারেজ দরেই আদান-প্রদান চালাই। এতে আমরা বেঁচেছি। আমাদের জীবন সাধারণ চালে, সাধারণ ভাবে চলে। আমরা পেয়েছি একটা মানদণ্ড, অ্যাভারেজ। তা না পেলে আমরা পদে পদে ইউনিকের ঠোকর খেয়ে ঘায়েল হতাম, জীবন-যাত্রা অচল

হয়ে পড়ত। কিন্তু এই সামান্যতার স্রোতে তবু অসামান্যতা একেবারে তলিয়ে যায় না। হঠাৎ তা সচেতন হয়, তা সামান্য মাপকাঠিতে তৃপ্ত হতে পারে না, আপনার প্রকাশ সে কামনা করে, অসামান্য উপলব্ধি চায় অনুরূপ ভাষা। তখন ভাষার সামান্য গুণ ছাড়িয়ে হঠাৎ তাতে অসামান্য দ্যোতনা দেখা দেয়, অর্থ ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনা জাগে; ধ্বনিতে আর ভাবেতে হয় প্রথম মিলন, তা পূর্ণ হয় শব্দের সঙ্গীতে আর কল্পনার ইঙ্গিতে। যেমন—

We are such stuff
As dreams are made on; and all our little life
Is rounded with a sleep.

কিংবা

The still sad music of humanity.

আর আমরা?—যাদের সামান্যের চেনা মুখ নিয়ে কারবার, তারা? আমরা এই অসামান্য প্রকাশে কি করি?

Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken.

সত্যসত্যই নূতন নক্ষত্র উদিত হয়। জীবনের যত অভিজ্ঞতা নিবে গিয়েছিল তাদের আলো হঠাৎ যেন আবার দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, যেসব জ্যোতিষ্ক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হঠাৎ যেন তারা এই দীপ্তি পেয়ে নতুন জ্যোৎস্না ঢালতে থাকে।

আমার কোনও উপলব্ধির প্রকাশ সামান্য ভাষায় সম্ভব নয়—যে ভাষা তার অর্থের কেন্দ্রে আবদ্ধ, তা দিয়ে চলে না। শব্দের মধ্যে যে বহু দিকের ইঙ্গিত ঘুমন্ত আছে তার স্থির সন্ধান জানা দরকার, আর উপলব্ধির প্রয়োজনমত ঠিক তার সেই বিশেষ কোনটিকেই উদ্ভাসিত করতে হবে, যেখানকার সঙ্গে ওই উপলব্ধিটি জড়িত। একই শব্দে অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া উপলব্ধির সূতো এসে গ্রন্থি বেঁধেছে। কিন্তু দরকার সেই সূতোটিকে যেটি বিশেষ উদ্দিষ্টের দিকে আমাকে এগিয়ে দেবে,

যেটি একান্তভাবে আমার এই অভিজ্ঞতাকেই নির্দেশ করবে। এই একান্ত জিনিসটি না পেলে আমার কথার সূতো ভাবের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে, তা দশ মুখে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর নইলে আমি কথার গ্রন্থিতে কেবলই দোব নতুন গ্রন্থি, কেবলই বাড়াব জটিলতা। তখন আমার উদ্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ঘুলিয়ে যাবে, কুয়াশার মত কথা আবৃত ক'রে ফেলবে আমার ভাবকে, শব্দের গায়ে আসবে শব্দ, ধ্বনির পরে ভিড় ক'রে আসবে ধ্বনি; কিন্তু ভাষা অভিজ্ঞতার আভাস বহন করতে পারবে না, কথা বাণী হয়ে উঠবে না, থাকবে কথা হয়ে। কথা আর কথা আর কথা—words, words, words.

পাতাটা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ফেলে দিলাম।

লেখাটা আবার নিয়ে বস্‌লাম।

নতুন পাতার পিঠে নতুন করে সাজাতে বসলাম আমার কথা। এবার আর কথাকে রাশ ছেড়ে দোব না, তার প্রত্যেকটি তীর কানায় কানায় ভরে তুলব, প্রত্যেকটি শব্দকে আমি ওজন করে বসাব, সামান্যতার আড়ালে যেন কিছুই মনের কথা ঢাকা না পড়ে তা দেখতে হবে, দেখতে হবে যাতে আবার চারিদিকে কথার কুয়াসা ঘনিয়ে না ওঠে, ভাব আবছায়া হয়ে হয়ে মিলিয়ে যেতে বাধ্য না হয়।

পুরনো শব্দগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে। একবার আমার মগজে তারা পথ কেটে ঢুকেছে; নিজেদের সেই অনায়াসে পাওয়া স্থানটুকু এখন কিছুতেই তারা নতুন শব্দকে ছেড়ে দিতে চায় না। আমার কলমকে বলে—তুমি সহায় হও। আর সহায় হলেই তাদের vested interest অক্ষুণ্ণ থাকে। মনকে বলে,—তুমি সহজ হও, একেবারে নিজেকে সহজ করে দাও। তা হলেই পুরনো পাট বজায় থাকে—Path of least resistance হচ্ছে status quo'র পথ। পুরনো শব্দগুলো বারে বারে ফিরে আসতে চায়। বলে—দেখো,

আমাদের আবির্ভাব কেমন সহজ, কেমন স্বাভাবিক, আমরা তোমার কতো আপনার, কতো আত্মীয়—তোমার উপলব্ধি আপনা থেকেই মেনে নিয়েছে আমি তার স্বভাষা।—আমারও এক-একবার বিশ্বাস হয়, সত্যই তো, যে কথা এমন অনায়াসে পাচ্ছি তাই তো খাঁটি কথা।

কিন্তু না, দ্বিতীয়বার আর ও ভুল করতে পারি না। অনায়াসে আমরা যা পাই তা প্রায়ই বৈশিষ্ট্যহীন, তা দিয়ে দোকানদারী চলে, তা দিয়ে সৃষ্টি হয় না; আত্মপ্রকাশ চলে না। সৃষ্টি মানে তো শুধু আড়ৎদারী নয়, তার মানে নতুন নির্মাণ,—আত্মদান, তাই আত্মপ্রকাশ। অনেক আয়াসে তা লাভ করতে হয়,—অনেক বিচার, অনেক বিশ্লেষণ, অনেক ত্যাগ ও অনেক বর্জন, অনেক সমীক্ষা আর অনেক পরীক্ষা। বাজারের চাহিদা তাকেও মানতে হয় বটে, কিন্তু জানতে হয় সব চেয়ে বেশি নিজের অনুভূতিকে। তাকেই পেতে হয় উপলব্ধিতে, তাকেই দিতে হয় প্রকাশ। তা সহজ নয়। সহজ হচ্ছে commonplace, বাজারের চাহিদা জোগানো। তা চোখে পড়ে, কিন্তু তা মনে ঢোকে না; তা স্থূল, কিন্তু প্রেরণা নেই, প্রকাশ নেই। 'সহজিয়ার' মুখে সহজ সহজ শুনে আমরা ভুল করে ফেলি। কিন্তু সে 'সহজ' হচ্ছে সহজাত, তা commonplace নয়, instinctive, fundamental বা original. অরিজিন্যাল জিনিসটা সোজা কথা নয়। চেষ্টারটনের কথা মনে রাখা দরকার—মৌলিকত্ব হচ্ছে জীবন ও জগতের মূল আবিষ্কারের শক্তি; তার অর্থ নতুনত্ব নয় কিংবা অদ্ভুতত্ব নয়ঃ "Originality is the quality of laying hold of origins, the fundamentals of life and universe······Originality is not uniqueness nor novelty; for then a poet who sings of his desire to eat a mahagony table will be surpassingly original." শালগ্রাম দিয়ে মসলা পেষাও যে অর্থে 'original' পরকীয়া চর্চাও সে-অর্থেই 'সহজ'। সহজ কথাটার

মধ্যেই একাধিক অর্থের আভাস রয়েছে—সকল শব্দের মধ্যেই যেমন থাকে। তার এক মানে দিয়ে আর এক ইঙ্গিতকে আচ্ছাদিত করলে আমরা নিজেরাই ঠকব। 'সহজ' মানে তাই শুধুমাত্র সোজা নয়, সহজাতও। যা সহজাত তা সকলকারই পক্ষে সহজাত, সামান্য মানুষেরও অসামান্য মানুষেরও। আসলে তা সার্বজনীন, common inheritance. এমনি 'সহজ' শব্দটা, এমনি শব্দ 'সামান্য', এমনি শব্দ ইংরেজি 'common',—কারণ এমনি তাদের পিছনকার সত্যও। সে সত্য আমাদের জীবন,—একই সঙ্গে তাতে আছে বহির্জীবন আর অন্তর্জীবন, commonplace আর common inheritance, পৃথিবী আর প্রাণাবেগ, objects আর instinct, বাইরের সমাজ আর আমার-আপনার ভেতরের গহন হৃদয়। একদিকে দশজনের সংসার—তা আমরা সবাই চিনি—পরিচিত, এই অর্থে 'সহজ' তার রূপ। সবাই খাই-দাই; ছোট-কথা নিয়ে, ছোট কাজ নিয়ে দিনের পিছনে দিন ভাসিয়ে দিই; ছুটি জীবনের তাগিদে, জীবনের তাড়নায়; ছুটি দিশেহারা, ছুটি আত্মহারা। কত মূঢ়তা সেখানে, কত রূঢ়তা—আর কত 'সহজ' তা আমাদের চক্ষে! এই আমাদের একরূপ 'সহজ' জীবনযাত্রা, সাধারণ এবং সামান্য;—আমরাও তেমনি;—এখানে সামাজিক মানুষ আমরা। তবু এই বাইরের টানেই আমরা কেউ সাধারণ ও সামান্যও নেই; কেউ হয়ত রাজা, কেউবা প্রজা। আর সে হিসাবে কারো জীবন রাজার মত, কারো প্রজার মত। যত এই দেয়াল উঁচু হবে তত সমাজ গণ্ডিবদ্ধ হবে, প্রত্যেকেরই তত জীবন অস্বচ্ছন্দ হবে, হবে টুকরো-টুকরো, খণ্ড খণ্ড, হবে জটিল; আর ততই প্রত্যেকে হবে নিজের মধ্যে অনেকটা একান্ত, অনেকটা আবদ্ধ, অনেকটা বন্দী—মানে, 'সহজ' আর থাকি না। এই আমাদের আর এক দিক—সেই সামাজিক দিকেরই। তা ছাড়াও আছে অন্তরের এলাকা—সহজাত বৃত্তির গহন তল। সামাজিক দিক থেকে সেদিকে

মুখ ফেরালে আবার দেখি—কেইবা রাজা, কেইবা প্রজা ? 'A man's a man for a' that.' রাজার দম্ভ আছে, প্রজারও আছে হীনতা—কিন্তু সে উপরতলায়। গহন অতলে—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

এই তো দুই জগৎ—দুই জগতে চলছে নিমেষে নিমেষে আদান-প্রদান, ভাঙাগড়া। কিন্তু এই দুই জগতের বাসিন্দা আমরা সবাই। তাই বলে আমরা সকলেই কি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি ? না, আমি পারি আমার 'সহজ' অস্তিত্বের কথা বুঝতে ? কিংবা আমার অস্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবনযাত্রাকেও ঠিক মতো ধরতে ? পারি না। পারা সহজ নয়। তা পারেন বলেই তো কবি কবি, কলাবিদ্ কলাবিদ্—অন্তরের সহজাবেগকে কবিরা ভাষা দেন। তেমনি আবার বাইরের জীবনযাত্রাকে ফোটাতে পারেন বলেই কথাশিল্পী কথাশিল্পী, নাট্যকার নাট্যকার। আমরাও মানুষ, জীবন-যাত্রার অংশীদার, হৃদয়াবেগে ভরা মানুষও;—তবু সহজ জীবনকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। আমাদের প্রতিদিনকার কথাও তো সহজ কথাই ; তবু তাতে না ফোটে জীবন-যাত্রার সহজ ছবি, না ধরা পড়ে জীবনতলের সহজিয়া আবেগ।

শব্দের জগতেও 'সহজ' 'সহজ' বলি আমরা অনেকে, তারা জানে কি তার সম্পূর্ণ ও সঠিক মানে ? চণ্ডীদাসের সাধনার মতোই এ সহজেরও সাধনা—চণ্ডীদাস ভাষারও 'সহজিয়া' তাও মনে রাখা যেতে পারে। তার পিছনেও চাই অন্তহীন তপস্যা, অসামান্য সংযম, অশেষ ত্যাগ। যে শব্দ প্রথমেই মনে জেগে উঠবে সে শব্দ অনেক সময়েই কোনো-না-কোনো রূপে মনের ওই উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে ; কিন্তু সে সম্পর্ক খাঁটি সম্পর্ক নাও হতে পারে। অনেক সময়েই হয়ত তা বাঁধা কথা, ধরতাই বুলি ; মূল উপলব্ধির সঙ্গে হয়ত তার সম্পর্ক ঐতিহ্যগত (traditional), হয়ত সে

সম্পর্ক বাহ্য সংস্কারের (conventional), হয়ত বা সে সম্পর্ক খোশখেয়ালের—যার Freudian ব্যাখ্যাও হতে পারে। এমনি হাজার-হাজার বাইরের সম্পর্কের সূত্র ধরে এক-এক শব্দ এসে হানা দেয়। আজকের বাদ্‌লার রূপটি মনে করে কারও মনে প্রথমেই উদিত হতে পারে শ্যামরূপ, কারও 'শাঙন ঘন গহন মোহ', কারও গরম চা ও গরম জিলিপী ; আর আমার ব্যাঙের ডাক—আমার ছেলেবেলার এই দিনগুলোর সঙ্গে সেই একটানা গ্যাঙ্‌র-গোঁ-গ্যাঙ্‌র-গো এমনি ভাবে সম্পর্কিত যে এই চিন্তাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু বাদলার যে রূপ আমার মনের তলে জমে উঠছে এর কোনোটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ মৌলিক নয়, অবিচ্ছেদ্য নয়। কোন্ শব্দে সেই রূপ বাইরে টেনে আনব? প্রথম যে শব্দ মনে পড়ছে তাই দিয়ে,—ব্যাঙের গ্যাঙর-গোঁ ?—না, যে কথা প্রথম মনে জাগে তা-ই যে খাঁটি কথা এমন ভাবা চলে না। শব্দের সহজ সাধনাও সাধনা করতে হয়—অনেক বিচার করে, অনেক পরীক্ষা করে। এখানেও প্রথম ও প্রধান অবলম্বন—অস্বীকৃতি, 'নৈতৎ'।

পুরনো পাতাটা টুকরো-টুকরো করে ফেলেছি, তবু তার শব্দগুলো আমার মাথায় ঘুরছে, তারা এখনো টুকরো-টুকরো হয়ে যায় নি। এখনও আমার মগজের পাতায় যে তাদের দাগ রয়েছে, আঁকা-বাঁকা, সর্পগতি দাগ। তা মুছে ফেলতে পারি নি। আমার কলমের আঁচড়ে কাগজের কথা বাতিল হয়, কিন্তু মনের অক্ষর কাটা যায় না। সে অক্ষর আবার বেঁচে উঠতে চায় কাগজে। সে কতকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই তাকে বিদায় করা শক্ত। সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই এখন তার অস্তিত্ব আমার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠছে। আমি মনে করি, সে-ই বুঝি খাঁটি, সে-ই বুঝি মৌলিক, সে-ই বুঝি আমার নিজস্ব। কিন্তু না, এই 'বাঁধা কথা'র সহজত্ব আমাকে ঠেকাতে হবে ; এই ধর্‌তাই বুলিকে স্বাভাবিক স্বীকার করে স্বভাবকে অস্বীকার করা চলবে না। আমি পুরনো কথাগুলো না

মেপে, না পরখ করে, আর গ্রহণ করছি না। করুক না তারা কোলাহল, মস্তিষ্কের কোঠায় তাদের কণ্ঠ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে উঠবে। শেষে আর তার রেশও থাকবে না। নতুন কথা, নতুন ধ্বনি ততক্ষণ তাদের সেখানে বেদখল করে জেঁকে বসবে।

নতুন শব্দ আসছে, পুরনো শব্দকেও বুঝে-শুঝে একটু-একটু তুয়ার ছেড়ে দিচ্ছি, নতুনে-পুরনোতে পাশাপাশি বসে যাচ্ছে, কোথাও তাদের অসাম্য নেই, পরম আত্মীয় পরস্পরের। প্রত্যেকটি শব্দকে আমি ওজন করে নিচ্ছি, ভরে তুলছি তার প্রত্যেকটি তট তাঁদের আভাস-সমৃদ্ধিতে। আমার প্রত্যেকটি কথা হচ্ছে ভরাট, আমার লেখা হবে তাই জমাট ; সামান্য ভাষার অন্তর থেকে আমি ফুটিয়ে তুলছি তাদের অসামান্য ইঙ্গিত। কারো আভাস আর অনির্দেশ্য নেই ; শব্দের সাধারণ অর্থ ছাপিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে তার অসাধারণ ব্যঞ্জনা।

অনেকটা লিখে গেলাম। এক পাতা ছেড়ে তুপাতা শেষ হল। নতুন কথার কল্লোলে কতটা সময় যে কেটে গেছে তাও জানি না। বিকালে খাবার ঘণ্টা পড়েছে, উঠি উঠি করে আর উঠিনি—এইটুকু শেষ হোক। কিন্তু এক লাইন তু লাইন করে আমার খাবার সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। লাইনের পরে লাইন আসছে। কথাটা এখনও শেষ হতে পায় নি, যেখানে পৌঁছে সে নিঃশ্বাস নিতে পারবে, বলতে পারবে—এই আমি দাঁড়ালাম, এই আমি এসেছি ; দেখো, এই আমার পুরোপুরি রূপ।—কথা এখনো সেখানে পৌঁছয়নি। কিন্তু তার সেই লক্ষ্য-সীমাটি আমার চোখের এত সামনে যে আমি থামতে পারছি না। ওই মাঝখানকার কথাগুলোকে যে-করে হোক্ মাথা থেকে নামাতে হবে, মাথা থেকে ঠেলে বের করে দিতে হবে, যে করে হোক্ কাগজে ছড়িয়ে দিতে হবে, তা না দিয়ে আমি উঠতে পারছি না। ওই কথাগুলো, এই বাক্যটা, আর তার সঙ্গেকার ওর সঙ্গীটি, আর তার পিছনকার সে অনুচর কথাটা ;—এদের কোনো রূপে একবার

মগজের এলাকা ছাড়িয়ে কাগজের মধ্যে আনা চাই। যে-করে হোক্ এদের ভার মাথা থেকে নামাতে হবে। তারপরে,—তারপরে,— সেই শেষ সীমা, সেই প্রান্তরেখা, যেখানে পৌঁছে আমার সাম্‌নেকার এই কথাটি বলতে পারবে—এই তো, এই আমি এসেছি। তখন আমি উঠে পড়ব, এ বেলার মতো,—খাবার গিলব, মুক্তি পাব, মানুষ হব।

কোনো রকমে পৌঁছুলাম সেই সীমায়—কলম তুলে এবারকার মতো থামলাম, এই দুপুরের মতো। একবার লেখাটার এই আড়াই পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। উঠবার আগে দেখে নিই, যদি কোথাও কোনো শব্দে ফাঁক পড়ে থাকে, কোনো বর্ণ দিয়ে থাকে ফাঁকি, এই আঁকা-বাঁকা অক্ষরের সারের মধ্যে যদি কোনো অবাঞ্ছিত পদ আমার চোখ এড়িয়ে এসে বসে গিয়ে থাকে—দেবতার সমাজে রাহুর মতো।

আবার গুঞ্জন করে পড়ে চল্‌লাম। শব্দের ধ্বনি জেগে উঠল। এ তাল নতুন, তা মানতেই হবে। এ তরল নয়, এতে ঢিলেমি নেই। কঠিন, দৃঢ়বদ্ধ, গম্ভীর। আমি পড়ে চললাম—শব্দের ধ্বনি স্থির, স্বতন্ত্র, স্বাধীন ; একটির গায়ে আরটি ঢলে পড়ছে না। প্রত্যেকটি আপনাতে সমাহিত, আপন মর্যাদা নিয়ে আপনি একক। অর্থও তেমনি সতেজ। তাদের ঐশ্বর্য আর আবৃত হয়ে নেই ; শব্দের সামান্যতার খোলস খসে পড়েছে, আমার ভাষা হয়ে উঠেছে স্বসমুখ। আমি পড়ে চল্‌লাম। পদে পদে আমার দৃষ্টি চমকে উঠতে লাগল। একটি শব্দকেও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। প্রত্যেকটি পরাক্রান্ত, প্রত্যেকটি উদ্দীপ্ত, প্রত্যেকটি ঐশ্বর্যবান্। পদে পদে এই শব্দকে কুর্নীশ করতে হয়, কুর্নীশ করতে করতে তবে এগোতে হয়,—এমনি আমার ভাষার আভিজাত্য, এমনি তার শব্দের অনমনীয় স্বাতন্ত্র্য। এক-একবার থেমে দম দিতে হয়—আমার ঘন-সন্নদ্ধ ভাষার মধ্যে ফাঁক কোথাও নেই যে ফাঁকি দিয়ে দম নেব। আমার ভাষা গাঢ়বদ্ধ,

কঠিন, নিশ্ছিদ্র। কোনো শব্দকেই শুধু চোখে দেখে গেলে চলে না, থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়, বুঝতে হয় তার বিশিষ্ট গৌরব ;—তার পরে মুক্তি। আমার দম ফুরিয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছুবার পূর্বেই হাঁফ ধরে। প্রত্যেকটি শব্দ ভারী, ব্যঞ্জনা তার সুদূরপ্রসারিত,—কোনো চেনা সহজ কথার মধ্যে মিশে হারিয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে, একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে তা আপনার গুরুত্ব জ্ঞাপন করে ; সাধ্য নেই বলি, 'দেখি নি'। সাধ্য নেই বলি, 'তোমাকে চিনি',—শব্দের দৃপ্ত মহিমা বারে বারে পথরোধ করে। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মানতে হয় তার অসামান্যতা।

শেষ অক্ষর পর্যন্ত আমায় পড়তে হল না। ভাষার ইলেকৃট্রিক শক্ খেতে খেতে আমি সে চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম, ইলেকৃট্রিসিটির শক্তি আছে ; তা প্রাণঘাতী, স্নায়ুনাশী। কিন্তু তার রূপ ? হয়ত তার রূপও আছে, টি. এস্. এলিয়টের হাতের মধ্যযুগীয় দীপাধারে হয়ত তা আলো জোগায়, হয়ত এজ্‌রা পাউণ্ডের হাতেও তার চমক ফোটে, জেম্‌স্ জয়েসের এক্‌স্ রে'র জন্যও হয়ত চাই এমনি শব্দের তাড়িত শক্তি। কিন্তু সেই তড়িৎ তাড়নায় আমার চোখ শ্রান্ত হয়। আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো ভাষার ডাইনামো চালাতে জানি না, তা আমি পারি না। বিদ্যুৎ অদৃশ্য-সঞ্চারী। আমি তার রূপ দেখতে পাই না, আমার সাম্‌নে তার কোনো প্রকাশ নেই। আমি শুধু ইলেকৃট্রিক শক্ খেয়ে ত্রস্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি—কোথায় রূপ ? দেখলাম আমার ভাব রূপ নিতে পারে নি। এই ভাষার বিদ্যুৎ-ভরা তারের ভয়ে সে আমার সাম্‌নেই আসতে পারে নি। অথচ আমার শব্দ সুদৃঢ়, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি সমুন্নত, তার অর্থে সামান্যতা নেই, তার আভাস প্রচুর, তার ব্যঞ্জনা বহুল, তার বিশিষ্টতা গুরুতর। কিন্তু তবু আমার ভাব পায় নি ভাষায় রূপ, আমার উপলব্ধি পায় নি তার প্রতীক, আমার মানস পুরীতে এখনো রয়েছে সেই রাজকন্যা তন্দ্রাচ্ছন্না।

· এখনো রয়েছে ? আর একবার তাকিয়ে দেখলাম সেই চৈতন্য-লোকে। ·ঠেলে যেতে হল অনেক ভিড়—এই নতুন শব্দের ভিড়, এই পালোয়ানী হুঙ্কার, এই ডাক-হাঁক। মস্তিষ্কের কোঠায় এরাও প্রবেশ করে বসেছে। এরা আমার চোখের মধ্য দিয়ে কানের মধ্য দিয়ে আমার চৈতন্য পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। আমার সমস্ত মনের ওপর এখন এরা ছুটোছুটি করে ফিরছে। রাস্তার ভিড়ের মতো এই শব্দের ভিড়, কারখানার ছুটি-পাওয়া মজুরের মতো এদের উগ্র কোলাহল।—এরই মধ্য দিয়ে আমার পথ করে যেতে হবে। কোথায়?—সেই সুদূর মহলে যেখানে সন্ধ্যাতারার দীপ জ্বলছে, যে আঁধারের মতো নরম আলোয় ঘুমিয়ে আছে নরম আমার প্রথম কল্পনা।

পথ কেটে যেতে হবে আমাকে—কোন্ পথে, কোন্ দিকে? আমি বিভ্রান্ত ভাবে হাতড়াচ্ছি, অন্ধের মতো খুঁজি, পথ আর পাই না। কিন্তু পেতেই হবে। সেই ভাবলোকের দুয়ার আমার পাওয়া চাই, আমাকে যেতে হবে সেই মায়াপুরীতে, পেতে হবে সেই রাজকন্যার সন্ধান। তা পাই না বলেই তার দেহরেখা আমার আঙুলের ডগা বেয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না; আমার কলমের কালি তাকে কেবলি আবৃত করে, তাকে রূপ দিতে পারে না; আমার ভাষা ভাবের প্রতীক হয়ে উঠছে না, রয়ে যাচ্ছে অচল শিলা,—মন্ত্র নয়, উদ্ধত যন্ত্র।

কিন্তু কোথায় সেই রাজকন্যা? তাকে চেনা দরকার, তাকে প্রথম পাওয়া চাই, ধ্যানের মধ্যে তার স্থির উপলব্ধি না লাভ করলে তাকে চৈতন্যেও আর স্থির ভাবে ধরে রাখা যায় না। তখন নানা কথায় তা ঘুলিয়ে যায়; কথার জাল বুনে হতাশ হতে হয়; কথার পাষাণ খুঁড়ে আর মূর্তি বের করা যায় না। চাই ধ্যানের মধ্যে প্রথম তার প্রতিষ্ঠা —সেখানে তার দেহরেখা স্থির হয়ে উঠবে, ভাব সেখানে সকল অনির্দেশ্যতা থেকে মুক্ত হবে, গ্রহণ করবে তার নিজস্ব আয়তন—

অনুভূতি হয়ে উঠবে উপলব্ধি, হবে অভিজ্ঞতা। চাই ভাবকে স্বস্থ করা। আমার মস্তিষ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীহারিকার স্রোত, শুভ্র অস্পষ্ট আর ছায়া,—রাশি রাশি কোটি কোটি অণুকণা, তাদের রূপ নেই, দেহ নেই, আকৃতি নেই,—তারা রূপের জন্য, জ্যোতিষ্কে মূর্ত হওয়ার জন্য অস্থির। সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশ ভাবলোকে সত্য না হতে ভাষায় তার পরিণতি আসবে কোথা থেকে? আর চৈতন্যের মধ্যে তার কল্পনা একবার দেহাবয়ব স্বীকার করলে ভাষা তাকে ফাঁকিই বা দেবে কি করে? তখন সেই অভিজ্ঞানেই অনুভূতি হবে অভিজ্ঞতা। ভাষাই সেই অভিজ্ঞান। চাই ভাবকে তাই স্থির ভাবে জানা, আমার অনুভূতিকে ধরতে হ'বে একেবারে মুঠোর মধ্যে চেপে। অনুভূতির স্বরূপ বুঝতে হবে সুনিশ্চিত রূপে, তা হলেই অনুভূতি হবে উপলব্ধি। হাজার দিকে মুখ আমার এক এক অনুভূতির,—অথবা মুখই তার নেই, আছে কতকগুলি অস্পষ্ট আবছায়া দেহ, আর সেই নীহারিকা-স্রোতে আছে এক একটা কেন্দ্র। কেন্দ্র তবু আছে, আছে ছায়াদেহ, তাই তার সৃষ্টিতে রূপ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তাই আমার অন্তরাকাশে তার এমন আলোড়ন জাগল। সেই অনুভূতি-কেন্দ্রটাকে ঠিক মতো বুঝতে হবে, ধরতে হবে অনুভূতির স্বরূপ, আর তা হলেই জন্মাবে অভিজ্ঞতা, জন্মাবে নতুন নক্ষত্র।

আমি উঠে পড়লাম। সমস্ত বিকাল জুড়ে ও সন্ধ্যা জুড়ে আমার মাথায় আমার লেখা কথা তবু মারামারি করতে লাগল। সূর্য নিবে গেল। বন্ধু-বান্ধবের মুখ সম্মুখে—তাদের কথা কানে যাচ্ছে। সাম্‌নে খবরের কাগজের খোলা পাতা, কিন্তু আমার মগজে একটা অশান্ত কোলাহল। ভাব গুলিয়ে গেছে, নক্ষত্র হতে হতে আবার শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে নীহার-স্রোত। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের অক্ষরের মধ্য দিয়েও ফুটে উঠ্‌ছে সেই আড়াই পাতার আমার আঁকা বাঁকা লেখা, সেই শত শত শব্দ-সরীসৃপ। আমার মন আবার সচকিত হয়—কোথায়,

কোথায় তুমি, ভাবের রহস্যালোকে যে আমার মানসলোকে প্রথম চমকে গেছলে, ছুটে-পড়া তারার মতো, প্রথম প্রণয়ের মতো—অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট—কোথায়, কোথায় তুমি? "আবিরাবিম এধি।"

রাতের আলোয় আবার কলম নিয়ে বসলাম;—তৃতীয় বার। আবার নতুন করে লিখে চললাম। চারিদিকে আলো নিবে গেল, রাত নিঃশব্দে বেড়ে চলল। বন্দিশালার বাইরে আধঘণ্টা পরে পরে সান্ত্রী প্রহর হাঁকছে, আমার মন জুড়ে চলেছে এক গভীর আলোড়ন, এক মনন-প্রক্রিয়া, কঠিন, দুঃসাধ্য, দুশ্চর তপস্যা। আমার মনের কোঠায় এক অন্তহীন যুদ্ধ চলেছে, একটু একটু করে আমার মন নির্জিত করে নিচ্ছে তার বিরোধী শক্তিদের, একটু একটু করে মন হচ্ছে স্বপ্রতিষ্ঠ।—রাতের ঘুমের এলাকায়ও এ যুদ্ধ থামল না; আমার নিদ্রিত বুকের উপর এই মাতামাতি চলল,—আমি যেন কোন প্রাণহীন কবন্ধ, আর তার উপরে যেন দুই রণোন্মত্ত শক্তির হানাহানি চলেছে, তাদের পায়ের তলায় আমার ঘুম চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে আবার সবটা পড়লাম। আবার কেটে ফেলতে হল। ভাব, ভাব, ভাব—কে পায় ভাবের নাগাল ভাষার কাঠামোতে ছাড়া? কোন্ ধ্যানে ধরা পড়ে সেই অশরীরী সত্তা? চৈতন্যের স্রোত কথার কূলের মধ্যে ছাড়া বইতে পারে কিনা, কে জানে? আমরা তো আজ আর শব্দের প্রতীকে ছাড়া তার আভাস পাই না। সে কি নির্গুণ, নিরুপাধিক, আমাদের ধ্যানেরও অতীত? শব্দের প্রতীকেই কি আমরা শুধু তার খোঁজ পাই? ভাষার প্রতিমার মধ্য দিয়েই কি আমরা দেখি তার প্রকাশ? ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী; ভাষাই কি ভাবের শক্তি? বাগার্থ-প্রতিপত্তি পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো? ভাব ও ভাষা এমনি শিবশক্তির মতো অবিচ্ছেদ্য, চির যুগানদ্ধ? অথবা অর্ধনারীশ্বর, আর তাই একেবারে এক? কল্পনার

ও রূপের, এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব কি অচিন্ত্য ?—অচিন্ত্য কেন হবে ? এক সঙ্গে তারা জন্মেছে, বেড়েছে, চেতনায় যেই নতুন ভাব জন্মাল, জন্মাল সে তার ভাষার দেহ নিয়েই, নয় কি ?

ক্রমাগত চেষ্টা করলাম এ কয় দিন। আমার সকাল-সন্ধ্যার উপরে চিন্তার আর ভাষার জাল পড়েছে ; আমার আলাপ-আলস্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই শব্দ ও চিন্তা উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে ; আমার চোখের সামনেকার এই শত শত চেনা মুখ, চেনা গাছ, চেনা পাহাড়, চেনা জগৎ আচ্ছাদিত করে রয়েছে এই কুয়াসার মতো পাৎলা লেখার আবরণ। উত্তরের পাহাড়ের চূড়া বেয়ে নিচে অবতরণ করছে ধোঁয়াটে মেঘ, উপরকার গাছের মাথা তার আড়ালে ঢাকা পড়েছে ; —আমি কি তা চোখে দেখতে পাচ্ছি ? আমার চোখের তারায় এ পৃথিবীর ছায়া নিশ্চয়ই পড়ছে, তার সূক্ষ্ম স্নায়ু বেয়ে তা মস্তিষ্কের দৃষ্টি-প্রকোষ্ঠে পৌঁছচ্ছে ; আমিও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি এই নিম্নবাহী ধোঁয়াটে মেঘ। কিন্তু তবু আমার চোখে জাগছে এই কয়দিনকার লেখা অক্ষরগুলো, এই অসংখ্য বাক্যের অসংখ্য বীজাণু ; আমার মস্তিষ্কে আন্দোলিত হচ্ছে অসংখ্য ধ্বনির অসংখ্য কোলাহল—এই সামনেকার পৃথিবীর চেয়ে তা সত্য নয়, কিন্তু তবু তা আমার সামনে-কার পৃথিবীকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। আর তারই পিছনে, তারই সঙ্গে জড়িয়ে একটি পথহারা, দৃষ্টিহারা স্বপ্ন এখনো ফিরছে আমার মস্তিষ্কের সৌরজগতে,—ঘূর্ণ্যমান নীহার-স্রোত চাইছে নবজ্যোতিষ্কে পরিণতি—আমি সে স্বপ্নকে পাচ্ছি না শব্দের প্রতীকে ধরতে, আমি সেই নীহার-স্রোতকে পারছি না দানা বেঁধে তুলতে। আমি পারছি না, পারছি না। আজ এ কয়দিন আমি বার বার চেষ্টা করেছি—বার বার ; আর আমি পারি না, আমি পারি না।

আর না, আমি এবার লেখাটা ফেলে রাখলাম।

এই সোনার হরিণের শিকার আপাতত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সত্য

সত্যই লেখাটা আমার ফুটে উঠল না কেন? এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পাচ্ছি না। কোথাও একটা গলদ ছিল।

ভাবকে কি ঠিক চিনেছিলাম? দেখেছিলাম তার কেন্দ্র? দেখেছি। ভাব কেন তবে ভাষায় রূপ নিতে পারল না? অথবা ভাষা কেন ভাবের নাগাল পেল না?—মূলে সমস্যাটা একই—প্রশ্ন অনেকগুলি, সমস্যা এক—ভাব ও ভাষার একাত্ম-সাধন। আমি অবশ্য ক্রোচের 'এস্থিটিক্স্' দেখেছি, তার সব কথা বুঝেছি এমন স্পর্ধা করতে পারি না। কারণ ক্রোচের বক্তব্য সম্ভবত এই যে,—আমি যতটা বুঝেছি,—ভাব জিনিসটাই ভাষা বা expression ছাড়া নয়, আইডিয়া বা ইমাজিনেশানের অর্থ হল ইমেজ তৈরী করা, রূপায়ণ। তবু তাঁর দর্শনের ভাব বড় কঠিন, আর কাজেই ভাষাও কঠিন, এবং কাজে কাজেই দুর্বোধ্য। আশ্চর্য নয় যে, ফ্যাসিস্তরা তাঁর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, মুসোলিনির কথা ও ভাব দুইই ঠিক ক্রোচের উল্টো, তাতে মননশক্তির দরকার নেই। ক্রোচের কথা আবার শ্রবণ-মননেও কুলোয় না, তা নিদিধ্যাসন-সাপেক্ষ। সৌন্দর্য-শাস্ত্র মূলত রূপশাস্ত্র, কথাটা মানতে বাধা নেই। শেলিকেও মানতে হয়—অবশ্য শেলির পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়ঃ

"Language is a perpetual Orphic song,
Which rules with Daedal harmony a throng
Of thoughts and forms, which else senseless
and shapeless were."

কিন্তু ক্রোচে আরও এগিয়ে যান। সৌন্দর্যশাস্ত্র রূপশাস্ত্র—মানে, ভাব মাত্রই ভাষা, এই থেকে ক্রোচে যাত্রা করলেন। এসে ঠেকেছেন ইতিহাসে। কারণ ইতিহাস হল ভাবের প্রকাশ। হেগেলকে ঢেলে ক্রোচে বললেন—আইডিয়াই তো ইতিহাস, আর তা হলে ইতিহাসই আইডিয়া। ভাষাও ইতিহাস, তা উপলব্ধির ইতিহাস;

আর উপলব্ধি মাত্রই ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই প্রত্যেকের ভাষাই তার নিজের জিনিস, তার একান্ত আশ্রয়। আর ভাষা মাত্রই রূপ, তা হলে রূপ মাত্রই একান্ত, তা ব্যক্তিগত ইতিহাস, ইত্যাদি।—তা হলে আমার সেই নিজের ভাষা আমি কেন খুঁজে পাচ্ছি না? ক্রোচের যুক্তি মানলে মানতে হবে, আমার ভাবই আমার কাছে স্পষ্ট হয় নি। তা একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার হয়ে রয়েছে, উপলব্ধিতে তা জমে উঠতে পারে নি; তার কেন্দ্র নেই, আর তার পরিধি বা আউটলাইন একেবারেই ঝাপসা। তা যেই দানা বেঁধে উঠবে, অমনি দেখা দেবে শব্দ বা ভাষা, বেরিয়ে আসবে ভাবরূপ, জোভ-এর মাথা থেকে মিনার্ভার মতো—আয়ুধ-ধারিণী, পরিপূর্ণা।—কথাটা মেনে নিতে হচ্ছে, কারণ না মানলেই বা তা অপ্রমাণ করি কি করে? ভাব যতক্ষণ ভাষায় রূপ না পাবে ততক্ষণ ভাব যে ছিল তার প্রমাণ নেই; আর ভাষায় যা রূপ পেল সে ভাব যে অস্পষ্ট তা-ও কেউ বলবে না। তাই ক্রোচের যুক্তি মানাই ভালো। স্বীকার করাই উচিত, আমার দৈন্যটা ভাষার এবং তাই ভাবের; আমার কল্পনা যে রূপ পেল না তার কারণ তা কল্পনা নয়, জল্পনা; লিখতে গিয়েই আমার লেখা যে ঘুলিয়ে গেল তার হেতু আমার উপলব্ধিটা ঘোলাটে।

ভাষার সহায় ছাড়া ভাবকে পাওয়া যায় কি না তা একটা দার্শনিক তর্কের বিষয়। তা জানি; নানা খানে শুনেছি, প্রায় মেনেও নিয়েছি। আমাদের চিন্তা জিনিসটা আদি অন্ত ভাষার কোলে মানুষ। ও দুই রাজ্য এক রাজ্য, এই বোধহয় সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ভাষা মানে ভাব, আর ভাব মানে ভাষা। এ প্রায় অদ্বৈতবাদ,—ক্রোচের চোখে ভাবের; আর মীমাংসকের চোখে হয়ত ভাষার। 'ইন্দ্র শত্রু নিপাত' বলতে ঝোঁক ভুল হল, ফলে ইন্দ্র রূপ শত্রু নিপাত গেল না, ইন্দ্রের শত্রুই নিপাত গেল—ভাষার দোষে উল্টো ভাব সিদ্ধ হল।

তবু এ যুক্তি স্বীকার করতে বাধে। জীবনে আমরা আমাদের ভাব প্রকাশ মোটামুটি একভাবে করছি—বোবা কালারও একটা

ভাষা আছে, তা দিয়ে তারা দিন চালায়। অবশ্য এ হল দোকানদারীর ভাষা। তবু তাতেও কি সবাই একই ভাষা বলে? তাও নয়। বাজারের ভাষায়ও প্রত্যেকের একটু না একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। থাকুক, আমার তা নিয়ে সমস্যা নয়। আমি চাইছিলাম আরও একটু জটিল জিনিস—আমি বাজার করতে বেরুই নি। আমি দেখছিলাম—পাহাড়ের কোলের একটি দিন; দিনটি যেন মনের এক নূতন মহলের এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। দেখেছিলাম যে তাতে ভুল নেই—তার দেহের আভাস পেয়েছিলাম, দেহের সুবাস পেয়েছিলাম। কেন ভাষায় সে রূপ পেল না? ক্রোচে বলবেন—সে দেখা দেখাই নয়, সত্য করে দেখা যায় ধ্যানে, এ ঝাপসা দেখা।

সত্যসত্যই কি নিতান্ত ঝাপসা দেখেছি? কিন্তু সব ভাবই তো প্রথম দিকটায় তা থাকে। কলম নিয়ে বসবার আগে কে দেখতে পায় তার মনের পট সর্বাংশে? জননী-জঠরে কে পায় দেখতে সেই অনাগত নবজাতককে? খানিকটা অবশ্য বুঝতে পারা যায়—বেশ খানিকটা, এমন একটা আভাস যাতে মনে রঙ ধরে, প্রাণে নেশা লাগে। দিনের চোখে যেমন উষার প্রথম আভাস, অথবা পাহাড়ে আগুন লাগার মতো। একটা ফুলকি যখন উড়ে পড়ে আমাদের পাহাড়ের বন-জঙ্গলের গায়, তখনি কি আমরা দেখতে পাই তার সমস্তটা? কিংবা প্রথম যখন বিকালের দিকে দেখি পাহাড়ে আগুন দিচ্ছে তখনি কি বুঝি কী হবে রাত্রির রূপ?—রাত্রিতে যখন চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে উঠবে; নিবিড় আঁধার আসবে আকাশ ছাপিয়ে, পাহাড়ের পিছনকার পাহাড় থেকে একটু একটু ক'রে বেরিয়ে আসবে এই পর্বতপুরের অন্ধকার; গুহা থেকে, গহ্বর থেকে, বন থেকে, জঙ্গল থেকে, আদিম শৈলকন্দর থেকে যখন আঁধার ঘিরে আসবে এই পর্বতের কোল;—তখন এই পাহাড়ের আগুন যে রূপ নেবে ওই বিকালে কি তা বোঝা সম্ভব ছিল? রাত্রিতে তখন মনে হবে একটা নতুন রোমান্স যার সঙ্গে তেপান্তরের মাঠ ও দূরদূরান্তরের

পরীরাজ্যের যোগ আছে, অন্ততঃ যা প্রতিদিনকার জগতের থেকে স্বতন্ত্র অন্য একটা জগতের কিছু—কিলেমিঞ্জোরের পায়ে কোন্ কাফ্রি জাতি বুঝি তাদের আদিম উৎসব জুড়ে দিয়েছে। অথচ প্রথম ফুলকিটা তার ছিল সামান্য মাত্র, একটা উপলক্ষ্য। তারও দরকার হয় পূর্বে জড়ো-করা বন-লতা-পাতা-গাছ, দরকার হয় স্মৃতি-বিস্মৃতিতে সঞ্চিত অনেক অনেক অচেতন ও অবচেতন মুহূর্ত, বাস্তবের পুঞ্জিত পরিচয়। মনের আকাশে যখন এরূপ ফুলকি উড়ে এসে পড়ে,—তা হ্যাম্প্‌ষ্টেডের নাইটিঙ্গেলের ডাক হতে পারে, সদর ষ্ট্রীটের ওপারের সকাল বেলার আলোর রেখাও হতে পারে, আর গ্রীক পুরাণ থেকে শুরু করে ম্যালেরিয়ার বীজাণু,—যা-কিছু আছে বা নেই,—সবই তা হতে পারে, সবই হতে পারে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ—মোটের উপর তাতে আগুন থাকা চাই;—তখন মনের চেতন অচেতন স্তরে নিগূঢ় যত বিস্মৃত বস্তুর ও ঘটনার স্মৃতি, যত অনুভূতি ও উপলব্ধি, যা মোটেই অপস্থত হয় নি—তাই হয় সে স্ফুলিঙ্গের উপজীব্য। আর তাতে তখন মন প্রথম হয় রাঙা, তার পর তাতে ধরে শিখা, তারপর জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে—বিস্মৃতি-পারের আবেগ-অনুভূতি আগুনের লেখায় দেখা দেয় স্মৃতির পারে। তা'ই কল্পনা হয়ে জ্বলে উঠে এই পাহাড়ের আগুন-লাগা বনের মতো, তার আভা আকাশ পর্যন্ত ছোঁয়; ও পাশের, সামনেকার, পিছনকার পাহাড়কে করে তোলে মৌন প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, বিস্মিত—এই আলোর পারের গাছ-গাছড়ার মতো তাকে ঘিরে দাঁড়ায় কত অশরীরী ছায়া, বিস্মৃত কত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মন যখন জ্বলে ওঠে, যখন নেশা ধরে, কিংবা ভূতে পায় মানুষকে—তখন, তখনি কি মানুষ তা বলে সর্বাংশে জানে সে নেশার স্বরূপ? গোড়াতেই জানে সেই অনুভূতির রহস্য? না, কলম যেমন এগিয়ে চলে, যেমন এগিয়ে চলে তার প্রয়াস, তার মনের দীপ্তি সেই অক্ষরের সীমায় সীমায় তেমনি রেখে যেতে থাকে আপনার স্পর্শ, তার মাথার মধ্যেকার হাজার মশালের দেউটি-ঘেরা মায়াপুরে তখনই সে

—দেখে প্রথম সুস্পষ্ট, সুনির্ধারিত রূপ? যেমনি এগিয়ে চলে কলম, অমনি একটু একটু ক'রে বেরিয়ে আসে অতীতের সঞ্চিত কত অভিজ্ঞতা? যেমনি চলে সৃষ্টির ক্রিয়া অমনি প্রথম আভাস পেতে থাকে রূপ, একটু একটু করে কল্পনা লাভ করে ভাষার দেহ।

আমার তো মনে হয়, এমনি করেই ভাব রূপ ধরে—এই তার পথ। প্রথম থাকে একটা আভাস, একটা প্রবল আলোড়ন বা আকর্ষণ। তারপর তা ক্রমশ মনকে ঘিরে ধরে, ভিতরে-বাইরে সব interpenetrated lie তার ঔজ্জ্বল্যে আর দীপ্তিতে—আর অস্বস্তিতে। হাঁ, অস্বস্তিতেও। তখন একমাত্র সে অস্বস্তি দূর করবার জন্য কাজ হয়ে দাঁড়ায় কলম নিয়ে বসা। অবশ্য কলম নিয়ে যখন মানুষ বসে তখনো তার মনে থাকে নেশার ঝোঁক, তখনো তার উত্তেজনার সমস্ত রূপটা তার চোখে ফুটে ওঠে না, তখনো মন আগুনে-রাঙা, অনেকটা উদ্দীপ্ত, অনেকটা অস্থির—আগুনের নিমন্ত্রণ পেয়ে যেমন আমাদের পাহাড়ের শুকনো বন লতা পাতা অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি। তারপর ধীরে ধীরে আগুন হয় উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। আর না হলে তা ধোঁয়াবে—যেমন আমার মনে এখন ধোঁয়াচ্ছে।—তারপর যাবে এক সময়ে নিবে। আর সে বিপদ কাটিয়ে উঠলে দেখব, আবেগ হয়েছে স্থির, বস্তু ও ঘটনার অনুভূতি হয়েছে চেতনায় জমা—আর এরই নাম emotion recollected in tranquillity. এরই নাম তো কল্পনা? কিন্তু লেখার মুখে কে নিতে পারে অনুভূতির সমস্ত মাপ জোক কষে? তার সম্পূর্ণ ডিজাইনই কি মনে জাগে? জাগে পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে মনে? অর্থাৎ, কল্পনা কি আজন্ম সুসম্পূর্ণ? না, একটা আভাস লেখার মধ্য দিয়ে বদ্‌লে বদ্‌লে, ভেঙে গড়ে একটা ডিজাইনে এসে পৌঁছে? মানে, শব্দ আর তার অর্থ আর ধ্বনির সংযোগে কল্পনা রূপ নেয়? গ্রীক ইউনিটিজের তত্ত্ব জানি, রেসিন-মলেয়েরেরও নাম শুনেছি, বেন্ জন্‌সন্ গিলেছিও,—পরীক্ষার দায়ে নয়, কৌতূহলে, এলিজাবেথীয়

নাটকের নেশা যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল,—টম্ জোন্‌স আমার প্রিয় উপন্যাস। তবু আমার মনে হয়, কল্পনা আর ডিজাইন এক নয়। কারণ, শব্দ দিয়ে না গড়লে কল্পনা থাকে অরূপ, বিষয়বস্তু তার প্রাণ নয়। বিষয়বস্তু নিয়েই গড়ে উঠে অবশ্য পরিকল্পনা, গল্প উপন্যাসের আসল কথাই হল কথা। কথা মানে, জীবনের চলন্ত চিত্র। সেখানে তাই আগে থাকতেই একটু আঁচ করা চলে—ডিজাইন। কিন্তু কতটুকু চলে? কথাশিল্পের চরিত্র এক হতে হতে আর হয়ে ওঠে। কবিতার তো বোধ হয় তেমন ডিজাইনও আঁচ করা প্রথম সম্ভব নয়। তার ভাব আর ফর্‌ম্ অচ্ছেদ্য, আর তা গড়ে ওঠেও সৃষ্টি-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাই মনে হয়, ক্রোচে যাই বলুন,—অমন গোড়া থেকে আটঘাট বেঁধে লিখতে কেউ বড় বসে না। গল্প উপন্যাসও তার প্রথম উন্মেষ থেকে স্টীল ফ্রেমে আঁটা থাকে না। অনেকবার লেখক লেখে, অনেকবার সে কাটে; যাচাই করে, বাছাই করে; বুদ্ধি দিয়ে বানিয়ে নেয়, চিত্র দিয়ে শানিয়ে তোলে। হয়ত আবার এক বারেই শেষ আঁক দিয়েও লেখক কখনো বা নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তির। কিন্তু যাই করুক, আরম্ভটা তার এরূপই—অনেকটা ভূতে-পাওয়া অবস্থায়।

এখানেই মুশকিল—এ ভূত সব সময় এরিয়েলের মতো বাধ্য নয়। পৃথিবীতে প্রোসপেরোও জন্মেছিল মাত্র একবার স্ট্রাটফোর্ড-অন্-এ্যাভনে। কিন্তু তবু ভূত মানুষকে পায়, আমাদের মাথায় ঝড় তোলে, জাহাজ ডুবোয়; সংসার থেকে, পৃথিবী থেকে, আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেয় কোন্ অজানা সমুদ্রের অচেনা দ্বীপে। তারপর? তারপর—সে অধ্যায় আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু ভূত আমাদের পায়, মাঝে মাঝে। আর আমার বিশ্বাস সে কোথায় নিচ্ছে, কোথায় নেবে, তা সম্পূর্ণ করে বোঝার সময় আমাদের থাকে না। তার পূর্বেই আমরা তাকে মাথা থেকে নামাতে চাই। পরে অবশ্য আমরা বুদ্ধি দিয়ে তাকে বশ করতে চেষ্টা করি, আর কতকাংশে তা করিও।

— আগুনের ফুলকিই তবু সবটা নয়। এমন কি এই অতল অনুভূতির ভাণ্ডার খোলবারও সময়-সময় দরকার হয় না। বুদ্ধি দিয়ে কথা সাজালেও চলে। অনেকে অনায়াসে তা দিয়েই একটা কিছু দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন, এ আমরা প্রতিদিন দেখি। ওই আগুনটুকুরও দরকার তাঁদের নেই। লেখার 'আঙ্গিক' তাঁদের হাতে রয়েছে। কলমের ডগায় তা অপেক্ষা করছে, কলম হাতে নিতেই তা বেরিয়ে পড়ে। তাঁদের কলমে কালি থাকলেই তাঁদের ভাব আছে বোঝা যায়। আর যদি কালি না থাকে, যেমন কালি পুরে নেওয়া যায়, তেমনি মাথায় তাঁদের ভাব অমনি পুরে নেওয়া চলে। উপলব্ধি জিনিসটার জন্য দুর্ভাবনা তাঁদের নেই, ও বস্তুর প্রয়োজনও তাঁদের উপলব্ধি হয় না। অথচ অনায়াসে তাঁরা একটা কিছু গড়ে ফেলেন— কুমোরটুলির কুমোরের মতো তাঁদের আশ্চর্য নৈপুণ্য। হাত তাঁদের পেকে গেছে; মনের সড়কগুলো তাঁদের একেবারে আস্ফাল্ট দিয়ে মাজা-ঘষা, যে-কোনো গাড়ী ছেড়ে দিলেই তা ইচ্ছামতো ছুটে চলবে নিঃশব্দ, নিশ্চিন্ত।—তাঁদের মনে আগুন ধরে না, মাথায় লঙ্কাকাণ্ড হয় না, কাজেই ভাবের আগুন নেবাতে অসমর্থ হলে মুখও পোড়ে না। শুধু আঙ্গিকের জোরে তাঁদের কথার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—মন তাঁদের একেবারে ফাঁকা থাকতে পারে, থাকেও। কোথা থেকে আসে এই জিনিস ভাব আর ভাষা যদি হয় একাত্ম? কেউ বলবে—ওটা কাগজের ফুল, ওতে গন্ধ নেই, ওতে প্রাণের ছোপ নেই, ওর রঙ আছে, রস নেই। তা হবে। কিন্তু রস বাজারে পাওয়া যায় না—ও জিনিস খাঁটি শ্যাম্পেনের থেকেও দুষ্প্রাপ্য। আমরা তো বিয়ার পেলেই বর্তে যাই; এমন কি জলেও চলে। আর এ জগতেও অধিকাংশেই বলবে, যদি জানতে চাও আমার wish কি?—whisky! সাহিত্যের পানশালাতেও ভারমুথ্ দুর্লভ; 'জনি ওয়াকার'ই এখনো গোয়িং স্ট্রং! আর ও বস্তু তুচ্ছ নয়। যেমন করেই হোক্, শুধু লেখা —আঙ্গিক আয়ত্ত থাকলেই যা গড়ে তোলা যায়—তা নিতান্ত তুচ্ছ

নয়। অথচ কি আশ্চর্য, এই আঙ্গিকের জন্য কারও কারও মাথা খুঁড়তে হয় না, মাথা মুড়োতেও হয় না—ও আপনিই এসে যাচ্ছে। ওর জন্যে কোন অস্বস্তি নেই, আগুন নেই, জ্বালা নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। জীবনী-শক্তির কোনো ক্ষতি এ করে না, স্নায়ুতে আয়ুতে কোথাও ওর কোনো চাপ অনুভব করা যায় না। এ ধরণের লেখা সব চেয়ে কম ভাব ও কম আবেগ দিয়ে সব চেয়ে বেশি মাল বানায়—মিনিমাম খরচে ম্যাক্সিমাম উৎপাদন, এর চেয়ে সাহিত্যিক-ইকনমির আর কি বড় কাম্য হতে পারে? অথচ প্রভূততম লোকেরও প্রচুরতম আনন্দ জোগায় আজ এই লেখাই—যা প্রথম শ্রেণীর লেখকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের প্রথম শ্রেণীর লেখা। যেমন, বাংলায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখা—যা প্রথম শ্রেণীর লিটররি জর্ণালিজম। সাহিত্যে এই চেষ্টারটন-চৌধুরীরা second class first, জর্ণালিজমএ first class.

এই আঙ্গিক আয়ত্ত করতে কি লাগে?

আঙ্গিক অবশ্য অনেকাংশেই ভাষার কৌশল; কি করে শব্দের সঙ্গে শব্দকে গেঁথে তুলতে হয়, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনিকে, সমকালবর্তী ও পূর্বকালবর্তীদের লেখা থেকে তা অনেকটা বুঝে নিতে হয়। এজন্যে চাই একটু চাতুর্য। এই চাতুর্য না থাকলে আঁচই করা যায় না আঙ্গিকের সূত্রগুলো কি, দরকার কোন্ জিনিসটা, কোন্ মাল-মস্লায় কি দাঁড়ায়। কথাটা খুব সামান্য নয়। অনেক বড় বড় লেখকও তা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেন না। অনেকের মাথায় ভাবের তুফান বয়, কিন্তু এই কৌশলটা কিছুতেই মাথায় জোগায় না। দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টার যেমন, শোনা যায়, মামলার সমস্ত রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে পারেন, অথচ নিজের স্যুটকেসের চাবি ডানে ঘোরে কি বাঁয়ে ঘোরে তা বোঝেন না। গানের ওস্তাদ যেমন ছন্দের দিশে পান না অথচ, এ চাতুর্য খুব দুর্লভ বস্তুও নয়। হাজার লোকের হাতে আজ বাঙলা কবিতা এমন নির্ভুল বাজে যে দেখে নিশ্চয় হেমচন্দ্রের কিংবা নবীনচন্দ্রের,

এমন কি মাইকেলেরও, তাক লেগে যেত। যে কৌশল তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন নি, আজকের থার্ড-ইয়ারী ছেলে ও থার্ড-ইয়ারী মেয়েরও তা অনায়াসলভ্য! জিনিসটা এখন সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গেছে। শুনে শুনে আমাদের কান এখন সহজেই ধরতে পারে এর গোড়াকার সূত্রগুলো। এ চাতুর্য আমাদের কাছে এখন তাই আর কঠিন কিছু নেই। কিন্তু বাঙলা গদ্যের বেলা এখনো আমাদের কান তেমন একটা চাবি খুঁজে পায় নি। The other harmony of prose বাঙলায় এখনো সৃষ্টি হয় নি ;—তবে হচ্ছে। তার কারণ গদ্যের গীতটা সহজ কাঠামো মানে না, তার তাল বড় সূক্ষ্ম, অন্তত অসম্ভব রকমের তা বিচিত্র। তাই এখনো এর সূত্রগুলো আবিষ্কার হয় নি। এখনো শুধু চাতুর্যে সে কৌশল আয়ত্ত হয় না। বাঙলা গদ্যের আঙ্গিক কি করে তা হলে ধরা যায়? শুধু লেখো ; লেখো, ঘষো মাজো ; লেখো। যখন সময় পাও লেখো, যেমন ভাবে ইচ্ছা লেখো, যা খুশী ইচ্ছা লেখো, শুধু লেগে থাকতে হবে। তারপর, আপনি আপনি ভাষা তোমার আয়ত্ত হয়ে যাবে, আপনি আপনি তা তোমার কলমে এসে বাসা বাঁধবে, আপনি আপনি সব হবে। তোমার কিছু করতে হবে না, শুধু কলম নিয়ে বসে থাকতে হবে ; প্রায় যন্ত্রের মতোই চলবে তোমার লেখা—যন্ত্রের মতো নির্ভুল, নিরঙ্কুশ এবং অনায়াস।

সত্যই যন্ত্রের মতো। চাবি টিপলেই বেরুবে একটা নির্দিষ্ট কথা। আর যন্ত্র যেমন মানুষের শ্রম লাঘব করেছে, এই আঙ্গিকও তেমনি লেখকদের বাঁচিয়েছে অনেক উদ্দীপনা, উদ্বেগ ও অস্বস্তি থেকে—অনেক জীবন-ক্ষয়কারী আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকে। লেখা সহজ হয়েছে, স্বাস্থ্যকর হয়েছে, রীতিমত 'ভদ্র কাজ' হয়েছে।

আঙ্গিকের সহায়ে লেখা সহজ হয়, একটা ভদ্রগোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, এইটে কম কথা নয়—তাতে লেখক বাঁচেন। তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে না, মন পুড়ে খাক হয় না। তা একটা স্বস্তি, পরম স্বস্তি।—কিন্তু সত্যিই কি সে স্বস্তি এ ভাবে লেখকের কপালে জোটে?

শুধু আঙ্গিকের কৌশলে লেখক পারেন মাথার ও মনের আগুনকে ছাই-চাপা দিতে? না; তার বলে দুনিয়ার হাটে লেখক পার পেতে পারেন, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পার পাবেন না, জীবনের কাছ থেকেও ছাড়পত্র পাবেন না। জীবন দাবি করে সৃষ্টি; আর শুধু আঙ্গিক দিয়ে তা হয় না। মন দাবি করে অনুভূতির প্রকাশ; শুধু আঙ্গিক তার নাগাল পায় না। তাতে রাজকন্যাকে ছোঁয়া যায়, তাকে ঘিরে জাল বোনা যায়—কিন্তু তাকে জীইয়ে তোলা যায় না। লেখা তাতে উৎরে যেতে পারে, কিন্তু লেখা তাতে রূপলাভ করে না। বাজারে তা বিকোবে, কিন্তু তাই বলে তা সৃষ্টি হবে না।

এইটেই তো সমস্যা—লেখা সহজে রূপলাভ করে না, সৃষ্টি হয় না। আমার লেখাও তাই বাজে লেখা হয়ে রইল। অবশ্য তার আঙ্গিকও আমি আয়ত্ত করি নি। কিন্তু আঙ্গিক আয়ত্ত করব কি করে? আগে দরকার ভাবকে চেনা—স্পষ্ট করে চেনা, একেবারে আপনার করে চেনা, প্রত্যক্ষ দেখা,—তার স্বরূপ অবিষ্কার করা। এই খানেই তার প্রথম শুরু। মনে যেই দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে আমরাও একেবারে জ্বলে উঠি—কিছু দেখি না, চিনে নিই না। শুধু উচ্ছ্বাসের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিই, ভাবি অনুভূতি আমাকে ভাটি বেয়ে ঠিক ঘাটে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তা প্রায়ই হয় না। যা মনে হয় অনায়াসে পাওয়া—তাও অনায়াস নয়, তারও স্বরূপ চেনা হয়ে ছিল হয়ত আগেই, **emotion recollected in tranquillity.** —এখন এল বিনা বাধায়। স্বরূপ তার চেনা হয়ে ছিল। অনুভূতির সেই স্বরূপ না বুঝলে চলে না। তার প্রাণমূল ঠিক বোঝা চাই। কারণ অনুভূতি আধ-আলো আধ-আঁধারের দেশ, সে স্তিমিত আলোর রাজ্য। তার রাজপুরীতে মহলের পরে মহল। আর আবেগের আড়ালে কোন মহল যে শেষ হয়, কোন মহলে গিয়ে আমরা পৌঁছই, তা জানতেও পাই না। শুধু মহল ঘোরাই সার হয়। রাজকন্যা আর জাগেন না, তাঁর রূপও ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায়। তাই অনুভূতিকে

বিশ্বাস নেই। সে তো শূন্যের নীহারের স্রোত—তার কেন্দ্রে তাকে ঘনিয়ে তুলতে হবে, দানা বেঁধে তুলতে হবে—তাকে জমিয়ে তুলতে হবে,—তবেই না হবে সে উপলব্ধি। শুধু অনুভূতি তো হাজার মানুষের স্নায়ু চেতনা বেয়ে হাজার মানুষের বুকে জমে; আর স্নায়ু ও আয়ুর মধ্যে রেখে যায় তার অস্পষ্ট কম্পন। কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই তাকে ধরা যায়—চেতনায় তার দান স্থির হয়, দান যোগ হয়। উপলব্ধি মানে হল তাই অনুভূতিকে ধরা, ভাবকে আয়ত্ত করা,—কোন বিশেষ ভাবটি আমাকে সাড়া দিয়েছে, আমাকে নাড়া দিয়েছে, বাইরের জীবন থেকে এসে দিয়েছে আঘাত, না, আমারই অন্তর থেকে ঘাত প্রতিঘাতে উঠছে—লক্ষ্মীর মতো—কী তার স্বরূপ, তা ঠিক মতো জানা আর বোঝা। কারণ তার এতটুকু স্বরূপ না জানলে তার রূপও ফোটানো যায় না।

জীবনযাত্রার চলন্ত চিত্র যদি আমার মনে ছায়াপাত করে তা হলে সে অনুভূতির প্রকাশ আমাকে খুঁজতে হয় মূলত জীবনচিত্রে—অর্থাৎ কথাশিল্পে। সে রাজকন্যা কথাপুরীর রাজকন্যা—সে জাগলে অমনি কথাপুরীর মহলে প্রাণ-চাঞ্চল্য জেঠে ওঠে, খাঁচার শুকসারি কথা কয়ে ওঠে, নহবৎখানায় বেজে ওঠে নহবৎ, ঘোড়াশালে জাগে ঘোড়া, হাতীশালে হাতী, হাটবাজারে হাজার মানুষের কল-কোলাহল। এই এক জীবনযাত্রার রূপ। সবাই বিশিষ্ট, আর তাই সকলে মিলে বিচিত্র। সেখানে আসল সত্য হল ওই জীবনযাত্রার রূপ—তার চলন্ত চিত্র। পরিবর্তমান জীবনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-চরিত্রের পরিবর্তন ও বিকাশ। তার জন্য শব্দের প্যাটার্ণ বুনতে বসা হয় ভুল। আর কথাশিল্পে আমরা তো শব্দচিত্র খুঁজিনে, চাই দেখতে চরিত্রের বিকাশ, জীবনের গতি ও বৈচিত্র্য, সেই রসের আস্বাদ। অবশ্য শব্দ-চিত্রও তাতে করা চলে—কারণ অন্তর্জীবনের আর বহির্জীবনের মধ্যে সর্বদাই দেওয়া নেওয়া চলছে, তাই যেখানে এই জীবন-যাত্রার অন্তর্নিহিত দিকটি ফোটাতে হবে, অমনি গীতময় শব্দের কৌশল প্রয়োগ করতে

হয়—যেমন সেকস্‌পীয়ের করেছেন নাটকাব্যে, কিংবা হ্যামলেটের গদ্যাংশেও, যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন চতুরঙ্গে—আসলে তা জীবন-চিত্রই নয়, বরং চিত্রের ছলে অনুভূতির প্রকাশ—যেমন নাকি প্রুস্ত করেছেন। আজকের এই বন্দী-ঘরের আমাদের জীবনের একটা দিনের ছবিও যদি আঁকতে বসি, তা আঁকতে হবে আসলে আমাদের জীবনযাত্রার রূপ ফুটিয়ে—এই হাসি গল্প, কর্তাদের নোটিশ, খুঁটিনাটি এমনি সব দিয়ে। কিন্তু তাতেই কি তার সব হবে? হয়ত তাতেই সব হতে পারে, ফুটে উঠতে পারে এই দিনটির রূপ, এর তুচ্ছতা, এর সামান্যতা, বৈচিত্র্যহীনতা, বৈশিষ্ট্যহীন আশ্চর্য রূপ। এমন কি ফুটে উঠবে এর অস্বাভাবিকতা, হয়ত এর একঘেয়েমি—একই পাহাড়, একই মেঘ, একই গাছ, একই মানুষ, চোখ মেলে দেখি দেড় হাত দূরে একই মুখ, হোক্ তা বন্ধুর মুখ,—চোখ বুজে দেখি একই অন্ধকারে বন্ধ্যা দিনরাত্রির একই অন্তহীন ছায়া। হয়ত শুধু ঘটনার চিত্র দিয়ে বন্দীদের এই চলমান দিন আর তার অচলতা, বর্ণময় পাহাড় আর তার বর্ণহীনতা, এই সব প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এই একঘেয়েমির অনুভূতিই মনেও একটা আবার সাড়া জাগায়, আর তা দাবি করে একেবারে তীব্র আন্তরিক প্রতিবাদ। হৃদয় তা হলে কথা কয়ে উঠবে শব্দে, ধ্বনিতে, সঙ্গীতে, কাব্যে। তার ভাষা হবে ইঙ্গিতময় শব্দ। ঘটনা-বহুল চিত্রের ফাঁকে ফাঁকেও খানিকটা এমনিতর ধ্বনি-বহুল অনুভূতির প্রকাশ থাকে। জীবনেরই তো দুই মহল, বাইরের জীবন আর অন্তরলোক। দুই উপাদানেও অনেকখানে তাই মেশানো চলে—আমরা ধ্বনি দিয়ে ঘটনা বলি, তা'ই গাথা ও তা'ই মহাকাব্য, নাট্য-কাব্য; ময়মনসিংহ গীতিকা এমনি জিনিস। তবু তাতে ঘটনাই প্রধান—আর তার মূল বাহন কথাশিল্প। সেখানে তাই বোঝা দরকার কোন্ ঘটনা-সত্যকে আমি খুঁজছি—তার স্বরূপ জানা, তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেখা। অর্থাৎ চাই ভাববস্তুকে ঠিক মত চেনা, আর গেঁথে তোলা, ঠিক মত গুছিয়ে তোলা অশেষ সমুদ্র থেকে, সংহত করা সেই কথা। এইটা কথাশিল্পের

অন্তরাঙ্গিক। তেমনি অনুভূতি-মূলক যে সত্য—যে-ভাব-কল্পনা—তা ধ্বনি-প্রধান.; আর তার বাহন হল কাব্য ও সঙ্গীত। সেখানেও দরকার চেনা সেই অনুভূতির স্বরূপ—তাকে গেঁথে তোলা উপলব্ধিতে, গুছিয়ে তোলা কল্পনায়। চাই ভাব-কল্পনাকেও সংহত করে নেওয়া। এই হবে কাব্যের অন্তরাঙ্গিক—তার ভাব-কল্পনার স্বরূপ চেনা। এই গেঁথে তোলা, গুছিয়ে নেওয়া, সংহত করা, এই দিকটাকেই হয়ত ক্রোচে বলেছেন 'ধ্যান'। ওসব রহস্যের প্রশ্রয় দিয়ে কাজ নেই, একে বরং বলি কল্পনা-শক্তি, সৃষ্টিশক্তি; আর এই সৃষ্টিশক্তি মূলত জন্মগত। সব মানুষের তা নেই—অবশ্য সব মানুষেরই তা খানিকটা আছেও—আছে অনুভূতির শক্তি, আছে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়,—নইলে তারা কবির কল্পনাও বুঝত না, ঔপন্যাসিকের চিত্রও ধরতে পারত না। জীবনের সঙ্গে খানিকটা সবারই পরিচয় আছে। সৃষ্টিশক্তি নেই, কিন্তু তার বোধ-শক্তি আছে। তবু খাঁটি শিল্পী হচ্ছে প্রকৃতির একটা নতুন পরীক্ষা, মানুষের মধ্যেও ব্যতিক্রম। অবশ্য এই পরীক্ষায় সেই নতুন মানুষও প্রকৃতির প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। লাল প্যান্‌সির পাপড়ি তার রঙ বদলাতে পারে না, কিন্তু কবি তার মনের রঙিমা খুইয়ে ফেলতে পারে নিজের অবহেলায়, প্রতিবেশের চাপে। যাই হোক্, সৃষ্টিশক্তি সর্বত্র সফল হয় না, সর্বত্র একরকমেরও তা নয়, আর সকলের তো তা নেইই। আর এ শক্তির প্রথম কাজ হল ভাবকে গেঁথে তোলা—হাজারমুখো যে ভাব, গহন-গভীর যার আবেগ-প্রবাহ, কিংবা ঘাত-প্রতিঘাতে চির-চঞ্চলের মধ্যে যে মিশে আছে। এই ভাব-কল্পনা ও ভাব-বস্তুকে সংহত করা, তার স্বরূপ বোঝা—এই হল সৃষ্টির শুরু। তা বুঝলে পর তখন প্রকাশের পথ চেনাও খানিকটা সহজ হয়। কোন্ দেশের রাজকন্যা সে, জানলে বুঝতে পারা যায় সেই রাজকন্যার দেশে কোন্ পথ গিয়েছে। সে কি ভাবাবেগের পথ, instinctএর এলাকা, emotionএর ছায়াপথ?

তা হলে চাই সঙ্গীত, চাই কাব্য, চাই instinctive কোনো প্রকাশ-বাহন। কাব্যেও সে বাহন শব্দ। শব্দের ইঙ্গিতে আর সঙ্গীতে মিশিয়েই আমরা কাব্যে উপলব্ধিকে প্রকাশ করি—প্রকাশ করি সেই আন্তরাভিজ্ঞতা। কিন্তু শব্দই এই অভিজ্ঞতারও অভিজ্ঞান: সেই অনুভূতির, সেই উপলব্ধির আর অভিজ্ঞতার পথ শব্দ দিয়েই গাঁথা। আর এক-একটা শব্দের মধ্যে দেখেছি নানা মানে মিশিয়ে থাকে। বিশেষ ভাবকল্পনার জন্য দরকার তাই শব্দের বিশেষ মানে আর বিশেষ ধ্বনিটিকে গেঁথে নেওয়া, জাগিয়ে দেওয়া, সাজিয়ে তোলা। আর শব্দের এই বিশেষ মানে আর বিশেষ ধ্বনিকে বের করে আনে ছন্দ, আনে বাক্-রীতি, আর বাগ্‌ভঙ্গী। এক-একটা শব্দের যা মানে আর যা ধ্বনি, দশটি শব্দের দশ রকম সারে বসে তা'ই দশ দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। ছন্দের গুণে আর এই বাক্যের শব্দ-সমাজে বসে তার বিশেষ মানেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতেই ভাব রূপ লাভ করে। নইলে তার প্রকাশ ব্যর্থ হয়—প্রকাশ প্রকাশই হয় না। এই শব্দ গাঁথাটাই হল বহিরাঙ্গিক—সাধারণত ওকেই আমরা বলি আঙ্গিক বা টেকনিক বা form. কিন্তু আসলে এ আঙ্গিকও তো একা চলতে পারেনা—তারও প্রাণ গাঁথা অন্তরাঙ্গিকের সঙ্গে, দুয়ে মিলে তবেই কবি-কর্ম পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে ভাব-রূপ স্থির হয়, লেখা হয়ে ওঠে মূর্ত।

এমনি এক অদ্ভুত সমন্বয় লেখা—ভাব-বস্তুর আর ভাব-কল্পনার সমন্বয়, অসংখ্য ভাবের মাঝ থেকে বিশেষ ভাবরূপটি সংহত করা; শব্দের বহু ধ্বনি ও বহু মানের মধ্য থেকে ছেঁকে নেওয়া তার দরকারী মানে ও ধ্বনি; শব্দ ও ভাব দুয়ের মধ্যে স্থাপন করা আবার সমন্বয়,—অন্তরাঙ্গিক ও বহিরাঙ্গিকে রাখা সুসঙ্গতি। এমনি অদ্ভুত আর বস্তুর গোড়াকার বিরোধকে মেনে নিয়ে তার সমাধান, ভাবের অস্পষ্ট আভাসকে করে নেওয়া সুসংহত, শব্দের সমুদ্র থেকে মন্থন করে নেওয়া সেই অমৃত—আবার ভাব আর ভাষা-বস্তু সকলকার সমন্বয় সাধন।

এরই নাম সৃষ্টি—আর তা না হলেই লেখা হয় বাজে লেখা। আমার লেখাও এই জন্যই বাজে লেখা হল—আমি তার ভাব-রূপকে সংহত করে নিইনি—তার স্বরূপ চিনিনি, রাজকন্যার দেশও ভালো করে খোঁজ করিনি। আর তার পরে আমি খুঁজতে গেলাম শব্দের পথে সেই উদ্দেশহীন দেশের ঠিকানা; আর সেখানেও পথেই আমার সময় শুধু কেটে গেল, আমি শব্দের নিশানাও ধরে উঠতে পারলাম না। লিখলাম বারে বারে—লিখলাম বাজে লেখা।

সৃষ্টির পথে আসলে অনেক বাধা। একে তো শক্তি সবার নেই —কারণ সে শক্তি জন্মগত। বলেছি, লেখক-মানুষটা প্রকৃতির একটা বিশেষ পরীক্ষা, একটা নূতন আবির্ভাব। জীবজগতে এমনি পরীক্ষা বারবার চলে—তারই নাম variation. মানুষের জগতে দেহের variation আর বেশি চলে না—চলে অন্তর্গঠনে অসম্ভব বৈচিত্র্য। শিল্পী তেমনি এক বিচিত্র বিকাশ আমাদের সমাজে। তাই সে বিকাশ এত সহজেই ব্যর্থও হয়। জীবজগতেরও variation প্রায়ই আয়ুহীন হয়। আর মনুষ্য-জগতেরও বিচিত্র শক্তিধররা নিজেদের আয়ু খুইয়ে ফেলেন, কখনো খোয়ান নিজের দোষে, কখনো খোয়ান পরিবেশের চাপে। নিজের দোষে—মানে, মনের অলসতায়, দেহের অলসতায়, শুধু সাড়া না দেওয়ার ইচ্ছায়, শুধুই কুণ্ঠায়, শুধুই ঢিলেমিতে, আড্ডায়, গল্পে, প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায়, 'ফ্লেশে'র পিপাসায়। কত অসংখ্য তার অজুহাত, কত নগণ্য আর কত অগণ্য হতে পারে এই বাধা। ভাবকে সংহত করা, শব্দকে উদ্ধার করা, সৃষ্টি করা—দুর্বার প্রয়াস তাতে চাই। হয়ত অনায়াসেও তা আয়ত্ত হতে পারে; তবু কত তাকে ঘষতে হয়, মাজতে হয়। কত যুদ্ধের ফল তা, কত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের লেখা তো সেই দ্বন্দ্বের ফলে ছবি হয়ে গেল। আশ্চর্য কি, যদি আমার লেখা হয়ে ওঠে আমার ব্যঙ্গচিত্র? সৃষ্টির এই দাবি তাই শিল্পী ফাঁকি দিতে চান। শিল্পী চান স্বস্তি। স্বস্তি আলস্যে নেই—তবু আলস্যে একটা মোলায়েম অবসর আছে। কে

তা না চায়? তাই সৃষ্টিশক্তি হয়ত থাকলেও অনেক সময়ে অবহেলিত হয়ে থাকে। হয়ত তা বাইরের চাপে চাপা পড়ে। বাইরের জগতে দাম যার বেশি মানুষ তা'ই পেতে চাইবে—তাই সৃষ্টির তাগিদ সেখানে খুব কম। আমি ছবি আঁকব শুনলে আমার আত্মীয়-সমাজ কপালে করাঘাত করবেন। লেখক হবার থেকে আমার ওপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবার চাপ অনেক বেশি। তাতে অবশ্য জাত-লেখকের মনের ধার খুইয়ে না গিয়ে বাড়তেও পারে—তার মনের আর বাইরের সংঘাতে তার অনুভূতি খরতর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মোটের উপর অনেকেই থাকেন নীরব কবি, করেন ওকালতি—এদেশে; আর আরও নীচের তলায়—যে দেশে শতকরা সাতজনের অক্ষর-জ্ঞান আছে—সেদেশে হয়ত তাঁর সৃষ্টি হয় কবি গানের পালা রচনা, আর পাঁচালী গান!

না, সৃষ্টির পথে বাধা অনেক। লেখার পথে পদে পদে বাধা। হয়ত মশার কামড়ে লেখকের ধ্যান ভেঙে যাবে। হয়ত বা কার্লাইলের মতো তার যকৃৎ, অথচ শক্তি কার্লাইলের মতো নেই; তখন লেখা কি করে সম্ভব? হয়ত পঁচিশ জনের ঘরে মন ভিড়ের চাপে হাঁপাচ্ছে—সত্যই লিখতে বসবারও অবকাশ লেখক পাচ্ছে না—পঁচিশ জনের কথার আঘাতে ভাব আর শব্দ জমতে পাচ্ছে না, সংহত হতে পাচ্ছে না।

আর ভাবই কি সহজে আয়ত্ত হয়, সহজে সংহত হয়? কত ভাবে তা ফাঁকি দেয়। কত ভাবে এক-এক্ ভাব আমাদের decoy করে নিয়ে যায় দিগ্‌দিগন্তরে—তেপান্তরের মাঠে। আর ভাষাও তো কত ভাবে ভাবকে ফাঁকি দিতে পারে। অল্‌ডাস্ হাক্‌সলি এই কথাই বলেছেন তাঁর ব্যঙ্গের ভাষায়—ইতালীয়রা যদি বলে amore, আনতে হয় dolore; সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন ওই শেষ কথার ভাবগত নির্দেশের দিকে ধাবিত হয়, এর ফলে ইতালীয় প্রেমের কবিতা যা হবার তাই হয়েছে। এমনি করে ফরাসীদেরও amourএর সঙ্গে মিল দিতে

dolour আন্‌তে হয়; আর ফলে সেই শব্দের চাবিতেই খুলে যায় ভাবের একটা নতুন কোঠা। জার্মাণ Hertzএর চাবি টিপ্‌লে Schwertz প্রতিধ্বনিত হবে, আর উঠ্‌বে তুমুল আবেগের তুফান। কিন্তু ইংরেজি love একেবারে গন্ধ মাখা, ওর সঙ্গে glove ছাড়া আর কোনো কথার মিল নেই। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, আমাদের বাঙলা 'প্রেমের' সঙ্গে মিল কিসের? 'হেমের'? 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম'। কথাটা কি সত্য যে, প্রেম বললেই আমাদের মনে হেমের ভাবনা জাগে?—মোটের উপর, শব্দও যে ভাবকে সৃষ্টি করে তা মানতেই হয়। এই তো খানিক আগে আমি যখন লিখছিলাম, 'আরম্ভটা তার এরূপই, অনেকটা ভূতে পাওয়া অবস্থায়'; মনে পড়ল —এ ভূত Puckএর মতো, নিজের খেয়াল খুশীতে চলে, পরের বশ হয় না—করা যায় না তাকে বশীভূত।—তারপর সেই ভাবের সূতো ধরে দেখা দিল একটি কথা—Ariel। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দুটি তিনটি দিকে ভাবনা চলে গেল, শেলির 'Ariel to Miranda', আঁদ্রে মারোয়ার 'Ariel', আর বলা বাহুল্য, সেক্‌সপীয়রের সেই আনন্দময় আত্মা Ariel। শেষটিই আমার দরকার, তার কথা মনে জেগেছিলও সর্বাগ্রে। তাই, ভাবনা চল্‌লো এ পথে—'এ ভূত সব সময়ে আরিয়েলের মতো বাধ্য নয়'। তারপর, 'পৃথিবীতে প্রস্‌পেরো একবারই জন্মেছিল ষ্ট্রাটফোর্ড অন্‌ এ্যাভনে'। এর পরে এই শব্দ খুলে দিলে দুটি জানালা—একটি প্রস্‌পেরোর বিদায় দৃশ্য, আরটি সমস্ত 'টেম্পেষ্ট'। Ariel এই একটি শব্দে খুলে গেল আমার মনের গবাক্ষ:

> Charm'd magic casements, opening on the foam
> Of perilous seas, in faery lands forlorn.

আর ঠিক এরূপ একটি শব্দেই বন্ধ হয়ে গেছল কীটসের মনের এই magic casement:

Forlorn, the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self.

আবার, শুধু কি শব্দই ভাবের নিয়ন্তা? কাগজের শেষ দিকে পৌঁছুলে যে আপনা থেকেই শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, ভাব হয়ে ওঠে শঙ্কিত—অন্য পাতায় গেলে পাছে তার ঐক্য নষ্ট হয়। দেখছি, কাগজের আকার দিয়ে ঠিক হয় লেখার রূপ। রয়াল আটপেজির পাতা স্থির করে রেখেছে আমার ভাষার সীমা ও ভাবের পরিধি। আমার উপলব্ধির রূপ নির্ধারিত হয় আমার খাতার বা প্যাডের কাগজের মাপে। আর একি শুধু আমারই? শুনেছি, আনাতোল ফ্রাঁসও তাই বলতেন—প্রুফে সাত বার মাজলে ঘষলে তবে যাঁর লেখা তাঁর মতে রূপ নিত, সেই ফরাসী 'ফর্মের' সিদ্ধাও বলতেন: কাগজের 'ফর্মা'ই ঠিক করে লেখার 'ফর্ম'।

বক্সা, এপ্রিল, ১৯৩৩

সাধনা ও সৌখিনতা

"সাহিত্য ত আপনার নেশা", ভাগ্যবান বন্ধু বলেন।

সাহিত্য একটা বড় সাধনা, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু লেখা জিনিসটা শ্রমসাধ্য আর পরিশ্রমের মূল্যও চাই। সাহিত্যকে তাই শুধু নেশা বললে চলে না, পেশাও করতে হয়। একালে এ কথা লেখকেরাও বোধহয় জানেন, কিন্তু তবু কথাটা এমন স্থূলভাবে মানতে তাঁদের বাধে।

'শ্রম' কথাটাকে কায়িক প্রয়াস বলেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। আর কায়িক পরিশ্রম থেকে বহু-বহু শত বর্ষ আগে এদেশে আমরা উচ্চবর্গের মানুষেরা নিজেদের মুক্ত করে নিতে পেরেছি, তা চাপিয়ে দিয়েছি নিম্নবর্গের উপরে। আমাদের সমাজে কায়িক পরিশ্রম নিম্নবর্গের স্বধর্ম, উচ্চবর্গের স্বধর্ম হল শাসন; এবং তাদেরও মধ্যে উচ্চতম ব্রাহ্মণ বর্ণের দায়িত্ব হল চিন্তা—মস্তিষ্কের প্রয়াস। মস্তিষ্ক জিনিসটা অবশ্য দেহেরই অংশ। তবে চিন্তারাজ্যে বিচরণ করবার এমন বেপরোয়া সুযোগ আমাদের ব্রাহ্মণরা যারা পায় এই সত্য তারা ভুলে যায়। গ্রীকরাও আমাদের মতই মনে করত—কায়িক শ্রম জিনিসটা ইতরজনের জন্য; শিষ্টজনেরা করবেন চিন্তা। তবু ত সে দেশে ব্রাহ্মণের মত একটা বর্ণ ছিল না। বলা বাহুল্য, চিন্তা এরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে এই চিন্তারাজ্যের বাসিন্দারা স্বভাবতই মনে করেন—চিন্তা বাস্তবের প্রতিলিপি নয়, চিন্তা অনন্যনির্ভর। এরূপ সমাজে চেতনাই মনে হয় মূল সত্য, বস্তু জগৎ মূল সত্য নয়। তার ফলে ক্রমে স্থির হয় চেতনাই সত্য, জগৎ মিথ্যা। বহু শত বৎসর ধরে ভারতীয় মতাদর্শে আইডিয়ালিজম-এর প্রাধান্য একটানা বয়ে এসেছে; তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারি এই সামাজিক সত্যটা। যেমন, প্রথমত, কায়িক শ্রমের ও মস্তিষ্কের

শ্রমে দুস্তর পার্থক্য বিধান করা হয়; তারপর মস্তিষ্কের পরিশ্রমকে উচ্চবর্গের স্বধর্ম হিসাবে প্রাধান্য দান করা গেল; এবং শেষে মানসিক প্রয়াসই পেল চরম মূল্য। সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমী মানুষের ও কায়িক শ্রমের প্রতি সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয়েছে একটা অবজ্ঞা ও ঘৃণা। এটা বহুকালের ভারতীয় সংস্কার, আমরা তা এখনো ছাড়তে পারিনি। র‍্যাশন-ব্যাগ নিজের হাতে বহন না করে উপায় নেই, জীবিকার দায়ে 'চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারী' হয়েছে অন্তত গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে। তথাপি ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজের থেকে আমরা নিশ্চয়ই মনে করি ইলেকট্রিক আপিসের কেরানির কাজ—বেশি লাভজনক না হোক—বেশি সম্মান-জনক। একটা 'ভদ্রবৃত্তি,' অন্যটা 'মজুর মিস্ত্রির' কাজ। এমন অবস্থায় মানসিক প্রয়াস ও কায়িক শ্রমকে একই শ্রমের পর্যায়ে ফেললে আমরা সাহিত্যিকরা তা মানি কি করে?

'শ্রম' কথাটার সঙ্গে শুধু কষ্ট নয়, স্বেদবিন্দু নয়, অনেকখানি ঘামের গন্ধও যে মাখা আছে; আমাদের যুগ-যুগান্তরের পরিশীলিত নাক তাতে সংকুচিত না হয়ে পারে না। তাই সাহিত্য একটা বড় 'সাধনা' বললে আমাদের মন গর্ব ও গৌরব বোধ করে, কিন্তু লেখা জিনিসটাকে 'শ্রমসাধ্য' বলে স্বীকার করতে সেই মন বাধা পায়। তারপরে লেখা-সম্পর্কিত অন্যসব কাজে,—মুদ্রণে, বাঁধাইতে, সম্পাদকতায়,—যদি বা পারিশ্রমিক গ্রহণই নিয়ম, লিখে 'পারিশ্রমিক' দাবি করা যেন এখনো একটা লজ্জার কথা। কারণ লেখা শুধু মানসিক ক্রিয়া নয়, মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেও একটা উন্নততম ক্রিয়া,—যাকে তাই বলা যায় আধ্যাত্মিক প্রয়াস—'সাধনা'। এমন সূক্ষ্ম ব্যাপারটাকে 'পারিশ্রমিকে'র বিষয় করে তুললে, সাহিত্য জিনিসটা যে প্রায় শ্রমশিল্পের মত স্থূল ব্যাপারের সমগোত্র হয়ে পড়বে, মানসিক চর্যা ও বাস্তব চর্চার পার্থক্য যে আরও কমে যাবে। শেষ পর্যন্ত লেখকও হয়ে যাবে শ্রমিকের সহযাত্রী।

সাহিত্যিকের পক্ষে যুক্তিও আছে: পরিশ্রমী বলে নয়, প্রতিভার অধিকারী বলেই ত তাঁরা সাহিত্যিক। আর এ প্রতিভা 'নৈসর্গিক'; যে-কোনো লোক—এমন কি যে-কোনো শিক্ষিত মানুষ, পরিশ্রম করলে সাহিত্যিক হতে পারেন না। এ যুক্তি যে আংশিক সত্য তা স্বীকার্য।

পরিশ্রম কথাটার উপরই আসলে সাহিত্যিকরা অনেক সময়ে বিরূপ। সাহিত্য পরিশ্রমসাপেক্ষ এই সত্যটাও তাই তাঁরা মানতে চান না। তাঁদের মতে—সাহিত্য-শক্তি হচ্ছে প্রধানত জন্মগত এক ধরণের প্রতিভা। আর প্রতিভার কোনো পরোয়া নেই। তারপরে, সাহিত্য হচ্ছে প্রেরণার ফল,—অর্থাৎ আকস্মিক একটা নেশার ঝোঁক। এই জন্যই সাহিত্য-ব্যাপারে নিয়মকানুন, আয়াস-প্রয়াস, এসব খাটে না—খাটা উচিতও নয়। তা হলেই বোঝা যায়, সাহিত্য পেশা হতে পারে না।

কবিকর্মের কথা বলা দুঃসাহস। কিন্তু সম্প্রতি দু'একজন কবি সজোরে কথাটা বলে আমাদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন— 'আধুনিককালের কবিকে শ্রম করতে হবে।' সাধারণত কবিদের মধ্যে যে প্রচলিত সংস্কার এদেশে গড়ে উঠেছে তাতে এ রকম 'বিশুদ্ধ কাব্যরসে' বিশ্বাসী কবির পক্ষে এই স্বীকৃতি বিস্ময়কর না হোক, নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। একালের কবিকে শুধু 'প্রেরণা'র আর 'নৈসর্গিক প্রতিভা'র উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না, তাঁকে পরিশ্রম করতে হবে। প্রথমত, তাঁকে জানতে হবে পূর্বতন কবিদের কাব্য ও কলা-কৌশল;—জানতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে তাঁর নিজ সাহিত্যের কাব্য-লোকের ঐতিহ্য। সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে দেশ-বিদেশের কবিকৃতি, বিশেষ করে আধুনিককালের নানা ভাষার নানা কবির পরীক্ষা আর সমীক্ষা। কিন্তু এও হল শুধু একদিক। এসবের অপেক্ষাও বেশি করেই কবিকে চিনতে হবে তাঁর নিজের জীবন, আর সেই কবি-চেতনার

মূল্য দিয়েই আবার যাচাই করতে হবে তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমসাময়িক জগৎ। বলা বাহুল্য, এইটিই কবির প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু জীবনের সঙ্গে এই পরিচয়-সাধনও যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ।

তবু এও ত শুধু কবি-জীবনের প্রস্তুতি, ভূমিকা রচনা। আসল পরিশ্রম ত আরম্ভ হয় এর পরে—যখন কবি এরূপে প্রস্তুত হয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হবেন। তখনকার পরিশ্রমের যে রূপ নেই, হিসাব নেই, শেষ নেই। অবশ্য কেউ কেউ এ পর্ব প্রায়ই সহজে সম্পন্ন করতে পারেন, অনেকে তা পারেন দু'এক সময়ে। এ সৌভাগ্য তাঁদের সম্ভব হয় বিশেষ এক জাতীয় প্রতিভার বলে বা তাঁরা বিশেষ একটা কৌশলসিদ্ধ বলে। এরূপ প্রতিভা ছিল কোলরিজের, কলাকৃতিত্ব ছিল টেনিসন-সুইনবার্ণদের। কিন্তু অধিকাংশ কবির পক্ষেই তাঁর প্রকাশকলা একটা অনাবিষ্কৃত পথ। জীবনের প্রত্যেক সত্য যেমন নতুন করে আবিষ্কার না করলে তা কাব্যসত্য হয় না, তেমনি প্রকাশ-কলাকেও বারেবারে প্রতি জীবন-কথার জন্য নতুন করে আবিষ্কার না করলে তা যথার্থ হয় না। কবিকে বারেবারে সাধতে হয় তার কাব্যকলার পা ধরে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' শুধু তাই নয়, প্রতিবারই আবার এ সাধনার রীতিও নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়—বারবার, অজস্রবার চলে কবির এই রূপলোকের পরীক্ষা। তবু কখনো তা হয় সার্থক, কখনো তা ব্যর্থ। কিন্তু যতক্ষণ প্রকাশ যথার্থ না হয়, ততক্ষণ কবির কথা অগ্রাহ্য। কবির ভাব-বস্তু কাব্যের দেহেই প্রাণ পায়; কবিকৃতিতেই কবির পরিচয়। সেই কবিকৃতির সম্বন্ধেও এ কথাটাই সত্য—শতকরা দশভাগ তার প্রেরণা, নব্বুই ভাগ তার স্বেদসিক্ত। "Ninety per cent perspiration, ten per cent inspiration." এই প্রত্যক্ষ কবিকৃতির 'পরে এত গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলেই সময়ে সময়ে কবিও ভুলে যান, পাঠকও ভুলে যান, কবিকৃতি শুধু মাত্র রূপায়ণ-কলা নয়, তারও পূর্বেকার জীবন-চেতনা, জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয়, জীবনের বিশেষ

উপলব্ধি। যাকে আমরা 'প্রেরণা' বলি তার দশ ভাগের মধ্যে ন'ভাগই এই চেতনার সৃষ্টি। আর যাকে আমরা কবিচেতনা বলি তারও ন'ভাগের আট-ভাগ জীবনের কর্মযোগে এক হয়ে ঘর্ম ঝরিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। আগাগোড়া একটা শ্রমসাধ্য কাজ কবিকর্ম।

কবিকর্ম কতটা পরিশ্রম-সাপেক্ষ তা সচরাচর হয়ত বোঝা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে 'নৈসর্গিক প্রতিভা'র অপেক্ষা পরিশ্রমের প্রয়োজন অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ও বিচার-বিশ্লেষণমূলক অনেক লেখা আছে যার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানদান, কিন্তু তাতে সাহিত্যিক গুণ থাকলে তাও সরস হয়ে ওঠে। এ জাতীয় সাহিত্য—যাকে বলতে পারি মূলত জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য (লিট্‌রেচর অব্ এন্‌লাইটেন্‌মেণ্ট)—বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য, শিক্ষামূলক সাহিত্য,—তাতে যে পরিশ্রম প্রয়োজন, তা সর্ব-স্বীকৃত। একটা কথা এ ক্ষেত্রেও আবার মনে রাখতে হয়—এ পরিশ্রম শুধু জ্ঞান আয়ত্ত করার পরিশ্রম নয়; এ পরিশ্রম জ্ঞান পরিবেশনের বেলায়ও প্রয়োজন। অর্থাৎ লিপি-কুশলতা বা প্রসাদ-গুণ যা'ই বলি তাকে, তা'ও একটা যত্ন-সাধ্য গুণ, শ্রম-সাধ্য কৃতিত্ব। এ ছাড়া আছে যাকে আমরা রস-সাহিত্য বলি (লিট্‌রেচর অব্ এন্‌টারটেইন্‌মেণ্ট), তার নানা শাখা-প্রশাখা। সাধারণ সরস সাংবাদিক বিবরণী থেকে আরম্ভ করে গল্প, উপন্যাস, নাটক (এবং কবিতাও, তা যেন বিস্মৃত না হই) এ সবেরই অন্তর্গত। এ সবের জন্য ঠিক কবিতার মতই চাই প্রস্তুতি—প্রথমত, জীবন-সত্যের উপলব্ধি, জীবনের সঙ্গে গভীর এবং ব্যাপক পরিচয়; দ্বিতীয়ত ঐতিহ্য ও কলা-কৌশলের জ্ঞান; এবং তৃতীয়ত, পরিবেশনের সমস্যা-সমাধান, অথবা প্রকাশের সাধনা। এই তিনদিকের কোনোদিকেই পরিশ্রম না করলে নয়। অথচ রস-সাহিত্যকে শ্রমসাধ্য ভাবতে আমরা নারাজ।

বাঙালী সাহিত্যিকদের মতই বাঙালী পাঠকও মনে করেন—

সাহিত্য সাধনা হতে পারে, কিন্তু পরিশ্রম জিনিসটা তাতে গৌণ। এ ধারণার প্রসারের হয়ত অনেক কারণ আছে—গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সভ্যতার সংকট তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা ও জীবনের মূল্যমান নতুন করে স্থিরীকৃত করবার দাবি উঠেছে। সাহিত্যের মানদণ্ডও এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী নূতন করে পরীক্ষিত হচ্ছে। বাঙলায়ও ক্রমেই গভীরতর হয়েছে এই সংকটের ছায়া এবং সে ছায়া পড়েছে আমাদের সাহিত্যেও। মূল্যমান সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা মানুষের বুদ্ধিতে চেতনায় এবং রসবোধেও একটা অস্থিরতা এনে দেবে, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষার গঠন যখন সম্পূর্ণ হয়নি তেমনি সময়ে এরূপ অনিশ্চয়তা আর অস্থিরতার উদ্ভব হওয়াতে সাধারণতই বাঙলা গদ্য (এবং পদ্যও) তাল সামলাতে পারেনি। আমাদের 'সাধনা'র পক্ষে তা বেশ বিঘ্ন-স্বরূপ হয়েছে। শব্দ নিয়ে, বানান নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে একটা যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম স্থাপন করা গেল না, বরং এল অরাজকতা। আমাদের একঘেয়ে বাক্য-ধারার মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে চাইলেন কৃতী লেখকেরা। কিন্তু তাতে বাক্যরীতির একেবারে যদৃচ্ছা কোমর ভাঙবার স্বাধীনতা পেয়ে গেল নির্বোধ লেখকেরা। সঙ্গে সঙ্গে অমনোযোগী হয়ে পড়েছি আমরা সবাই সাধারণ লেখকেরা। ব্যাকরণের বিধি, চিন্তার শৃঙ্খলা, বুদ্ধির বিধান এবং কানের সাক্ষ্য মিলিয়ে বাঙলা লেখার মত ধৈর্য আজ তাই কোথায় ?

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙলা গদ্যের একটা বিশেষ গাঁথুনি স্থির হয়ে আসছিল। দু'জন মহা-সংগঠক এদিকে স্মরণীয়—বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। 'হুতোম' ছাড়া অন্য কৃতী পুরুষদের তাঁদেরই অনুগামী বলতে পারি। তারপর রবীন্দ্রনাথের নানা পর্বের লেখায় বাঙলা গদ্য যে বিচিত্র এবং অকল্পিত পরিণতি লাভ করেছে, তা হচ্ছে কবি-প্রতিভার স্পর্শে গদ্যের পরিণতি। যথার্থ গদ্য-শৈলীর উদ্ভাবনা তাতে সুনিশ্চিত হয়না—যে গদ্য সাংবাদিক বা জ্ঞান

প্রসারের সহায়িকা, maid of all work ; অথচ the other harmony of prose—শুদ্ধ যা কাব্যলোকের বাইরেও বাণীর অলক্ষিত সৌন্দর্য আয়ত্ত করে, তা দুর্লভ রয়েছে। কাব্যালঙ্কার ছাড়িয়ে গদ্য-গতিতে বাঙলার চরণকে যাঁরা অভ্যস্ত করছিলেন তাঁদের সংখ্যা তবু কম নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করলে আমরা শেষ করব এসে আধুনিক কালে। অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ গদ্যের অন্য জগতের শিল্পী ; প্রমথ চৌধুরী নতুন ভঙ্গির প্রবর্তক। আর প্রাঞ্জল গদ্য-শৈলীর উত্তরাধিকার যে জীবিতকালের অনেক লেখক গ্রহণ করতে পেরেছেন, তা সুবিদিত। কথা-সাহিত্য ছেড়ে দিলেও রাজশেখর বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, নির্মল বসু থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেরই নাম করা যায় —গুণে, ভঙ্গিতে তাঁরা বাঙলা গদ্যকে নূতন শ্রীদান করেছেন। তা ছাড়া সাম্প্রতিক 'রম্য-রচনা'র অক্লান্ত লেখকেরা প্রমথ চৌধুরীর হাল্‌কা ভঙ্গিকে ভাঙিয়ে নিয়ে এদিকে বাক্‌চাতুর্যের নিদর্শন পুঞ্জিত করছেন। কোনো কোনো সাংবাদিকের হাতেও বাঙলা লেখা স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করছে। কিন্তু সার্থকনামা এইসব লেখকের কথা ছেড়ে দিলে বলতে পারি—সাধারণ বাঙলা গদ্যে আমরা কোনো উচ্চ মানের বা ক্রমোন্নতির প্রমাণ পাই না। যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের কথা বলছি না, নইলে বাঙলা গল্প ও উপন্যাসের ভাষা হয় আটপৌরে, নয় মেদস্ফীত। প্রবন্ধের ভাষা হয় অতি পল্লবিত, উচ্ছ্বাসবহুল, নয় শুষ্ক, নীরস। নাটকের এবং উপন্যাসের বাক্যালাপ (সিনেমার তাড়নায়?) হয় কথার তুবড়ি, নয় কথার ছুরিখেলা, —চমক লাগানোই তার উদ্দেশ্য। ইংরেজি গদ্যে অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধির অনুশীলন ও মাত্রাবোধের অনুশীলনে যে স্বচ্ছতা, স্থিরতা ও নমনীয়তা এসেছিল তা আমরা বাঙলা গদ্যে আজও মোটেই আয়ত্ত করতে পারিনি। অনেকাংশে তা থেকে বরং আমরা

ইদানীং পিছিয়ে যাচ্ছি। ইংরেজি-ভক্ত শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—আমাদের দৈনিক কাগজগুলি শাদা আটপৌরে সংবাদও শাদা পরিষ্কার কথায় বলতে অনভ্যস্ত। এটা হয়ত একদিকে অতি-পুরাতন আলঙ্কারিক ঐতিহ্যেরই জের, অন্যদিকে বাঙালী চরিত্রের ঢিলেমিরই একটা প্রতিফলন। সম্ভবত তা এই সত্যেরও প্রমাণ যে, বিংশ শতকে এই 'সায়েন্স্' ও 'রিসার্চে'র যত বুলিই আওড়াই, যত 'ন্যাশনাল লেবরেটরি' গড়ি, আসলে আমরা এখনো চিন্তাক্ষেত্রে, বুদ্ধি, যুক্তি, শৃঙ্খলা, স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা, যাথার্থ্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী নই। (এতই এসব আমাদের অপরিচিত, যে আজও আমাদের ভাষায় exactness, precision প্রভৃতি কথার প্রতিশব্দ পর্যন্ত আমরা সহজে খুঁজে পাই না।) একদিকে আছে ভারতীয় ভাববাদী কুয়াসাপ্রিয়তা, অন্যদিকে বাঙালী ঢিলেমি। যাই হোক্, অন্তত বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে এখনো সেই 'অষ্টাদশ শতক' অনুপস্থিত—যদিও ইতিমধ্যে অনুশীলনের ফলে ইংরেজি গদ্য আরও সূক্ষ্মতর প্রকাশ-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এবং শুনছি সেদিক থেকে ইংরেজি নাকি এখন ফরাসী গদ্যেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে।

লেখার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম, বড়-বড় ভাষার লেখকদের প্রায় স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাঁরা আমাদের মত 'সাধনা' প্রভৃতি গভীর অর্থের শব্দ প্রয়োগ করেন না। কিন্তু আসলে তাঁরাই করেন সাহিত্যের সাধনা। যেমন-তেমন করে লিখে উঠলেই লেখা শেষ হয়ে গেল, এ কথা আধুনিক সভ্য জগতের কোনো সভ্য জাতির সাহিত্যিক মনে করেন না। তাঁরা জানেন, কথাটা শুধু বলে উঠলেই হবে না, ঠিক মত বলে ওঠা চাই। এবং এই 'ঠিক মত বলে ওঠা'র জন্য প্রয়োজন খাটুনি ; মাজা-ঘষা, আবার লেখা, আবার কাটা ; বারে বারে লেখা বারে বারে কাটা, যেমন করে হোক আয়ত্ত করা বিষয়ের যথার্থ প্রকাশ। যে সহজ স্বচ্ছন্দগতি তাঁদের কারো কারো লেখায়

দেখে আমাদের রম্যরচনা-রসিকেরা পুলকিত হন আসলে সেই স্বাচ্ছন্দ্য অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে তাঁদের অভ্যস্ত হয়। সহজিয়া সাধনা হচ্ছে অনেক অনেক কঠিন সাধনা—কি সাহিত্য-কর্মে, কি পারমার্থিক ধর্মে। ল্যাম্বের কথা বলব না,—'এলিয়া' পৃথিবীতে দু'বার জন্মেননি। হ্যাজলিটের 'অন ফেমিলিয়ার ষ্টাইল'ও অনেকেই পড়ে থাকবেন। এবং ষ্টিভেনসনের ইংরেজি গদ্যের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য দেখে নিশ্চয়ই এই রম্য-রচনার দিনে আমাদের রচনাকাররাও মুগ্ধ হন। কিন্তু তার সিদ্ধি-মন্ত্র সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা দেখবেন ষ্টিভেনসন বলছেন—ও বিদ্যা শুধু যত্নায়ত্ত নয়, ও প্রায় সাহিত্যক্ষেত্রে 'সাপের মাথায় ভেককে নাচানো।' সহজ ষ্টাইলের দুটি মাত্র আছে কৌশল —জানা চাই কাটতে আর জানা চাই থামতে। ও দু'বিষয়েই যে আমাদের লক্ষ্য থাকে না তা আমরা বেশ জানি। ফেনানো হচ্ছে আমাদের বাঙলা রচনার প্রধান ত্রুটি—তা সে উপন্যাসই হোক কিম্বা হোক প্রবন্ধ সাহিত্য। হয়ত তার কারণ সেই 'জাতীয় মানসিকতা'— কিন্তু সে মানসিকতাও অপরিবর্তনীয় নয়। এ দোষ থেকে আমাদের রবীন্দ্রনাথও মুক্ত করে যাননি। আর একালে সেই সঙ্গে প্রধান দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে গাঁথুনী ভাঙা, বাঁধুনি-হারানো, যত্নের অভাব, ঘষতে না-জানা, মাজতে না-চাওয়া, ঢেলে সাজার অক্ষমতা, আবার নতুন করে লেখবার অনিচ্ছা, এবং আবার গোড়া থেকে ভাবতে আলস্য। হয়ত এরও কারণ সেই 'জাতীয় মানসিকতা'—কিন্তু মানসিকতা তো অপরিবর্তনীয় নয়। এরূপ কুড়েমির মধ্য দিয়ে প্রশ্রয় পায় অশ্রদ্ধাও —পাঠকের প্রতি অশ্রদ্ধা আর নিশ্চয়ই 'সাহিত্য-সাধনা'র প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধার প্রমাণ এটা নয়।

কারণ খুঁজতে গেলে হয়ত আমরা আরও স্থূল কারণও খুঁজে পাব। স্থূল হলেও তা বাস্তব। শারদীয় সংখ্যার লেখার মত লেখার যখন তাড়া আসে তখন হাড়ে হাড়ে বুঝি—যত্ন নিয়ে লেখার মত সময়ও আমাদের লেখকদের অনেক সময়ে জোটে না। লেখকের

উপর এইরূপ বহুল তাড়না এসে পড়ছে নানা কারণে। তার অন্যতম কারণ, লেখা এখনো পেশা হয়ে ওঠেনি, লেখা সখ বলেই এখনো গণ্য হয়। নেশা হলেও লেখা তাই এখনো একটা সৌখিনতা, 'এমেচরিশনেস' তাতে জন্মগত-ভাবে থাকে। লেখার জন্য পয়সা দেওয়ার ও পয়সা নেওয়ার সুস্থ নীতি গ্রাহ্য হয়ে না ওঠাতে লেখক বা প্রকাশকের কেউ সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাগিদ বোধ করেন না। এটাও বিলাতের অষ্টাদশ শতকের গদ্য-বিকাশের যুগের সাক্ষ্য। পেশা নয় বলেই এখনো সাহিত্য আমাদের দেশে নেশা,—অল্পাধিক সময়ের অপচয়। অথচ সবাই আজ জানেন 'টাইম ইজ মানি' ; সবাই জানেন পরিশ্রমের মূল্য আছে। 'পারিশ্রমিক' আসলে পরিশ্রমের সেই মূল্য-বোধেরই প্রমাণ।

বিশেষ বিশ্লেষণ না করেও এই কথাটি আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি, বাঙলা লেখার এই মানদণ্ড কি করে উন্নত হতে পারে। তার একটা প্রধান পথ—লেখা জীবিকা হওয়া চাই। সাংবাদিকতা, সিনেমা, রেডিও এবং শিক্ষাবৃত্তি—প্রধানত এইসব বৃত্তিকে অবলম্বন করেই হয়ত লেখকের এখনো জীবিকা অর্জন করতে হয়। লেখা একটা 'উপরি' পাওনা বলে গণ্য ; বড় জোর, সিনেমার বা প্রচার-কর্মের তা একটা ছাড়পত্র। পেশা বলে তা নিজ দাবিতে এখনো গণ্য প্রায় হয়নি। তা সত্ত্বেও লেখায় এমেচরিশ্‌নেস্‌, বা সৌখিন-বৃত্তি কাটাবার চেষ্টা কি আরম্ভ হতে পারে না? এদেশে সোবিয়েত দেশের মত 'লেখকের স্কুল' নিশ্চয়ই এখনো স্থাপিত হবে না। কিন্তু ইংলণ্ড-আমেরিকার মত লেখা-শেখার করেস্‌পণ্ডিং কোর্স কি অসম্ভব? শুধু লাভ-মুনাফার হিসাব না করে সম্পাদকরা ও সাহিত্যিকরা মিলে কি তেমন কোনো উপদেশক-সমিতি গড়তে পারেন না যা লেখকদের উপদেশ দেবে, তাড়নাও করবে? সাহিত্য-সম্মেলনের মত সম্মেলনে কি এরূপ বার্ষিক একটা আলোচনা ও হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা করা যায় না?

মাসিক সাহিত্যগুলি কি আরও একটু দায়িত্ব নিয়ে সমালোচনা চালাতে পারেন না ?

অন্তত লেখকেরাই কিছু করুন। সাহিত্য যদি 'সাধনা' হয়, শুধু সখ না হয়,—তা হলে তাঁরা লেখার জন্য আরও যত্ন নেবেন, আরও পরিশ্রম করবেন। সুলেখক হতে হলে লেখক কেন পরিশ্রম করবেন না—লেখক হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে ? অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে গভীরতর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে করবেন জীবন-দ্রষ্টা ; পড়বেন, বুঝবেন, ভাববেন পূর্বজদের লেখা ; পড়বেন, বুঝবেন, ভাববেন সমকালীন সাহিত্য। এবং তারপর লিখবেন তাঁর লেখা,—একবার, দু'বার, তিনবার ; দরকার হলে, বারবার। মাথা না ঘামিয়ে কিছুতেই শেষ করবেন না লেখা। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের জন্য চাইবেন পারিশ্রমিকও। সাহিত্য তখনই সাধনা হয়ে উঠবে যখন এই সৌখিনতার ধারণা শেষ হবে, সাহিত্য হবে লেখকের পেশা। কিন্তু সেই পেশাটাও শিখতে হবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

কি করে ভালো লিখব, তার জন্য লেখকদের মাথা ঘামানো, এই হল সাহিত্যের একমাত্র সাধনা।

আশ্বিন, ১৩৬০